লীলারহস্য

চিত্তরঞ্জন মাইতি

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

শ্রীমতী গীতা মাইতি
যাঁর নিরন্তর সান্নিধ্য ও দাক্ষিণ্যে
আমার সৃষ্টিকর্মগুলি সম্পন্ন হচ্ছে।

এতে আছে

সৃষ্টির চালচিত্র

এবারের সংকলনে কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমি মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত উপন্যাস এবং কাব্যনাট্য প্রকাশ করেছি, এই সংকলনে সেগুলি সংযোজিত হয়েছে। সেইসব রচনাকে যে সমস্ত দক্ষ শিল্পী চিত্রে রূপায়িত করেছেন সেগুলি বর্তমান সংকলনেও অক্ষুন্ন রয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই সংকলনের পরিকল্পনা ও তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের কৃতিত্ব আমার কন্যাপ্রতিম রোমির। তার নানা কাজের মাঝে সে পুরনো পত্রিকাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আমার লেখাগুলোকে পরপর সাজিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে এই উপন্যাসগুলোর 'পটভূমি' সম্বন্ধে সে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। তারপর তার স্মৃতি থেকে সেগুলিকে সে রূপ দিয়েছে।

প্রতিবার এগুলো আমি একবার করে দেখে নিই। কিন্তু এবার সেগুলো দেখা সম্ভব হয়নি আমার অসুস্থতার কারণে। রোমির লেখা চালচিত্রগুলো এবার অক্ষতই থেকে গেল।

উর্মিলা

কলেজে পড়ানোর সময়ে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' নিয়ে আলোচনা হয়। এগুলি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ এক মৌলিক চিন্তার ফসল। কিন্তু আলোচনার সময়ে মনে হয়েছিল, যে চরিত্রগুলো নীরব অশ্রুপাতের ভেতর দিয়ে তাদের মর্মের কথা জানিয়েছে, তারা কেন প্রতিবাদের ভাষা পেল না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কয়েকটি কাব্যনাট্য রচনা করি। আর সেগুলির প্রতিটি নায়িকা চরিত্র প্রতিবাদে সরব। উর্মিলা তেমনই এক চরিত্র।

এই চরিত্রগুলোকে নিয়ে কাব্যনাট্য রচনা শেষ হলে সেগুলি আমার 'বসন্ত বিলাপ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের পরে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার।

শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমারকে ওই গ্রন্থখানি দেখাবার আকাঙ্ক্ষায় একদিন আমি ওঁর বাড়িতে যাই। যথারীতি আমার নাম লেখা স্লিপ এবং বইটি নিয়ে বেয়ারা চারতলায় ওঁর স্টাডিরুমে চলে যায়। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কারও দেখা নেই। আমি অধীর আগ্রহে বসে আছি। এমন সময় সেই বাহকটির পুনরার্বিভাব।

ওপরে চলুন—বলেই আমাকে পথ দেখিয়ে চারতলায় সুনীতিবাবুর স্টাডিরুমে নিয়ে গেল।

অজস্র বইয়ের মাঝখানে মাস্টারমশাই কিছু যেন পড়ছেন বলে মনে হল।

সামনে গিয়ে প্রণাম করতেই উনি তাকালেন। সুনীতিবাবু বরাবরই তাঁর ছাত্রদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন।

আপনি বই পাঠিয়েছেন, তাই আপনাকে ডাকলাম। কিন্তু আজ আমার কথা বলার মতো কোনও সময় নেই। কিছু সময়ের ভেতরেই চলে যেতে হবে পাটনা ইউনিভার্সিটিতে।

একটু থেমে আবার বললেন, এই যে সামনে দেখছেন অজস্র বই, এগুলি লেখকেরা আমায় দিয়ে গেছেন। এগুলোর ওপর মন্তব্য লেখা তো দূরের কথা, আমার পড়ার কোনও সময়েই নেই। আপনিও আপনার বইয়ের জন্য কোনও রকম মন্তব্যের আশা করবেন না।

আমি সবিনয়ে বললাম, আমি আপনার ছাত্র। আমার এই সামান্য সৃষ্টি আমি আপনার কাছে এনেছি, পড়া না পড়া সে আপনার অভিরুচি। আমি দিয়েই তৃপ্ত।

উনি হঠাৎ আমার বইয়ের 'ভূমিকা'র পাতাটায় একবার চোখ বোলালেন।

এতক্ষণ পরে তিনি বললেন, বসুন।

আমি বসতেই তিনি বলে উঠলেন, আশ্চর্য! আমি এই বিষয় নিয়েই পাটনা ইউনিভার্সিটিতে বলতে যাচ্ছি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার অনেকখানি মিল আছে—বলেই তিনি ড্রয়ার থেকে একগোছা কাগজ টেনে বের করলেন। এবার পড়তে শুরু করলেন ইংরেজিতে লেখা তাঁর ভাষণটি।

সত্যি অনেকটাই মিল খুঁজে পেলাম আমার লেখার সঙ্গে।

তারপর সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ।

আপনাকে সুধাময় দাশগুপ্তের সঙ্গে দু'-একবার এখানে দেখেছি।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, হ্যাঁ স্যার, আপনি দেখে থাকবেন। সুধাময়বাবু আমার বন্ধু।

তখন কলেজ স্ট্রিটের কাছে 'বীণা' সিনেমার উলটোদিকে রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেটে বিভূতি সেনগুপ্ত, সুধাময় দাশগুপ্ত এবং আমি প্রায়ই আড্ডা দিতাম। ওঁরা দু'জন ছিলেন শিল্পী। আমি রসগ্রাহী।

সুনীতিবাবু সে সময়ে আফ্রিকার ওপরে একটি বই লিখেছিলেন। আর সে বইয়ের কিছু স্কেচ করার ভার পড়েছিল সুধাময়বাবুর ওপর। মাঝে মাঝে ওই স্কেচগুলো মাস্টারমশাইকে দেখাতে যেতেন, আমিও কোনও কোনও দিন সঙ্গী হতাম।

সুনীতিবাবু ঠিকই মনে রেখেছেন।

এরপর ছোট একটি ঘটনা ঘটেছিল যা আমার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

সুধাময়বাবুর ছবিগুলি আঁকা শেষ হলে মাস্টারমশাই তাঁর পারিশ্রমিকের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

সুধাময়বাবু পরের দিন বলবেন বলে চলে এলেন।

আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হল।

পরের দিন যথাসময়ে সুধাময়বাবু মাস্টারমশায়ের বাড়িতে হাজির।

সুনীতিবাবু বললেন, বলুন কত দিতে হবে?

সুধাময়বাবু মাথা নিচু করে বললেন—স্যার, আপনার কাছ থেকে এ কাজের জন্য কোনও পারিশ্রমিক আমি নিতে পারব না। তবে অনুগ্রহ করে যদি একটি জিনিস দেন, তা হলে ভীষণ আনন্দ পাব।

বলুন কী চান?

আপনি যতগুলো ভাষা জানেন স্যার, সেই সব ভাষাতেই আপনার নাম সই করে দিতে হবে।

সুনীতিবাবু মুচকি হাসলেন। বললেন, খাতা রেখে যান, কাল আসবেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় সুনীতিবাবুর নাম সই করা খাতা নিয়ে সুধাময়বাবু রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেটে হাজির। আমরা তো মুখিয়ে আছি।

দেখি প্রায় আঠারো-বিশটি ভাষায় সুনীতিবাবু তাঁর নাম পরপর সই করে গেছেন।

আমরা সোল্লাসে বললাম, এ যে দেখছি অর্থপ্রাপ্তির চেয়ে আপনার পরমার্থপ্রাপ্তি হয়ে গেল।

গল্পে গল্পে প্রাসঙ্গিকতা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এই প্রসঙ্গের এখানেই আমরা ইতি টানছি।

স্বর্গের রমণী মর্তের জননী

রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকির এক অসাধারণ সৃষ্টি অহল্যা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অহল্যার পাষাণে রূপান্তরিত হওয়ার যে কাহিনী পাই তা আমরা বাল্মীকির রামায়ণে কোথাও পাই না।

ঋষি গৌতমের অভিশাপের পর অহল্যা ছিলেন এক জ্যোতির্ময় সত্তায়। রামচন্দ্র ও ঋষি বিশ্বামিত্রের আগমনের পর অহল্যা শাপমুক্ত হয়ে কায়ারূপ ধারণ করেন। এটি রামায়ণের প্রচলিত কাহিনী।

এই কাহিনীতে গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র তাঁর ছদ্মবেশ ধারণ করে অহল্যার কাছে উপস্থিত হন। অহল্যা কিন্তু ইন্দ্রকে চিনতে পারেন এবং সজ্ঞানে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন।

দেহমনে যখন তাঁরা পরিতৃপ্ত তখনই সহসা তপোবনে গৌতমের আবির্ভাব। আশ্রমে এই অনার্যলীলা দেখে গৌতম সুরপতি ইন্দ্র এবং অহল্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে অভিশাপ দিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বামিত্র এবং রামচন্দ্রের আবির্ভাবে অহল্যা শাপমুক্ত হন।

এ কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। একে অবলম্বন করেই এই উপন্যাসটি রচিত।

এই উপন্যাসের কোথাও অহল্যার অনুতাপ নেই। তাঁর চিন্তা স্পষ্ট, ভাবনা স্বচ্ছ। সেইভাবেই অহল্যাকে চিত্রিত করা হয়েছে।

আশ্রমের সন্নিকটে যে বন্ধ্যা ভূমিটি ছিল ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে সেই ঊষর ভূমিকে প্লাবিত করল জলস্রোত, জেগে উঠল প্রাণ। তেমনই তপোবনের কঠিন নিয়ম বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ অহল্যার ঊষর জীবনে ইন্দ্রের স্পর্শ তাঁকে দিল নবপ্রাণের আস্বাদ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত হয়েছে এই উপন্যাস।

অহল্যা

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যা-কাহিনীর একটি নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক পরম রমণীয়া নারী সৃষ্টি করলেন।

সুরপতি ইন্দ্র সেই নারীকে দর্শনমাত্র মোহিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে নত নমস্কারে বললেন, এই অনিন্দ্যনীয়াকে আপনি কার করে সমর্পণ করতে চান?

সঙ্গে সঙ্গে পিতামহ বললেন, জিতেন্দ্রিয় ঋষি গৌতমের হস্তে এই কন্যাকে সমর্পণ করতে চাই।

কথাটি শোনামাত্রই সুরপতি আশাহত হলেন এবং ম্লান বিষণ্ণ মুখে ফিরে গেলেন সুরলোকে।

এইখানেই আমার ভাবনার শুরু।

একটি পূর্ণযৌবনা নারী তার সামনে প্রথম প্রত্যক্ষ করল এক অতি সুদর্শন পুরুষকে। নিঃসন্দেহে তার অন্তরে ওই পুরুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জন্মানো স্বাভাবিক। আর এটাই যৌবনধর্ম।

কিন্তু তখন অহল্যার নিজ বাসনাকে প্রকাশ করার কোনও শক্তি ছিল না।

এরপর ঋষি গৌতমের বধূরূপে আমরা দেখতে পাই অহল্যাকে।

তপোবনের নিত্যকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন দীর্ঘ সময়। এই কঠিন বন্ধনের মধ্যে অহল্যার বিকশিত যৌবন-বাসনা হয়ত মুক্তি চেয়েছিল।

একটি সুযোগ এল। ঋষি গৌতম কয়েকদিনের জন্য তপোবনের বাইরে কর্মান্তরে চলে গেলেন।

সেই সুযোগ বিফল হতে দিলেন না সুরপতি। তিনি গৌতমেরই ছদ্মবেশ ধারণ করে উপস্থিত হলেন অহল্যার সম্মুখে।

প্রত্যাখ্যানের হয়তো শঙ্কা ছিল, তাই এই ছদ্মবেশ। কিন্তু অহল্যার দৃষ্টি সেই ছদ্মবেশ ভেদ করে চিনে নিল প্রথম-দেখা সেই প্রিয় পুরুষকে। তখন উভয়ের মিলনের কোনও বাধা রইল না।

তারপর গৌতমের প্রত্যাবর্তন এবং অভিশাপ দান প্রচলিত কাহিনীকে অনুসরণ করেই ঘটেছে।

বহুবর্ষ পরে যখন ঋষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে গৌতমের তপোবনে এলেন তখন দেখলেন এক আলোকিত সত্তা নারীরূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমার এই কাব্যনাট্যে রামচন্দ্র এই নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বিশ্বামিত্র, ইন্দ্র এবং অহল্যার গোপন মিলন কাহিনীটি তাঁর অভিশাপের কারণ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

বিশ্বামিত্রের এই কথায় প্রতিবাদ-মুখর হলেন অহল্যা, যদিও এটি মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

আমার এই কাব্যনাট্যে বিশ্বামিত্র এবং শ্রীরামচন্দ্র সংযমের যথার্থ নিয়ে অহল্যাকে বারবার নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু অহল্যা জীবনধর্মের স্বপক্ষে যে অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে শেষ পর্যন্ত অভিভূত হয়েছেন রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, এমনকী ঋষি গৌতমও।

শেষ মুহূর্তে রামচন্দ্র প্রণতি নিবেদন করেছেন প্রখর যুক্তিবাদী রমণীর শ্রীচরণে।

আমাদের সমাজে নারীরা সাধারণত ব্যক্ত করতে পারেন না তাঁদের অন্তরের সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলিকে। সামাজিক শাসনে বিশেষ একটা বন্ধনের মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ হয়ে থাকেন। অহল্যা তাঁদেরই প্রতিনিধি হিসেবে সুপ্ত বাসনাগুলিকে যুক্তিসহ মুক্তি দান করেছেন।

রামায়ণ পাঠের পর এই বিদ্রোহিনী নারীচরিত্রটি আমাকে স্পর্শ করেছিল। তাই আমার কাব্যনাট্যে তাঁকে আমি মর্যাদা দিয়ে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি।

যৌবন

মহাভারতের মহারাজ যযাতির পুত্র পুরুর চরিত্র আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ব্যাসদেবের এ এক অনন্য কল্পনা।

সম্পূর্ণ সক্ষম মহারাজ যযাতি যখন ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জরাগ্রস্ত হলেন তখন কিন্তু তাঁর অন্তর পূর্ণ ছিল পার্থিব ভোগবাসনায়। তিনি তাঁর পুত্রদের কাছে জরার পরিবর্তে যৌবন প্রার্থনা করলেন।

কেউ কিন্তু পিতার জরা গ্রহণ করতে চাইল না। একমাত্র পুরুই পিতাকে স্বেচ্ছায় দান করলেন তাঁর যৌবন।

দীপ্তিমান যুবক জরাগ্রস্ত হয়ে প্রাসাদের অন্তরালে বসে রইলেন।

এখানে আমি আমার উপন্যাসে একটি নতুন চরিত্র সংযোজন করেছি।

রাজ-মালঞ্চের মালির কন্যা ছিল পুরুর প্রেমিকা। দু'জনের যৌবন-বাসনা পরস্পরের সান্নিধ্যে পুষ্পিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বিচ্ছেদ ঘটল দুটি হৃদয়ের।

দীর্ঘকাল পরে মহারাজ যৌবনকে নানাভাবে উপভোগ করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন তাঁর উপলব্ধিতে এল, আকাঙ্ক্ষার কখনও নিবৃত্তি নেই, যজ্ঞে ঘৃতাহুতির মতো সারাক্ষণই প্রদীপ্ত হয়ে থাকে।

তিনি তাঁর প্রিয়পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে দিলেন।

কিন্তু পুরু ভোলেননি তাঁর প্রেমিকাকে। তাই তিনি তাঁর সেই ফিরে পাওয়া যৌবনদীপ্ত দেহখানি নিয়ে ছুটে গেলেন রাজ-মালঞ্চে তাঁর সেই প্রেমিকা মালিনীর সন্ধানে।

পুরু তাঁর যৌবন ফিরে পেলেও মহাকাল স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ কয়েকবছরে কালের স্পর্শে মালিনী রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল বিগত যৌবনা এক নারীতে।

যখন দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারল তখন পুরু কিন্তু তাঁর পূর্বের কথা স্মরণ করে সেই প্রবীণার মুখটিকে তুলে ধরলেন পরম অনুরাগে।

এখানে প্রেমই যে দেহাতীত এক শাশ্বত অনুভব তাই প্রমাণিত হল।

মহাকালের উর্ধ্বেও যে প্রেমের অবস্থান তা আমি এই উপন্যাসে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

সত্যবতীর শাখা-প্রশাখা

আমার বিবেচনায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বে সর্বকালের অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সৃষ্টিকর্মের ব্যাপ্তি আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে। বারে-বারে মনে হয় এমন বিশাল এক প্রতিভার সৃষ্টি কী করে সম্ভব হল!

জন্মসূত্রে বেদমন্ত্রের অন্যতম স্রষ্টা প্রতিভাবান ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন তাঁর প্রপিতামহ। সাধকশ্রেষ্ঠ শক্ত্রি ছিলেন তাঁর পিতামহ। ঋষি পরাশর ছিলেন তাঁর জনক। পিতৃসূত্রে এইসব প্রতিভাবান পুরুষদের প্রজ্ঞা এবং মেধা তিনি যেমন লাভ করেছিলেন তেমনই অনার্য মাতৃকুলের বিস্ময়কর শক্তি ও স্বভাবধর্ম তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

আমার মনে হয় এই পৃথক দুই প্রবাহের মিশ্রণের ফলে তাঁর মধ্যে এতখানি শক্তির তরঙ্গোচ্ছ্বাস সম্ভব হয়েছিল।

ঋষি বশিষ্ঠ যেমন আর্যকুলোদ্ভবা অরুন্ধতী প্রভৃতিকে সহধর্মিণী রূপে লাভ করেছিলেন তেমনই অনার্য কুলজাত চণ্ডালিনীও ছিলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী। ঋষি শক্ত্রির জননী ছিলেন অনার্যকুলজাত। মহর্ষি পরাশরের জননীও আর্যকুলোদ্ভবা ছিলেন না।

সত্যবতীকে যতই উচ্চবর্ণসম্ভূতা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হোক না কেন, তিনি যে দাশরাজকন্যা ছিলেন এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের বিশেষ কোনও অবকাশ নেই।

ব্যাসদেব যেমন আর্যঋষি এবং ব্রাহ্মণকুলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁদের শক্তি ও প্রতিভার প্রতি তিনি যেমন তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন, তেমনই অনার্যদের প্রতিও একইভাবে ছিল তাঁর অন্তরের গভীর আকর্ষণ।

আমরা তাঁর বিপুল সৃষ্টির মাঝে এই মানসিকতার ছবি বারবার ফুটে উঠতে দেখি। সেখানে তিনি অন্যায়ভাবে অনার্যদের প্রতি আঘাতকে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যেখানে আর্যদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সংশয় জাগে।

ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের অঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করলেন। সরল অনার্য যুবক একলব্য পরম আনন্দে সেই অঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণারূপে দান করে যেন কৃতার্থ হল।

এতবড় শক্তিমান ধনুর্ধরের শক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে কোনও গ্লানি এল না আর্যগুরু দ্রোণাচার্যের অন্তরে। তিনি উচ্চকুলোদ্ভব শিষ্য অর্জুনকে খুশি করতে পেরে নিজে মহা পরিতৃপ্ত হলেন।

অন্যদিকে আমরা রাক্ষসমাতার পুত্র ঘটোৎকচকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখতে পাই। পিতৃসূত্রে সে পাণ্ডবকুলের সন্তান।

যুদ্ধক্ষেত্রে সে যখন কৌরবসৈন্যকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছিল তখন কাতর দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, সখা, এই মুহূর্তে তুমি তোমার ইন্দ্র-অস্ত্র প্রয়োগ করে ওই রাক্ষসীর পুত্রকে সংহার করো। না হলে আজই সমগ্র কুরুসৈন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইন্দ্র-অস্ত্রটি ছিল অর্জুন নিধনের জন্য, সেটি প্রয়োগ করা হল ঘটোৎকচ বধের উদ্দেশ্যে।

এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্য অনার্যের মানসিকতার যথার্থ ছবি।

ঘটোৎকচ নিধনের পর পাণ্ডব শিবির যখন শোকে স্তব্ধ, তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে রথের ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করছেন।

যখন পাণ্ডবেরা তাঁর এই ব্যবহারের জন্যে বিস্মিত তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ইন্দ্র প্রদত্ত অস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গেছে সখা অর্জুন। তাই আমি আমার আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না।

সমগ্র মহাভারতে ব্রাত্যজনের এমনই একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়।

এরপর আমরা দুটি চরিত্রকে স্মরণ করব যা মহাভারতকারের সৃষ্টি। তাঁরা একান্ত অন্ত্যজ কিন্তু ব্যাসদেব তাঁদের গৌরব দান করেছেন।

আমার ভ্রাতৃপ্রতিম শাস্ত্রজ্ঞ ও রসজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের কথা'-র থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

তপস্বী জাজলি ও ব্রাহ্মণ কৌশিক দুজনেই কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই কঠোরতা ও তীব্রতা বিস্ময়কর। কিন্তু কেউই প্রকৃত ধর্মের, প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চরম ধর্মতত্ত্ব লাভ করলেন এমন দুজন লোকের কাছে যাঁরা জন্মে, বৃত্তিতে, জীবনে অতি তুচ্ছ এবং হীন। একজন কাশীর সামান্য বণিক, আর একজন মিথিলার নীচ কসাই।

'ব্রাহ্মণ জাজলি দীর্ঘকাল বনবাসে কঠোর তপস্যা করেছেন। তপস্যায় অনেক সিদ্ধিলাভও করেছেন তিনি।...

'জাজলি মনে মনে বললেন, তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ ধার্মিক বোধহয় আর কেউ নেই।

'এমন সময় তিনি শুনলেন, কারা যেন অদৃশ্য কণ্ঠে বলছে, ব্রাহ্মণ, এমন কথা কাশীর তুলাধার বণিকও বলেন না।

'তাই নাকি? তিনি তবে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক?

'জাজলি তখন চললেন, কাশীতে তুলাধারকে দেখতে। কেমন সেই ধার্মিক একবার দেখতে হয়।

'কাশীতে এসে তুলাধারকে দেখে জাজলি অবাক হন। এ তো একজন সামান্য মুদি! দোকানে বসে জিনিসপত্র ওজন করে বিক্রি করছে। জাজলি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন আর ভাবছেন।

'হঠাৎ তুলাধার তাঁকে দেখতে পেয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আসুন। আপনি যে আমার কাছে আসছেন, আপনার সকল তপস্যা ও সিদ্ধির কথা আমি জানি। আকাশবাণী শুনে আমাকে দেখতে এসেছেন, ভাবছেন, এই লোকটা আবার ধার্মিক হল কেমন করে?

'তুলাধারের প্রজ্ঞাদৃষ্টি দেখে জাজলি স্তম্ভিত হলেন। তখন তুলাধার তাঁকে ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সরল ও সাধারণ কয়েকটি কথা বললেন।

'তুলাধার বললেন, আমার বৃত্তি সামান্য। কিন্তু আমি কখনও ছল কপটতা বা অসত্য অবলম্বন

করি না। আমার মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা করি। নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, লোষ্ট্র-কাঞ্চন আমার কাছে সমান। আমার হাতের এই দাঁড়িপাল্লার মতই জগতের সব কিছু আমার কাছে সমান।...

'ব্রাহ্মণ কৌশিকও স্বনামধন্য তপস্বী। তিনি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন।...তথাপি তাঁর সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি নেই যাতে ধর্মের সূক্ষ্ম গতি লক্ষ করতে পারেন। এক সতীসাধ্বী তাঁকে বলে দিলেন, মিথিলাতে যাও, সেখানে এক ব্যাধ আছেন, তাঁর কাছে ধর্মের তত্ত্ব জানতে পারবে।

'কৌশিক এলেন মিথিলাতে।

'ধর্মব্যাধকে দেখলেন, কসাইখানায় বসে হরিণ আর মহিষের মাংস বিক্রয় করছে। তাকে ঘিরে অনেক ক্রেতার ভিড় । তার হাতে পায়ে পশুর রক্তে মাখামাখি। ব্রাহ্মণ এক পাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন, এ কেমন কথা?

'ব্যাধ কৌশিককে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম। আপনি যে আমার কাছে আসছেন, কেন আসছেন জানি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি হাতের কাজ সেরে নিই।

'কাজ শেষ করে ব্যাধ বললেন, এই বিশ্রী জায়গায় আপনার মতো ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। আপনি আমার গৃহে চলুন।

'ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করে নিজের গৃহে এনে ব্যাধ তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। তারপর কৌশিকের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।...

'সমাজ কল্যাণের জন্য চারিবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ বৃত্তি পালনই স্বধর্ম পালন। তাতে সমাজে শৃঙ্খলা আসে, শ্রীবৃদ্ধি হয়।

'ধর্মব্যাধের মতে, এই যে বর্ণাশ্রম, তা সৃষ্টি হয়েছে জন্মসূত্রে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, শূদ্রের পুত্র শূদ্র। আমি যে কসাইখানায় বসে মাংস বিক্রয় করছি তাতে আমি দুঃখিত নই বরং এই আমার ধর্মলাভের পথ ও উপায়।

...'এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, 'শরীর একটা নদী, পঞ্চইন্দ্রিয় তার জল, জন্ম-মৃত্যুর দুর্গম প্রদেশে এই নদী বয়ে চলেছে।'

লীলারহস্য

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যের মধ্যে কচ দেবযানীর প্রেম ও প্রত্যাখ্যানের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনই উপভোগ্য। কিন্তু মহাভারত পাঠে আমরা কচ দেবযানী সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারি। সেই সমগ্র কাহিনীর বিস্তার নিয়েই আমার এই উপন্যাসের সৃষ্টি।

এখানে প্রেমের সঙ্গে সামাজিক অনুশাসনের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

একটি বহতা নদীর স্রোতকে যেন বাঁধের বন্ধনে আটকানো হয়েছে। রুদ্ধ জলস্রোত বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু নির্গমনের পথ না পেলে সে বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

এখানে কচ ও দেবযানীর প্রেম ও প্রেমের ব্যর্থ পরিণতিকে এইভাবে চিত্রিত করা যায়।

তপোবনের মনোরম পরিবেশে দুইটি তরুণ হৃদয়ের সান্নিধ্য পরস্পরকে বারেবারে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সহসা কচের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে, তাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা নিয়ে স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে ব্যর্থ প্রেমের আক্ষেপ।

কচ তার প্রত্যাখ্যানের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলছে এ মিলন সম্ভব নয়, কারণ দেবযানী তার

সম্পর্কে ভগ্নী। সে নানা যুক্তি দিয়ে এই সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। হয়তো তার যুক্তিগুলি অকাট্য, কিন্তু কর্তব্যসাধনের জন্য স্বর্গে প্রস্থানের তাগিদও কাজ করেছে তার মধ্যে।

দেবযানী কিন্তু তার প্রেমে অবিচল। এতদিনের স্মৃতিমধুর প্রেমকে সে কোনও কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করতে পারল না। শুধু সম্বল রইল তার স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

উর্বশী ও পত্রলেখা

অনন্তযৌবনা উর্বশী দেবলোকের কাঙ্ক্ষিতা নর্তকী, সুরপতির চিরবাসনার ধন। ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সুরলোকে এসে বহুভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্রামলগ্নে দেবরাজ উর্বশীকে পাঠালেন অতিথির মনোরঞ্জন করতে। কিন্তু অর্জুনের সামাজিক, সংবর্ধিত চিত্ত কোনওভাবেই জন্মদাতা বাসবের চির আকাঙ্ক্ষিত জনকে স্পর্শ করতে চাইল না।

মনোরঞ্জনই যার একমাত্র বৃত্তি, তার কাছে এ প্রত্যাখ্যান অসহ্য বলে মনে হল।

একজন তাকে জননী বলে সম্ভাষণ করছে, অপরজন তাকে লীলারসধারায় স্নান করাতে চাইছে,—এই সংঘাতই 'উর্বশী' কাব্যনাট্যটি রচনার প্রেরণা।

অনুরূপভাবে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাহিনীর দুটি চরিত্র আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় তাঁর পরিচর্যার জন্য পরিচারিকারূপে পেয়েছিলেন কুলুতেশ্বরের বন্দিনী কন্যা পত্রলেখাকে।

পত্রলেখা যুবরাজের ভ্রমণে, মৃগয়ায়, এমনকী দিগ্বিজয়েরও সঙ্গিনী ছিল। যুবরাজ অশ্ব কিংবা হস্তী পৃষ্ঠে যখন আরোহণ করতেন তখনও তাঁর পাশে থাকত পত্রলেখা। নিশীথে যুবরাজ শয্যাগ্রহণ করলে পত্রলেখাকে দেখা যেত ছায়াসঙ্গিনীর মতো ক্ষিতিতলে অবস্থান করতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যৌবনের মূর্তিমতী সৌন্দর্য-প্রতিমা হয়েও, এবং এত নিকট সান্নিধ্যে থেকেও কোনওদিন যুবরাজের প্রেমের স্পর্শ পায়নি পত্রলেখা।

এমনকী গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের প্রণয়লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল সে।

স্বরাজ্য উজ্জয়িনীতে বিশেষ প্রয়োজনে যখন চন্দ্রাপীড়কে চলে যেতে হল, তখন কাদম্বরীর বিরহ অপনোদনের জন্য যুবরাজের আদেশে গন্ধর্বপুরীতে থেকে যেতে হল পত্রলেখাকে।

নিজের একান্ত যন্ত্রণার অশ্রুকে রুদ্ধ রেখে অন্যের বিরহ-বেদনার অশ্রুকে মুছিয়ে দেওয়া যে কী দুঃসহ বেদনার, তার বিস্ময়কর উদাহরণ পত্রলেখা।

রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর হৃদয়কে একসময় আলোড়িত করেছিল এই চরিত্রটি। তাঁর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে এই উপেক্ষিতার গোপন অশ্রুবিন্দু দিয়ে অনবদ্য মুক্তামালা রচনা করেছেন।

আমার কাব্যনাট্যে পত্রলেখা তার দীর্ঘশ্বাসকে গোপন রাখেনি। বিশেষ একটি পরিবেশে সে চন্দ্রাপীড়ের কাছে প্রকাশ করেছে তার রুদ্ধ যন্ত্রণা ও ক্ষোভ।

ঊর্মিলা

উর্মিলা

সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকাশোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময়, সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ সীতাদেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নতদৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন; যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল!

[কাব্যের উপেক্ষিতা]—রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গকথা

লক্ষ্মণবধূ ঊর্মিলার নীরব নিভৃত অশ্রুপাত একদিন বিচলিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর কবিমানস। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র পাঠকমাত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঊর্মিলার ব্যথার সরোবরে একবিন্দু হলেও সহানুভূতির অশ্রুবারি ঝরিয়ে দিয়েছেন। আমার কল্পনায় ঊর্মিলাকে আমি যে মূর্তিতে দেখেছি সেইভাবেই তাকে পাঠকসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছি। যে সলজ্জ বধূ অযোধ্যার নিভৃত লীলানিকেতনে একদিন সৌমিত্রির চপল করস্পর্শে নিজেকে একান্তভাবে সংকুচিত রেখে সর্বোত্তম সমর্পণের ভাবটি প্রকাশ করত, সহসা প্রিয়তমের সঙ্গে নিদারুণ বিচ্ছেদে তার একান্তভাবে ভেঙে পড়ারই কথা। কিন্তু প্রথমে সে অসহায় নবোঢ়ার মতো নিরন্তর অশ্রুপাত করলেও দীর্ঘ চোদ্দোটি বছর নিশ্চয়ই তার মনে আরও অনেক রকমের সংক্ষোভ আর আলোড়নের ক্রিয়া চলেছিল।

ঋতুচক্রে অকৃপণা প্রকৃতি এই পরিত্যক্তা বধূটির কাছে তার বৈভবের জাদুবিস্তারে যে বিরত থাকেনি, একথা আমার মনে হয় সকল সহৃদয় পাঠকই স্বীকার করে নেবেন।

ঊর্মিলার মন প্রকৃতির মায়া-শরক্ষেপে নিশ্চয়ই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; তার যৌবনবাসনা পীড়িত হয়েছে বারবার। কোমল পাতার মতো ঊর্মিলার যে মনটি একদিন থরথর করে কাঁপত, তা বিষাদ বিষণ্ণতার পাষাণভারে দীর্ঘ সংক্ষোভ আর আলোড়নের ফলে আশ্চর্য এক ফসিলে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু যার পরিচয়টুকু রয়ে গেছে পত্র হিসেবে, কিন্তু না আছে তার বর্ণ, না আছে তার কোমলতা আর না আছে তার কাঁপন।

দীর্ঘ চোদ্দো বছর পরে লক্ষ্মণ যে ফিরে এসেছিলেন সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তন আর একটি মনের ওপর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন।

প্রতিটি তিথিতে তিলে তিলে সঞ্চিত বিরহবেদনা চতুর্দশী লগ্নটি পার হলেই নিজেকে একেবারে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় বিদীর্ণ করে দেয়। তখন সমস্ত সঞ্চিত ব্যথার ঊর্মি দুর্নিবার কল্লোলে তটভূমিকে ভগ্ন ও প্লাবিত করে দিয়ে যায়। ঊর্মিলার দীর্ঘ চোদ্দোটি বছরের পুঞ্জিত ব্যথার ঊর্মি এমনি করে একদিন লক্ষ্মণের সঙ্গে পুনর্মিলনের লগ্নে যে উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়েনি, এ কথা কে বলবে!

[চতুর্দশ বর্ষ বনবাস ও যুদ্ধকাণ্ডের পর রামসীতাসহ লক্ষ্মণ ফিরে এলেন অযোধ্যায়। প্রথানুসারে গুরুজনদের সঙ্গে বিবিধ আলাপে দিন যাপন করে নিশাকালে সৌমিত্রি এসে দাঁড়ালেন বহুবর্ষের পরিত্যক্ত বিশ্রাম কক্ষে। কক্ষের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষণকাল স্মৃতিচারণ করলেন। গৃহের অভ্যন্তরে অন্ধকার, শুধু এক কোণে দীপাধারে প্রজ্বলিত একটি মণিদীপ।]

লক্ষ্মণ :

এই সেই রতিগৃহ, দেহলীতে কপোত কপোতী
আশ্চর্য ভাস্কর্যে বাঁধা, লীলামত্ত পুষ্পধনু রতি;
যেন কোন জন্মান্তরে সবকিছু স্বপ্ন মনে হয়,
প্রিয়ঙ্গু লতার বুকে দুধবর্ণা জ্যোৎস্নার বিস্ময়
ওই দূরে জেগে আছে; বসন্তের বিহ্বল দূতীরা
কর্ণিকার পুষ্পপাত্রে রেখে গেছে সুবর্ণ মদিরা,
পান করো, পান করো উপবাসী প্রেমের ভিখারী।

ঊর্মিলা :

চুপি চুপি কথা কও, ছায়াবৃতা আমি অন্য নারী;
সবন-প্রমত্ত ধ্বনি জাগায়ো না শান্ত অন্ধকারে
এখানে তপস্যা কাঁপে বৈদূর্যমণির দীপাধারে।

লক্ষ্মণ :

ঊর্মি, ঊর্মি, ঊর্মিমালা, কোথায় ঊর্মিলা!

ঊর্মিলা :

কে ডাকে, সমুদ্র-পাখি? সব ঊর্মি হয়ে গেছে শিলা।
রুপালি মাছেরা সব শিলীভূত হয়ে গেছে কবে;
সব খেলা শেষ করে স্মৃতি-শ্রান্ত ঘুমায় নীরবে
সমুদ্র-শঙ্খের দল; এ ভগ্ন পাষাণ দেহে আজ
নেই স্বর্ণ কাঞ্চীদাম, খসে গেছে নীলসিন্ধু সাজ।

লক্ষ্মণ :

চতুর্দশ বর্ষ পরে দেখো চেয়ে অরণ্য সায়রে
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত পাখি ফিরে আজ এসেছে সে ঘরে
নীড়ের উত্তাপ দাও, শোনাও ঊর্মির কথকতা;

ঊর্মিলা :

নীড় ভেঙে গেছে ঝড়ে, বনস্পতি-বক্ষলগ্ন লতা
হয়েছে আশ্রয়হারা, লুটায় ধূসর মৃত্তিকায়
কামনার ফুলগুলি, ধূলিম্লান তৃণের শয্যায়।

লক্ষ্মণ :

সুকঠিন তপস্যায় সিদ্ধি যাহা করেছি অর্জন
পুণ্যফল নাও তার, সে পরম আকাঙ্ক্ষিত ধন
হে কল্যাণী জেনো তাহা সুরবাসী জনেও দুর্লভ।

ঊর্মিলা :

সে ধন কুবের-কাম্য, জানি তাহা হে মহানুভব,
নভঃস্পর্শী কর্তব্যের হিমাচল করেছ রচনা
সবিতা-হিরণ্য-দীপ্তি তারে ঘিরে রচে আলপনা,
ভুবন বিস্ময়-মুগ্ধ; ভ্রাতৃভক্তি কোথাও কি কেউ
এমন দেখেছে কভু! উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ঢেউ
প্লাবিত করেছে বিশ্ব; স্মরণীয় শিলার লিখন
তোমার ও কীর্তিগাথা, তবু এই দীন অকিঞ্চন
তোমার অর্জিত পুণ্যে দূর হতে করে নমস্কার,
বহু মূল্যে কেনা পুণ্য, নাহি চাই তিল অংশ তার।

লক্ষ্মণ :

ত্যাগ করো অভিমান, ক্লান্ত আত্মা মাগিছে শরণ
সরযু হৃদয় হোক, স্নানার্থীরে দাও আলিঙ্গন।

ঊর্মিলা :

খর বালুশয্যা রচি সরে গেছে হৃদয়ের নদী
শান্তি নেই শুধু দাহ, এখানে বিশ্রাম চাও যদি
মিথ্যা হবে সে প্রয়াস, একদিন তৃষ্ণা জলধার
যে নদী জোগাত আজ সরে গেছে বিস্মৃতির পার।

লক্ষ্মণ :

শোনো তবে হে মানিনী, চতুর্দশ বর্ষ ব্রহ্মচারী
এ লিখন বিধাতার, না হলে সে জলদ-বিহারী
মেঘনাদে বধ করা কখনও যে হত না সম্ভব,
নিঃশঙ্ক হলেন ইন্দ্র, রাক্ষসের হল পরাভব;
স্বর্গ দিল সাধুবাদ, তুমি তার ন্যায্য অধিকারী
দুঃসহ বিচ্ছেদ ভোগ করেছ হে মহিয়সী নারী।

ঊর্মিলা :

পরম কলঙ্ক এক পুণ্যের পরেছে ছদ্মবেশ
সেই পুণ্যফলভাগী, এ আমার যন্ত্রণা অশেষ,
নিকুম্ভীলা যজ্ঞাগারে হত নয় রাবণ আত্মজ
অস্ত্রহীনে হত্যা করে স্বয়ং নিহত রামানুজ।

লক্ষ্মণ :

হে নারী, পৌরুষবাক্য একান্তই সত্য বলে গণি
কিন্তু সে কপটাচারী অধর্মের আশ্রিত রাবণি

মেঘের আড়ালে থেকে তীক্ষ্ণ শর করেছে সন্ধান,
যদি হই অপরাধী, সে পাবে না বীরের সম্মান।
তবু বলি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো শুধু আজ রাতে,
ফুটুক করবীগুচ্ছ ওই বরতনুর শাখাতে
আজ নিশি মধু হোক, সব ভাষা হোক মঞ্জুভাষা,
স্মৃতি হোক সুরভিত, দূর করো সঞ্চিত পিপাসা।

ঊর্মিলা :

পিঞ্জরে আবদ্ধ আমি শৃঙ্খলিত বন্দি এক পাখি
কী এক অসহ স্বপ্নে থেকে থেকে শুধু উঠি ডাকি!
সুপ্তি থেকে জেগে বলি, হে আমার নিষ্ঠুর ঈশ্বর
অন্ধ করে দাও মোরে, আমি ওই উন্মুক্ত অম্বর
যেখানে মধুর মতো আলোর প্রসাদ বিন্দু ঝরে
দেখব না, দেখব না অভিশপ্ত এই আঁখি ভরে;
অন্ধকার দিয়ে গড়া আমার এ শপ্ত কারাগার,
আলোর আত্মীয় তুমি মিথ্যা কেন এ মৃত্যু-বিহার?

লক্ষ্মণ :

এনেছি তোমার তরে অরণ্যের অপূর্ব সংবাদ
কী অভিলষিত তৃপ্তি সুচিক্কণ শ্যামলের স্বাদ,
আরণ্যক দিন হতে খসে-পড়া দু'-একটি তারা
তোমার নির্জন কক্ষে এনে দেবে আলোর ইশারা;
কী প্রার্থিত পঞ্চবটী, বায়ু যেথা প্রাণের আরাম
সেখানে জপেছি নিত্য তোমার ও মধুক্ষরা নাম;
পীযুষবাহিনী নদী গোদাবরী, পূর্ণ জলভার
স্পর্শে তার মনে হত সুধাস্বাদ ও বক্ষ তোমার;
ছায়াছত্র ধরে বৃক্ষ, ঠিক যেন তোমার অঞ্চল
ঢেকেছে প্রতপ্ত শির, তুমি বসে আছ অচঞ্চল;
অরণ্যের অন্তঃপুরে কী বিচিত্র ঋতুপত্র জাগে
একে একে ফোটে কলি, আমি দেখি মুগ্ধ অনুরাগে
কে যেন পাঠায় লিপি বনবাস যন্ত্রণায় স্মরি,
আমি সেই লিপি-লেখা পল্লবে কুসুমে পাঠ করি।

শোনো শোনো সুকল্যাণী, বর্ষা নামে পঞ্চবটী বনে
বর্ষা নামে মেঘমন্দ্রে, বর্ষা নামে পবন স্বননে,
বৃষ্টি ঝরে শিলাতলে, বৃষ্টি ঝরে অরণ্যের শিরে
বৃষ্টি করে মন্ত্রোচ্চার শীতলাঙ্গী গোদাবরী নীরে।

পর্ণগৃহ স্বপ্নমুগ্ধ সুখশ্রুত সলিল বাচনে
শ্রীরাম জানকীসহ নিরত নিভৃত আলাপনে,
আমি সেই ধারাস্নানে হৃদয়ের তাপ শান্ত করি
কদম্ব কেশর দেখে ক্ষণে ক্ষণে উঠি যে শিহরি;
ক্ষান্ত হলে ধারাপাত ছুটে যাই পদ্ম সরসীতে
ব্যথিত বিস্ময়ে দেখি পদ্মপত্রে একান্ত নিভৃতে
রেখে গেছে অশ্রুবিন্দু, অশ্রু নয়, ব্যথার মুকুতা,
সে আমার অভিজ্ঞান, বিরহিনী জনকের সুতা।

কী আশ্চর্য বনভূমি ঋতু সেথা পূর্ণ মধুক্রম
ঝরায় মধুর বিন্দু; আমাদের অরণ্য আশ্রম
পুলক রোমাঞ্চে কাঁপে, কী অমেয় অমৃত প্রসাদ,
আমি শুধু ভোগ করি স্মৃতির মোহিত অবসাদ।

শ্রীমন্ত শরৎ নামে সপ্তপর্ণ তরুর শাখায়
সূর্যের উত্তরী লোটে নীলকণ্ঠ পাখির পাখায়,
প্রিয়ক তরুর অঙ্গে কাঞ্চনের দান মহোৎসব
গোদাবরী নীর হতে ভেসে আসে চক্রবাক রব,
অসি কান্তি জলভার, প্রস্ফুটিত কহ্লার কুসুম
দূর খেতে শোভমান স্বর্ণকান্তি সুপক্ক গোধূম;
আকাশ হৃদয় কার, নদী কার প্রেমের প্রবাহ
বিকচ কমল কার কামনার অনির্বাণ দাহ!
সে এক আশ্চর্য নারী, শরতের বন পূর্ণিমায়
অরণ্য আড়ালে থাকি কারে যেন ফিরে ফিরে চায়,
শ্রীরাম জানকী দেবী কুটিরেতে তন্দ্রায় মগন
নিশি জেগে আমি করি রহস্যময়ীর অন্বেষণ।

কত পল অনুপল, কত ঋতু বর্ষ পার হয়ে
আমার সন্ধান আজ শেষ চায় তোমার আশ্রয়ে।
সুদক্ষিণা শান্তি দাও, ঘুচে যাক সকল সন্তাপ
শ্রান্তপক্ষ এ কপোত দাও তারে নীড়ের উত্তাপ।

ঊর্মিলা :

সবই সত্য আর্যপুত্র, সত্য ওই ছায়ার সন্ধান
শুধু সত্য নয় এই ধরণীতে নারীর সম্মান!
পিতৃসত্য রক্ষাকল্পে শ্রীরাম হলেন বনবাসী
সঙ্গিনী হলেন সীতা, অরণ্যের দুঃখ অভিলাষী;

ভ্রাতৃপ্রেম আরও সত্য, সেই সত্যে অটুট বিশ্বাস
অগ্রজের সাথে সাথে নিলে তুমি স্বেচ্ছা-বনবাস;
রাজার নন্দিনী সীতা কেমনে অরণ্য দুঃখ সয়
জগৎবাসীর কাছে এই এক পরম বিস্ময়,
আমি জানি এই সত্য, চিরদিন পরিণীতা চায়
স্বামীর উত্তপ্ত সঙ্গ; সীতা থাকি অরণ্য ছায়ায়
মনে মনে জানে তাহা অযোধ্যার চেয়ে প্রার্থনীয়
স্বামীর বলিষ্ঠ বাহু সব দুঃখে করে বরণীয়;
জানকী সৌভাগ্যবতী, মনে মনে শ্রদ্ধা করি তাঁরে
তবু তাঁর এই ভাগ্য আমার বঞ্চিত কামনারে
করেছে যন্ত্রণাময়; আমি শুধু এই কথা ভাবি
কী করে হেলায় তুমি দলে গেলে নারীত্বের দাবী!
শিরে বহি সাধুবাদ রাম সহ গেলে চলি বনে
ফিরে না দেখলে চেয়ে নারী এক কাঁদে সংগোপনে;
কোথা রেখে গেলে তারে, কার কাছে? বদ্ধ কারাগারে
কেটেছে তাহার দিন নিত্য নিত্য ভাগ্যের ধিক্কারে।
কুমারী কন্যারে তুমি বধূরূপে করেছ বরণ
দেহে তার যৌবনের স্পর্শ রেখে একী আচরণ!
নিঃশব্দেতে গেলে চলি দায়হীন সম্পূর্ণ বিবাগী
রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যায় শুধু দু'দণ্ডের লাগি
নাহি থাকে কোনও দায়, কোনও মায়া, কোনও আকর্ষণ
নাটকের শেষ অঙ্কে ফিরে যায় অন্য কোনও জন।
আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন পুরুষের শক্তি বলে মানি
সে কামনা রক্ষা করা পুরুষের ধর্ম বলে জানি,
ভ্রাতৃপ্রেম ধর্মে রেখে হলে আজ জগতে মহান
কী গৌরব পেলে তুমি রমণীরে করে অপমান?
শুনেছি অরণ্যবাসে তোমার বীর্যেতে মুগ্ধ নারী
এসেছিল একদিন মোহগ্রস্ত ও প্রেমভিখারি,
রূপহীনা করি তারে বীরত্বের দিলে পরিচয়
প্রেমে ব্যর্থ সেই নারী যন্ত্রণায় বিক্ষত হৃদয়
কী অসহ অপমানে কাটায়েছে তার রাত্রিদিন
আমি জানি ভুক্তভোগী, আরও জানি পুরুষত্বহীন
ওই বীর্য রমণীর কভু নয় কামনার ধন;
যদি তুমি সেই দিন দু'নয়নে এঁকে প্রেমাঞ্জন
বেঁধে নিতে সে নারীরে তোমার বলিষ্ঠ বাহু পাশে
যেমন মানসগামী হংসরাজ উন্মুক্ত আকাশে

প্রেমভরে নিয়ে যায় মৃণালেরে চঞ্চুপুটে ধরি,
আমি জেনো পত্নীত্বের সর্ববিধ দাবি ত্যাগ করি
দিতাম অধীর করতালি, হে আমার বীর্যবান,
জুড়াত সকল জ্বালা, সব গ্লানি, সব অপমান।

লক্ষ্মণ :

তুমি নারী প্রিয়ংবদা এই সত্য জানি চিরদিন
কামনারে কাম্য ভেবে নিজেরে কোরো না কভু হীন
রূপ সে তো মোহমাত্র, অন্তরের অমৃত প্রসাদ
সঞ্চিত হৃদয়ে যার, কোনওদিন কোনও অবসাদ
পীড়ন করে না তারে; কামনা সে রূপের সঙ্গিনী
অন্তরের অন্তঃপুরে প্রশ্রয় দিয়ো না সীমন্তিনী।

উর্মিলা :

সত্যেরে ঢেকো না আর মিথ্যার মোহন ছদ্মবেশে
আচরণ কোরো না যা তাই তুমি একান্ত অক্লেশে
বলে চলে গেলে আজ; শোনো বন্ধু শোনো তবে বলি,
জনকের রাজগৃহে চারি ভ্রাতা এলে মহাবলী
সজ্জিত সুন্দর কান্তি, তারপর বিবাহ বাসরে
একে একে নিলে ঠাঁই; আমরাও পুষ্পমাল্য করে
দাঁড়ালাম তোমাদের নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে,
সেই লগ্নে সীতা আর শ্রুতকীর্তি মাণ্ডবীর মুখে
যে রতি-নিষ্প্রভ দ্যুতি ফুটেছিল আঁখি অনুপম,
সেই রূপরাশি মাঝে আমি যদি হতাম বিষম
কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ, কদাকার, ঘোর কৃষ্ণকায়,
বলো প্রিয় সে বাসরে বরণ কি করতে আমায়
সম্পূর্ণ সানন্দ চিত্তে? কখনও তা পারে নাকো কেউ
কারণ দেহের তটে চিরদিন কামনার ঢেউ
উচ্ছ্বসিত আবেগেতে ভেঙে পড়ে, এ তো মিথ্যা নয়
মিথ্যা শুধু জেনো ওই দেহহীন প্রেম অভিনয়।

লক্ষ্মণ :

চতুর্দশ বৎসরের যুদ্ধ আর বনবাসে স্মরি
অভিমান ত্যাগ করো হে আমার আত্মার ঈশ্বরী।

উর্মিলা :

অভিমান ছিল বটে স্বপ্নের সঙ্গিনী একদিন
উজ্জ্বল পাখার দাঁড় টেনে তারা হয়েছে বিলীন

বহু দূর হিমপ্রস্থে; এখন সেখানে আছে শুধু
জলহীন, ফলহীন, শস্যশূন্য মরুভূমি ধূ-ধূ।
শোনো তবে বলি আর্য, কী নির্মম নিষ্ঠুর শ্মশান
আমার সত্তারে ঘিরে বহ্নিকুণ্ড করেছে নির্মাণ
এই চতুর্দশ বর্ষ; রাজপুরী যেন কারাগার,
বন্দিনী জীবন কাটে, কী দুঃসহ সময়ের ভার
আমায় পীড়ন করে; অদূরেতে সরযু চঞ্চলা
কত দেশ দেশান্তরে ধায় নদী বেণীকৃতজলা,
বসে থাকি বাতায়নে, মন ধায় সরযুর জলে
কত অজানিত ভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মন ভেসে চলে,
কত শৈল গুহা ঘিরে সে যে কাঁদে গুমরি গুমরি,
নিবিড় অরণ্য লোকে হেথা হোথা বিবাগীরে স্মরি
রাত্রি দিন খুঁজে ফেরে, সলিল সঞ্চয় লাগি যদি
কোনও দিন এই পথে আসে প্রভু, যদি এই নদী
প্রিয়েরে জোগায় জল, তবে আমি সেই বারি হয়ে
স্নিগ্ধ শান্ত করে দেব প্রেম-তপ্ত প্রভুর হৃদয়ে।
কিন্তু এক সত্য আমি নিঃসংশয়ে জেনেছি মননে
মর্তের কামনা কভু নাহি ঘোচে কল্পনার ধনে।

এখানেও ঋতুচক্র আবর্তিত হল বার বার
আকাশ মৃত্তিকা জল রূপে রূপে হল একাকার,
লোধ্র রেণু মাখি মুখে, কবরীতে পরি কুরুবক
করে লয়ে লীলাপদ্ম, সুচারু চরণে অলক্তক,
শ্রুতকীর্তি মাণ্ডবীরা স্বামী সহ মত্ত মধুমাসে
করেছে বিহার লীলা, আমি শুধু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে
গৃহ দ্বার রুদ্ধ করে মৃত্তিকায় নিয়েছি আশ্রয়
তিলে তিলে এই দেহ যন্ত্রণায় হয়ে গেছে ক্ষয়।

কী অসহ স্বপ্ন নিয়ে ধেয়ে আসে আমার শর্বরী
নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ-চিত্রে ক্ষণে ক্ষণে উঠি যে শিহরি,
নিদ্রা ভেঙে গেলে পরে মনে হয়, কেউ যেন কাঁদে
আঁধার প্রাসাদ কক্ষে, কাঁদে কেউ তীব্র আর্তনাদে;
মনে মনে শান্তি পাই, আছে তবে আমারও দোসর
কিন্তু হায় মহাভুল! এ যে দেখি নিজেরই অন্তর।
দাহ কোথা, জ্বালা কোথা, দাহ নেই খর সৌরকরে,
দাহ নেই দাবানলে, দাহ নেই মরুভূর পরে,

জ্বালা আছে কতটুকু সর্বদাহী অগ্নির জ্বলনে
সব দাহ, সব জ্বালা পুঞ্জীভূত মানুষেরই মনে।

ওই ভোর হয়ে এল, এসো বন্ধু এসো বাতায়নে
তোমার ও মুগ্ধ দৃষ্টি ফেলো আজ আমার নয়নে,
চতুর্দশ বর্ষ আগে যে তন্বীরে গিয়েছিলে ফেলে
আজ ফিরে এসে বন্ধু, সত্য বলো, তারেই কি পেলে?
সেই লাজ নম্রমুখ, সেই চারু নয়ন সজল
ভুজঙ্গপ্রপাত কেশ, তনুভরি লাবণ্যের ঢল?
শয্যার উপরে আসি প্রতিদিন আশ্চর্য সকাল
যার মগ্ন প্রেম দেখে হয়ে যেত অনুরাগে লাল!
সে নারী বিগত আজ, দয়াহীন ফেলে গেলে যারে
কালের যাত্রায় বন্ধু খুঁজে আর পাবে না তো তারে।
প্রেম চাও, প্রেম দেব, পুরুষের কাম্য যত ধন
শুধু তুমি দাও ফিরে চতুর্দশ বর্ষের যৌবন।

স্বর্গের রমণী মর্তের জননী

নীলবর্ণা তরঙ্গিনীর জল গাঢ় হয়ে উঠল। তীর তরুদের কন্দরে কন্দরে ঘনিয়ে উঠল ছায়া। সেই ছায়া ধীরে ধীরে পর্বতের সোপান বেয়ে উঠে গেল কিন্নর কৈলাসের শিখরে।

ইন্দ্ররূপী আদিত্য তখন তাঁর স্যন্দনখানিতে জ্যৈষ্ঠের আকাশ পরিক্রমা শেষ করে অস্তাচলে নামছিলেন। সহসা ছায়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল আদিত্যের। অনুরাগের রক্তচ্ছটায় ভেসে গেল পশ্চিম দিগন্ত। আদিত্য বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করলেন ছায়াকে। নর্মলীলায় আলোড়িত হল অস্তাচলের আকাশ।

অপলক দৃষ্টিতে আলোছায়ার বিহার-লীলা দেখছিল যে কন্যা, সে দেখল সুরতলীলার সমাপ্তিতে ছায়া গ্রাস করে নিল আদিত্যকে।

এই অনুভূতিটুকু বুকের মধ্যে স্পন্দিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী কন্যাটি রূপান্তরিত হয়ে গেল উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীতে।

সে পরিচিত পাহাড়ি পথ বেয়ে ফিরে চলল তার আশ্রম নিবাসে।

চন্দ্র উঠল ধৌলাধারের শিখরে। পৌর্ণমাসী রজনীর চাঁদ রজত থালিকা থেকে ঢালতে লাগল জ্যোৎস্নাধারা।

দক্ষিণ সমীর বয়ে আনল গিরিমল্লিকার সুবাস। চন্দ্রকিরণে স্নান করতে করতে তার মনে হল, সে আজ সন্ধ্যায় নতুন এক জন্ম লাভ করল। ফুলের গন্ধে, বায়ুর প্রবাহে, জ্যোৎস্নার ধারায় অজানা কোন এক রহস্যের আভাস পেয়ে রোমাঞ্চিত হতে লাগল সে।

পিতা বৃদ্ধাশ্ব হিমবন্তে কঠিন তপস্যায় মগ্ন। মাতৃস্বসা ধৃতি যমজ ভাইবোনকে আগলে রেখেছেন পক্ষিণীর স্নেহ সতর্কতায়।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ভূর্জবৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ধৃতি। উদ্বিগ্ন ছিল তাঁর অন্তর, অস্থির ছিল তাঁর দৃষ্টি। বৃদ্ধাশ্বের পুত্র গালভ কর্তব্যকর্মে সদা নিমগ্ন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, বৈতানিক-বহ্নি (যজ্ঞীয় অগ্নি) প্রজ্বালন, আজ্যাহুতি (ঘৃতাহুতি), সকল কর্মেই গালভ সময়নিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ। পিতার সুস্পষ্ট ছায়া গালভের প্রকৃতিতে। কন্যা অন্তর্মুখী। তার মানসসরোবর উত্তাল হয়ে উঠলেও বহিঃপ্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্যই থেকে যায়।

ধৃতি এগিয়ে এলেন আশ্রম সীমায়। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, এত বিলম্ব অহল্যা?

নতুন অনুভূতির রোমাঞ্চে তখনও বিভোর ছিল সে। কেবল মাতৃস্বসার দিকে আয়ত চোখের আনন্দঘন দৃষ্টি মেলে তাকাল।

ধৃতি অহল্যার এই মঞ্জরিত মুখশ্রীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি আশ্চর্য হয়ে অহল্যার নব ভাবরূপটি দেখতে লাগলেন।

কতক্ষণ পরে মূক কন্যাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন, কী হয়েছে মা তোমার? আজ কেমন এক ভাবান্তর লক্ষ করছি তোমার ভেতর।

অহল্যা বলল, আমি আজ আদিত্যরূপী ইন্দ্রকে ছায়ার সঙ্গে লীলারত দেখলাম।

কোথায়?

কৈলাসশিখরে।

তদ্গত হয়ে বলে চলল অহল্যা, বনের গভীরে কৃষ্ণবর্ণের বসনে দেহ আবৃত করে ছায়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তখন ইন্দ্রের কিরীট থেকে স্বর্ণাভ মধু-বিন্দুর মতো রশ্মিধারা ঝরে পড়ছিল কৈলাসের শিখরে। আমি দেখলাম, অতি সন্তর্পণে ছায়া পর্বতের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে গেল। কখনও বা সে পর্বত কন্দরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ও যত উপরে উঠছিল, ওর অঙ্গবাস একটি একটি করে খসে পড়ছিল নীচে। ও শিখর স্পর্শ করামাত্র ওকে বুকে টেনে নিল ইন্দ্র। আদরে আশ্লেষে ভরে দিল তাকে। লীলা শেষে ইন্দ্র প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলে ছায়া একে একে তার স্খলিত বেশবাস তুলে নিল অঙ্গে। ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হয়ে সে পড়ে রইল।

ধৃতি বুঝলেন, নারী-পুরুষ সংযোগের প্রথম পাঠ আজ প্রকৃতির পাঠভবন থেকে গ্রহণ করেছে অহল্যা।

মুখে বললেন, রাত্রিকালে ছায়ার প্রাধান্য, আবার দিনমানে ছায়া প্রচ্ছন্ন। এ লীলা প্রকৃতির একান্ত স্বাভাবিক ধর্ম মা। পশুপক্ষী, নরনারী, কীটপতঙ্গ সবাই এই লীলায় আবদ্ধ।

অহল্যা নিজের আবেগকে চেপে রাখতে পারল না। সে বলল, প্রতিদিন আমি এ দৃশ্য দেখি, কিন্তু আজই কেবল ওই দৃশ্য আমার মনে নতুন একটা অর্থ বয়ে আনল।

ধৃতি বললেন, এবার থেকে নারী-পুরুষের সংযোগ তোমার দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ধর্মরূপে ধরা দেবে।

ধৃতি অহল্যাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন ভূর্জবৃক্ষের ছায়ায়। চন্দ্রালোকে সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে আশ্রম পাদপের।

প্রতি সন্ধ্যায় গালভ অগ্নিহোত্র গৃহে প্রবেশ করে অগ্নিসংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। অগ্নি কোনও কারণে একবার নির্বাপিত হলে কাষ্ঠ ঘর্ষণে পুনরায় তাকে প্রজ্জ্বলিত করা সহজ কর্ম ছিল না। তাই অগ্নিসংরক্ষণের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকতে হত গৃহী অথবা যাজ্ঞিকদের।

গালভ প্রভাতে অধ্যয়ন বেদিকায় বসে বৈদিক স্তোত্র পাঠ করত। পাঠান্তে যজ্ঞক্রিয়া। পরে ব্রীহি ও গোধূমের ক্ষেত্র পরিদর্শন করে আশ্রম উদ্যানে ফল আহরণ করে বেড়াত। কখনও বা শুষ্ক কাষ্ঠভার বহন করে আনত উদ্যান থেকে।

এদিকে পুষ্পবৃক্ষগুলির পরিচর্যার ভার ছিল অহল্যার উপর। তরু আলবালে জলদান থেকে নিত্য দেবার্চনার পুষ্প সংগ্রহ তাকেই করতে হত। আশ্রমগৃহটিকে সম্মার্জিত করার সমস্ত দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিল। গৃহগুলি অঙ্গসজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠেছিল তার করস্পর্শে। সে পার্শ্ববর্তী কুণ্ড থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে আনত। সখীদের সঙ্গে স্নান করত প্রবাহিনীর শীতল সলিলে।

খাদ্য প্রস্তুতের দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন ধৃতি। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুর পরে দুটি যমজ ভাইবোনের দায়িত্বও নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বালবিধবা ধৃতির পতিকুলে কেউ ছিল না তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করার। তাই বৃদ্ধাশ্বই তাঁকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন ভগিনীর স্নেহে।

সন্ধ্যায় অহল্যাকে নিয়ে যে-কোনও একটি নিভৃত স্থানে বসতেন ধৃতি। নানা প্রাচীন কথা ও কাহিনী শোনাতেন তাকে। যে-কোনও কাহিনী শোনার অদম্য ব্যাকুলতা ছিল তার।

আজ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ভূর্জবৃক্ষের তলায় বসে ধৃতি ইন্দ্রের কাহিনী শুরু করলেন।

ইন্দ্র হলেন আদিদেব। ঈশ্বর নামেই তাঁকে অর্চনা করা হয়। দেবতাদের রাজা বা পরিচালক তিনি, তাই দেবরাজ নামেই ত্রিভুবনবিদিত। মেঘেদের চালিত করেন তিনি, তাই তিনি মেঘবাহন। আবার ওই মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে দেন, তাই তাঁর অন্য নাম বৃষা। খেতকে প্লাবিত করা, কর্ষণের উপযুক্ত করা তাঁর অন্যতম কাজ।

অমিত বীর্যবান পুরুষ এই ইন্দ্র। দ্বাদশ মাসে আদিত্য দ্বাদশটি নাম গ্রহণ করেন। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে আদিত্যের অন্য নাম ইন্দ্র। সেই ইন্দ্রকে তুমি ছায়ার সঙ্গে লীলামত্ত দেখেছ।

অহল্যা বলল, লীলাবিলাসই কি তাঁর স্বভাব?

তোমার অনুমান সঠিক। তবে তাঁর শক্তির স্বাক্ষর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মেঘ বিদীর্ণ করে বারিবর্ষণ, অসুর নিধন, সবই তাঁর অমিত শক্তির পরিচায়ক। যিনি যথার্থ শক্তিমান, তাঁর শক্তির প্রকাশ বহুমুখী।

অহল্যা বলল, বীর্যবানের দিকে সকলেরই আকর্ষণ থাকে।

ধৃতি বললেন, খুবই স্বাভাবিক। শক্তির প্রকাশে আমরা চমকিত হই। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে থাকে আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা। তাই বীর্যবান তাঁর দিকে আমাদের আকর্ষণ করেন।

অহল্যা বলল, আজ আমি ইন্দ্রকে দেবরাজরূপে চিত্রিত দেখতে চাই না। তুমি এমন একটি কাহিনী বলো যাতে তাঁর ভালবাসার রূপটি আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। যেমন আজ দেখেছি ছায়ার সঙ্গে তাঁর লীলা।

ধৃতি বললেন, তা হলে শোনো ইন্দ্র-শ্রুবাবতীর কাহিনী।

অহল্যা প্রশ্ন করল, শ্রুবাবতী কি কোনও রাজকন্যা অথবা দেবলোকবাসিনী কোনও অপ্সরা?

না, অপ্সরা কিংবা রাজকন্যা নয়, শ্রুবাবতী এক তাপসকন্যা। ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা ছিলেন তিনি।

অহল্যা আবার প্রশ্ন তুলল, তাঁর মাতৃ পরিচয়?

অপ্সরা ঘৃতাচী তাঁর জননী।

শুনেছি ভরদ্বাজ মহর্ষি, তিনি কি অপ্সরাকে গ্রহণ করেছিলেন?

না, পত্নীরূপে গ্রহণ করেননি, কামনায় কাতর হয়ে ঘৃতাচীর সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন।

অহল্যা বলল, মহর্ষিরাও তা হলে কামনায় কাতর হন। শুনেছি তাঁরা জিতেন্দ্রিয়।

ধৃতি বললেন, সৃষ্টির আদিতেই কামনা। কামনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন মা। অগ্নিকে যেমন আবৃত করে রাখা যায় না, তেমনই কামনাকেও মিথ্যা আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। তবে সমাজ-স্থিতির কারণে অন্তরে বাহিরে সংযমের শাসন প্রয়োজন।

অহল্যা এবার বলল, শ্রুবাবতীর কাহিনী শোনাও এখন।

তোমার পিতার মতো শ্রুবাবতীর পিতাও চলে গেলেন হিমালয়ে। গভীর তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি। পিতার আশ্রম পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল শ্রুবাবতীর ওপর।

তপস্বীর কন্যা নিজেকে সজ্জিত করলেন তপস্বিনীর আবরণে। আহারে বিহারে, বসনে ভূষণে আচরণে শ্রুবাবতী তাপসীরূপে পরিচিতা হলেন। কিন্তু অন্তরে তাঁর জ্বলতে লাগল কামনার একটি দীপ।

জননী ঘৃতাচী এবং ঋষি ভরদ্বাজের জ্বলন্ত কামনার যজ্ঞকুণ্ড থেকে জেগে উঠেছেন তিনি, সুতরাং তাঁর রক্তপ্রবাহের মধ্যেই কামনার কল্লোল।

অহল্যা বলল, শুনেছি, ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্বশীরা স্বর্গনটী।

ধৃতি বললেন, স্বর্গের কলাবতী ওরা এবং দেবভোগ্যা। এবার শোনো শ্রুবাবতীর কামনার ক্রন্দন। তিনি কঠোর তপস্যার ভেতর দিয়ে পেতে চাইলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্রলোকে পৌঁছোতে পারলেই তিনি পাবেন তাঁর মায়ের সন্ধান। যে-মা সন্তানের মায়ায় আবদ্ধ নয়, স্বর্গের লীলাচক্রে যার নিত্য আবর্তন, সেই মায়ের রূপটি তিনি দেখতে চান। আর দেখতে চান সেই স্বর্গ, সেই স্বর্গের অধীশ্বরকে—যাঁর আকর্ষণে মর্তবাসী মানুষের মন নিত্য উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

একটি অহংকারকে শ্রুবাবতী অন্তরে পোষণ করে রেখেছেন। তপস্যার আর্কষণে এই মাটির পৃথিবীতে তিনি টেনে আনবেন স্বর্গের অধীশ্বরকে।

তপস্যায় পিঙ্গল হল তাঁর কেশভার। প্রপাতের মতো প্রলম্বিত কেশ আবদ্ধ হল জটাজালে। গৈরিক বসনের আবরণে প্রচ্ছন্ন রইল না তাঁর যৌবন-মহিমা। ঋষিকন্যার পরিশুদ্ধ লাবণ্যের সঙ্গে যুক্ত হল তাপসীর ধ্যানলব্ধ জ্যোতির্লেখা।

একদিন শ্রুবাবতীর কঠোর তপস্যার পথ বেয়ে এলেন এক ব্রাহ্মণ যুবক। যৌবনের স্বর্ণরাগে প্রদীপ্ত তাঁর দেহকান্তি।

শ্রুবাবতী তরুণ তাপসকে জানালেন সংবর্ধনা। পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণকুমার বললেন, আমার একটি অভিলাষ আছে, যদি পূর্ণ করেন তা হলে বলি।

শ্রুবাবতী বললেন, নারীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হলে আমি তা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

একটু থেমে আবার বললেন শ্রুবাবতী, আমি কোনও এক পুরুষের তপস্যায় মগ্ন ছিলাম, তিনি আমার প্রার্থিত পুরুষ, এ কথাটিও আপনাকে সবিনয়ে জানাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ যুবক সহাস্যে বললেন, আপনার ব্যক্তিগত কামনা বাসনার সঙ্গে আমার অভিলাষের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বহুদূর থেকে আসছি। কয়েকদিন এই আশ্রমের অতিথি নিবাসে বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকতে চাই। অবশ্য আপনার আন্তরিক আহ্বান পেলে।

শ্রুবাবতী বললেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য মহাত্মন।

আশ্রমের এক প্রান্ত-সীমায় ভরদ্বাজ ঋষির অতিথি নিবাস। বনবেষ্টিত দুটি পর্ণগৃহ বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট। সন্নিকটে পুষ্পিত লতা বেষ্টন করে আছে আশ্রম পাদপ। সন্নিকটে পুষ্করিণী। কাষ্ঠ নির্মিত সোপান শ্রেণি নেমে গেছে পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে। ওই জলাশয়টির অন্য এক প্রান্ত ছুঁয়ে আছে আশ্রমের মূল গৃহপ্রাঙ্গণ।

এই অতিথি নিবাসে রাজা থেকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সকলেই কোনও না কোনও উপলক্ষে অতিবাহিত করে গেছেন। তা ছাড়া রাজগৃহ অথবা কোনও বিত্তবান বণিকাগৃহ থেকে ভাণ্ডারার সামগ্রী আসে। সেই বস্তুগুলি যাঁরা নিয়ে আসেন তাঁদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকে ওই অতিথিগৃহে।

কান্তিমান ব্রাহ্মণ যুবক পরম আনন্দে সেই অতিথি নিবাস আলো করে রইলেন।

দেখা যায়, উষার উদয়ের আগেই শয্যা ত্যাগ করে আচমনাদি সমাপনান্তে শ্রুবাবতী তরু আলবালে জলসিঞ্চন করছেন। তারপর পুষ্করিণীতে স্নান সমাপন করে অগ্নিশৌচ অংশুক (অগ্নিতাপে পরিশুদ্ধ বস্ত্র) পরিধান করে বৈতানিক বহ্নি (যজ্ঞের আগুন) প্রজ্জ্বালনে ব্যাপৃত।

আশ্রমিক কার্য কিছু পরিমাণে সমাধা করে শ্রুবাবতী আসেন অতিথি নিবাসে। বাম করে ফলপূর্ণ থালিকা, দক্ষিণ করে জলপূর্ণ কমণ্ডলু। কোনওদিন বা থালিকাতে থাকে পিষ্টক। নিজ হাতে অতিথির জন্য সযত্নে প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণকুমার প্রসন্ন হাস্যে গ্রহণ করেন শ্রুবাবতীর দেওয়া অর্ঘ্য।

কোনওদিন বলেন, আপনার আন্তরিক সেবার জন্য আমার অকৃত্রিম সাধুবাদ।

আবার কোনওদিন বলতে শোনা যায়, আপনার দেওয়া তিনটি রসালো পনসের কোষ আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে।

একদিন তাপসকুমার বললেন, আপনার উদ্যানবাটিকায় মনোরম রক্তিমাভ স্থলপদ্ম ফুটে উঠতে দেখলাম। ইন্দ্রের পারিজাতকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতিথির এই কথায় ক্ষুব্ধ হলেন শ্রুবাবতী। তবু মনের ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন রেখে বললেন, এ ধরনের তুলনা করবেন না তাপস। আমার লজ্জার পরিসীমা থাকবে না।

আমি যথার্থই বলছি মনস্বিনী।

শ্রুবাবতী মনের ক্ষোভ আর দমন করে রাখতে পারলেন না। বললেন, আপনি কি কখনও সুরপতির নন্দনকাননে প্রস্ফুটিত পারিজাত দেখেছেন?

স্মিত হাসি হাসলেন ব্রাহ্মণকুমার। বললেন, সর্বত্র আমার গতায়াত আছে জানবেন। আমি যে উক্তি করি তা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল। আমি ইন্দ্রের কাননে স্বচক্ষে পারিজাত দেখেছি।

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনে সহসা বাক্যহারা হয়ে গেলেন শ্রুবাবতী। সবিস্ময়ে বললেন, ধন্য আপনি! আর আজ আমিও ধন্য এই ভেবে যে স্বর্গলোকে বিচরণকারী এক তাপসকে সেবা করার সুযোগ আমি পেয়েছি।

ব্রাহ্মণকুমার বললেন, আপনার সেবাযত্নে আমি তৃপ্ত কম হইনি তাপসী।

শ্রুবাবতী সবিনয়ে বললেন, যদি দ্যুলোকের আর কিছু কথা আপনার কাছে জানতে চাই তা হলে কি আপনি আমার প্রগলভতাকে অমার্জনীয় বলে ভাববেন?

প্রশ্ন করুন। আমি খুশি মনে উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

শ্রুবাবতী বললেন, আমাদের মর্ত জীবনের সঙ্গে স্বর্গের জীবনের কোনও পার্থক্য আপনার চোখে পড়েছে কি?

সর্ব বিষয়ে স্বর্গের অধিবাসী নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। তারা মর্তের মানুষদের কাছ থেকে পূজা পেতে চায়। তারা মর্তবাসীকে করুণা করতে ভালবাসে।

কথাগুলো একান্ত সত্য জেনেও শ্রুবাবতী ব্যথিত হলেন। বললেন, আমরা দেবতাদের পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে অহংকারী করে তুলেছি।

আপনার অনুমান অসত্য নয়, তবু বলি, তাঁদের অহংকার করবার কিছু কারণও আছে। তাঁরা নানা বিষয়ে মর্তের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান।

শ্রুবাবতী বললেন, কিন্তু মর্তের ঋষিকুল কঠোর তপস্যায় যে শক্তি সঞ্চয় করেন তা অনেক ক্ষেত্রে দেবতারও সাধ্যাতীত।

সত্য, একান্ত সত্য শ্রুবাবতী। তবু সাধারণ মর্তবাসী মানুষের সঙ্গে দেবতাদের ক্ষমতার তুলনা চলে না।/

শ্রুবাবতী বললেন, মাটির পৃথিবীর মমতা, ভালবাসা স্বর্গে কি দেখেছেন আপনি? মর্তের মমতাময়ী মা সন্তানের মঙ্গলের জন্য জীবনটুকুও বিলিয়ে দিতে পারে অক্লেশে, এ ছবি কি স্বর্গে দেখা যায়? ভালবাসার জনকে পাবার জন্য সেখানে কি দুশ্চর তপস্যা করে নারী?

ব্রাহ্মণকুমার অধোমুখে দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে মর্তের কাছে স্বর্গ হার মানবে তাপসী।

শ্রুবাবতী বললেন, না চাইতে সবই পেয়ে যায় স্বর্গ, তাই তার হৃদয়ের কোনও ক্ষুধা নেই।

তাপস বললেন, নির্মম সত্য।

শ্রুবাবতী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, আপনি কি কোনও স্বর্গনটীর নৃত্যলীলা দেখেছেন?

আমার সে সৌভাগ্য বৈজয়ন্তধামে বসেই হয়েছে।

কেমন সে নৃত্য?

ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয় শ্রুবাবতী।

তবু সামান্য কিছু ধারণা যদি পাই।

ব্রাহ্মণ যুবক বললেন, পার্বত্য তরঙ্গিণীর ছুটে চলা দেখেছেন? নৃত্যলীলায় ছুটে যেতে যেতে সে যখন শিলাস্তূপে বাধা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কিংবা ত্রস্ত কোনও হরিণীর দল যখন উল্লম্ফনে প্রান্তর পার হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে ভীত চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখে?

ঝড়ের দোলায় শাখা বাহু মেলে যখন পুষ্পিত আশ্রম-তরু আন্দোলিত হয় তখন নিশ্চয়ই সে দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়েছেন আপনি। এইসব প্রকৃতির কলানৈপুণ্য স্বর্গনটীদের নৃত্যলীলায় প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ পায়।

তাদের আকুতি ঝরে চোখের দৃষ্টিতে। তাদের আমন্ত্রণ দেহ হিল্লোলে!

শ্রুবাবতী বললেন, সবই সুন্দর তবু একটা অপূর্ণতা থেকে যায়।

কী সে অপূর্ণতা তাপসী?

ওরা দুঃখ জানে না, তাই বেদনা ওদের অভিব্যক্তিতে ধরা দেবে না, দিতে পারে না। বেদনাই তো সৃষ্টির প্রথম পাঠ।

আপনার উক্তি সত্যেরই উচ্চারণ তাপসী। তবু আনন্দ থেকেই এই পৃথিবী আর প্রাণীকুলের উৎপত্তি।

আমার মনে হয়, সব কিছুর মূলে প্রথমে বেদনা, তারপর আনন্দ। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে আলোড়ন, তারপর সেই বেদনার মন্থন থেকে বেরিয়ে এল হাস্যময়ী, রূপবতী ধরিত্রী। জননীর ব্যথা যখন সীমাহীন হয় তখনই ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ-সুন্দর।

ব্রাহ্মণকুমার বললেন, আপনার অনুভূতির গভীরতা স্পর্শ করবে যে-কোনও মানুষের হৃদয়। তবু স্বর্গের আরও আরও কাজ আছে, যে কাজে ধন্য হয় ধরিত্রী।

কী সে কাজ তাপস প্রবর?

কখনও কি ভেবে দেখেছেন, তাপদগ্ধা ধরিত্রীকে বর্ষার সুধারস ধারায় স্নান করায় স্বর্গ? চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র দীপ জ্বেলে পথের সন্ধান দেয় বসুধার মানুষকে? মৃত্যুর অন্ধকার সরিয়ে নবজন্মের আলো জ্বেলে দেয় ঘরে ঘরে?

শ্রুবাবতী বললেন, স্বর্গের স্বপক্ষে আপনার যুক্তি সত্যিই প্রশংসনীয় তাপস।

এইভাবে নিত্য আলোচনার আসর বসে অতিথি সদনে। আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

শ্রুবাবতীর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে। মাঝে মাঝে মনকে শাসন করেন তিনি। ইন্দ্রকে যে তাঁর চাই। স্বর্গে মাতৃদর্শনে যেতে গেলে ইন্দ্রই হবেন তাঁর সহায়।

কিন্তু কী অলৌকিক ক্ষমতা এই ব্রাহ্মণ তনয়ের। ইন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সামনে আবির্ভূত হন এই তাপসকুমার!

শ্রুবাবতী আকুল হয়ে মনে মনে বলেন, তুমি এমন করে আমার চিত্তকে অস্থির করে তুলো না ব্রাহ্মণ। সুরপতি ইন্দ্রই আমার সাধনার ধন। আমি তাঁকে পেতে চাই, তাঁরই সঙ্গে হবে আমার স্বর্গলোক বিহার।

দূর থেকে ব্রাহ্মণকুমারকে তপস্যারত দেখতে পান শ্রুবাবতী। যে বৃক্ষের তলায় ধ্যানস্থ হয়ে বসেন তিনি, সেই বৃক্ষ সহসা যেন পুষ্পিত হয়ে ওঠে। পূর্ব দিগন্তে সূর্যের সুবর্ণ আভার মতো একপ্রকার দ্যুতি খেলা করে বেড়ায় তরুণ তাপসের চতুর্দিকে।

শ্রুবাবতীর সমস্ত অন্তর ওই আলোকছটার দিকে পতঙ্গের মতো ধাবিত হয়। চিত্তের এই বিহ্বলতার কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পান না তিনি।

এক সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ ধরা পড়েছে নাগকেশরের শাখায়। পুষ্পের পরাগদণ্ড থেকে ঝরে পড়ছে পেলব পরাগ কণিকা। সান্ধ্য সমীর চুপিসারে কথা কইছে বনপল্লবের সঙ্গে। শ্রুবাবতী এসে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণকুমারের সামনে। নাগকেশরের তলায় তখন আলো-আঁধারের সুচারু আলপনা।

শ্রুবাবতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রাহ্মণকুমার প্রথমে নীরবতা ভেঙে বললেন, কাল প্রভাতেই এ আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আমার সমস্ত মন পড়ে রইল এই আশ্রমের পুণ্যভূমিতে। তার পথ, তরুলতা, পশুপক্ষী, কুমুদশোভিত সরোবরে। আর আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম নিবিড় উত্তাপ ভরা দুর্লভ এক আতিথ্য।

শ্রুবাবতী বললেন, সহসা সেবার এ সৌভাগ্যে আমিও ধন্য হয়েছি তাপস।

ব্রাহ্মণকুমার বললেন, বিদায়ের লগ্নে প্রাণ চায় কিছু দিয়ে যেতে। হোক তা সামান্য তবু স্মৃতির সুধায় ভরা। কল্যাণী, কিছু কি চাওয়ার নেই।

হে তাপস, আপনার চরণ-স্পর্শে ত্রিভুবন ধন্য হয়ে আছে। যদি কোনওদিন যান সুরলোকে, দেখা হয় দেবরাজ বাসবের সঙ্গে, তা হলে তাঁকে দেবেন এই ক্ষুদ্র সমাচার, মর্তের মানবী এক তাঁরই পথ চেয়ে আছে দিবস রজনী।

সমাচারে কী কাজ কল্যাণী। সঙ্গে যদি যেতে চান, নিয়ে যাব বৈজয়ন্ত ধামে।

শ্রুবাবতী অধীর আনন্দে বললেন, সত্যিই কী সৌভাগ্য আমার। দেবলোকে যাব আমি! সেখানে কি স্বর্গনটীদের নৃত্যলীলা দেখা যাবে?

অবশ্যই। বাসবের সঙ্গে আমি বাঁধা আছি বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ বন্ধনে। সব আশা পূর্ণ হবে আপনার।

সশরীরে স্বর্গে গেলেন শ্রুবাবতী। ব্রাহ্মণকুমারের বরে অদৃশ্য রইলেন তিনি।

নন্দনকাননে ভ্রমণ করে পারিজাত দেখলেন তিনি। উদ্ধত শাখার শিখরে ফুটে আছে পারিজাত। উগ্র গন্ধে আকুল সমস্ত কাননভূমি। স্বর্গের চতুর্দিক ঘিরে তুষার পর্বত। সেই

তুষারসৃষ্ট স্রোতস্বিনীর ধারা নীলাম্বরী আচ্ছাদনে অঙ্গ ঢেকে নন্দনের পাশ দিয়ে বয়ে চলে গেছে। পর্বতশিখর থেকে মাঝে মাঝে নেমে আসছে কুয়াশার ঢেউ। তার ওপর সূর্যালোকের বিচ্ছুরণে তৈরি হচ্ছে সপ্তবর্ণের ইন্দ্রধনু।

মণিরত্নখচিত বৈজয়ন্ত ধামের পাশেই একটি প্রশস্ত অঙ্গন। সেই অঙ্গনে কারিগরেরা এক সুদৃশ্য গৃহনির্মাণে ব্যস্ত ছিল।

ব্রাহ্মণকুমার শ্রুবাবতীকে বললেন, এটি সুরপতির কলানিকেতন। মূল কাঠামোর ওপর প্রতিদিন বিশ্বকর্মার তত্ত্বাবধানে কারিগরেরা নতুন গৃহ নির্মাণ করে। সেই গৃহটি সম্পূর্ণরূপে পুষ্প দিয়ে গড়া। প্রতিদিন নব নব রূপ আর ভঙ্গিমায় গৃহটিকে শোভিত দেখা যায়। সমস্ত ফুলই আসে ওই নন্দনকানন থেকে।

প্রতি সন্ধ্যায় স্বর্গভূমিতে স্বপ্নময় জ্যোৎস্নালোক। পুষ্পগৃহের অভ্যন্তরে চন্দ্রদেব তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য মোহময় আলো বিকীরণ করেন। সেই আলোকে চলে দীর্ঘ রজনী নৃত্যগীতোৎসব।

আজ বিশেষ সন্ধ্যার উৎসবে শ্রুবাবতীর হাত ধরে সবার অলক্ষ্যে বিশেষ একটি স্থানে বসিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ তনয়। বললেন, নৃত্য শেষে আমি স্বয়ং এসে নিয়ে যাব।

শ্রুবাবতী সকৃতজ্ঞ হাসি হেসে বললেন, আপনার এই অযাচিত করুণার কথা কোনওদিন ভুলব না আমি।

ব্রাহ্মণকুমার শ্রুবাবতীকে কলানিকেতনে বসিয়ে রেখে বহির্গত হলেন।

একে একে দেবদেবীগণ নির্দিষ্ট আসনে এসে বসতে লাগলেন। উদ্ভাসিত দেহকান্তি। পরিহাস রসিকতা চলতে লাগল পরস্পরের মধ্যে। সহসা সকলে গাত্রোত্থান করলেন। শ্রুবাবতী দেখল, জ্যোতির্ময় এক পুরুষ পরম রমণীয়া এক নারীর কর গ্রহণ করে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর মস্তকে সুবর্ণনির্মিত মণিমাণিক্যখচিত মুকুট।

তিনি নির্দিষ্ট একখানি পুষ্পশোভিত আসনে উপবেশন করলেন। পার্শ্বের আসনখানি গ্রহণ করলেন সেই রমণী।

তাঁরা উপবেশন করামাত্র দেবদেবীরা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

শ্রুবাবতী নিশ্চিত হলেন, ইনিই ত্রিলোকবন্দিত বাসব। পার্শ্বে পতিসোহাগিনী শচীদেবী।

কিন্তু দেবরাজকে দেখে বিস্মিত হলেন শ্রুবাবতী। প্রদীপ্ত যৌবনের ভাস্বর দীপ্তি তাঁর ললাটে। পুঞ্জীভূত শক্তি আর লাবণ্যের আধার তাঁর দেহ। দীপ্তি আর স্নিগ্ধতার সমন্বয়ে বিশাল দুটি নয়ন ভাবমধুর।

শ্রুবাবতীর মনে হল, কোথায় যেন তিনি তাঁর এই একান্ত সাধনার ধনকে দেখেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্মরণে এল না তাঁর। তবে কি তিনি এঁকে পেয়েছিলেন তাঁর ধ্যানে? অথবা তাঁর স্বপ্নের পথ বেয়ে রাতের শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ত্রিভুবনবন্দিত এই পুরুষোত্তম।

অপূর্ব বাদ্যধ্বনি শোনা যেতে লাগল। দূর থেকে নিকটে এগিয়ে আসছিল সে ধ্বনি।

কলামন্দিরে প্রবেশ করে থেমে গেল সে সুরঝংকার। যন্ত্রীরা সুরশ্রেষ্ঠ বাসবের উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করে আসন গ্রহণ করলেন।

একে একে প্রবেশ করতে লাগলেন অনন্ত যৌবনা, অনিন্দ্য দেহসৌষ্ঠব সম্পন্না এক একজন রমণী। নৃত্যের সুচারু বেশবাসে পরিপাটি দেহশ্রী।

দেবরাজের কাছে এসে নত নমস্কারে প্রথমজন তাঁর পরিচয় দিলেন, আমি উর্বশী।

স্তব্ধ শ্রুবাবতী, এই সেই ত্রিলোক বাঞ্ছিতা উর্বশী। যাঁর নূপুর ঝংকারে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।

ইন্দ্র তাঁর পার্শ্বে রাখা স্বর্ণথালিকা থেকে একটি কুসুম তুলে উর্বশীর হাতে দিলেন। উর্বশী সেটি কেশপাশে আবদ্ধ করলেন।

আমি, মেনকা।

আমি, বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি, রম্ভা।

আমি, ঘৃতাচী।

তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গেল শ্রুবাবতীর চেতনায়। সে কাকে দেখছে। অপরূপা এক তরুণী ইন্দ্রের হাত থেকে উপহার-পুষ্পটি গ্রহণ করে লীলাভরে কবরীতে গেঁথে নিলেন।

হু-হু করে শ্রাবণের ধারা নেমে এল শ্রুবাবতীর নয়নে। মা, আমার মা। স্বর্গনটী ঘৃতাচী আমার মা। পিতা ভরদ্বাজ, কী দুর্ভাগ্য তোমার, ধরে রাখতে পারলে না তোমার এমন রক্তপদ্মের মতো প্রস্ফুটিতা স্ত্রীরত্নকে। কিন্তু কেন তুমি চলে এলে মাগো? সন্তানের কথা কি এই স্বর্গসুখের মাঝে একবারও মনে পড়ে না তোমার?

নৃত্য শুরু হয়ে গেল। আজিকার আসরে এই পঞ্চনটীই নৃত্যকলা প্রদর্শন করে দেবতাদের প্রীতিসাধন করবেন।

প্রথম একক নৃত্যে যন্ত্রীরা তুলল জলতরঙ্গের ধ্বনি। নটীর সারা দেহ তরঙ্গিত, হিল্লোলিত হয়ে চলল। যেন সারা সরোবর দক্ষিণ সমীরণের স্পর্শে শিহরিত হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয় নর্তকী উপবেশন মুদ্রা থেকে ধীরে ধীরে নৃত্যলীলায় উত্থিত হলেন। সারা দেহ অপরূপ সুষমায় আন্দোলিত হচ্ছে। মনে হল জলের বাধা অতিক্রম করে জেগে উঠল মৃণালদণ্ড! মাথায় ধারণ করে রেখেছে কমল কলিকা।

কোথা থেকে নেমে এলেন আলোর রশ্মিধারায় তৃতীয় নর্তকী। বারে বারে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে প্রদক্ষিণ করছেন মঞ্চ। আবার স্পর্শ করছেন কমল কলিকাটিকে। সোহাগে, প্রণয়ে পূর্ণ করে তুলছেন প্রাণের কোরকটি। যেন সবিতার প্রণয়মধুর স্বাদ পাচ্ছে বিকচোন্মুখ কমলিনী।

চতুর্থ নর্তকী এলেন ভ্রমরীর বেশে চঞ্চল পক্ষ বিধূননে। তার গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগল কুশলী যন্ত্রীর বাদ্যযন্ত্রে দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালনে। মঞ্চ প্রদক্ষিণ চলল কতক্ষণ ভ্রমরী লীলায়।

পঞ্চম প্রবেশ করলেন জাগরণী গান গাইতে গাইতে। কণ্ঠে জাগো জাগো ধ্বনি, করমুদ্রায় দল মেলে জেগে ওঠার আহ্বান।

এবার পঞ্চনর্তকী নৃত্য শুরু করল মণ্ডলাকারে। আশ্চর্য সে নৃত্য। একটি পদ্ম তার এক একটি দল মেলে বিকশিত হচ্ছে। শেষে নৃত্যলীলায় প্রস্ফুটিত হল শতদল। সে কী অপরূপ সৌন্দর্যের বিকশিত মহিমা।

যন্ত্রীদের ঐকতান ধ্বনিতে, দেবদেবীর সাধুবাদে, ইন্দ্রাণীর ঘন ঘন চূর্ণ পুষ্পদল নিক্ষেপে নৃত্যবাসর বর্ণ গন্ধময় হয়ে উঠল।

সভার সমাপ্তি-লগ্নে ইন্দ্র প্রত্যেক কলাবতীর হাতে একটি করে পারিজাতের সঙ্গে এক স্বর্ণভৃঙ্গার যৌবন-মদিরা তুলে দিলেন।

দেবদেবী চলে গেলেন। পুষ্পমন্দির শূন্য হয়ে গেল। শ্রুবাবতী একাকী বসে রইলেন লোকচক্ষুর অতীত হয়ে। আনন্দময় পূর্ণতার মাঝে কী এক অকরুণ হাহাকার উদাস রিক্ত করে তুলল তাঁর অন্তর।

ব্রাহ্মণ যুবক এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। শ্রুবাবতী চোখ তুলে তাকালেন। চোখে তাঁর অশ্রুবিন্দু।

এবার একান্ত অন্তরঙ্গ বাক্যালাপে ব্রাহ্মণকুমার বললেন, তোমার চোখে জল শ্রুবাবতী! স্বর্গে শিশির আর বর্ষাধারা ছাড়া কোনও জলবিন্দু ঝরে না কখনও। নয়নে অশ্রু স্বর্গবাসীদের একান্ত অপরিচিত।

আমি মর্তকন্যা, তাই আমার নয়ন অশ্রুবর্ষণে শান্ত হয়। হৃদয়ের গভীর বেদনা অশ্রুতেই তার প্রকাশের পথ পায়।

তুমি চলো কন্যা, বৈজয়ন্ত ধাম তোমার শুভ পদার্পণের প্রতীক্ষায়।

স্বর্গ তার চির যৌবন, চির আনন্দ নিয়ে থাক বাসব, আমি আমার ধরিত্রী মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই।

তুমি চিনেছ আমাকে?

যৌবন-অমৃত দিয়ে গড়া তোমার দেহ, তুমি বিতরণ করো সে অমৃত স্বর্গবাসী নটীদের, তাই চিনতে ভুল হয়নি তোমাকে।

তুমিও পাবে সে যৌবন-অমৃত আমার পরম অনুরাগিণী।

কৃতজ্ঞ তোমার ওই অযাচিত দানের অভিপ্রায়। তবু সবিনয়ে বলি, চির যৌবন আমার কাঙ্ক্ষিত নয় বাসব।

তবে, কী তোমার কামনার ধন?

আমি দুঃখ চাই, আনন্দ চাই, যৌবন চাই, আবার যৌবনের অবসানও চাই। যেখানে সন্তানের দিকে চেয়ে মায়ের চোখে অশ্রু ঝরে না, সে স্বর্গ আমার মতো মাতৃস্নেহাতুরের জন্য নয় সুরপতি।

তুমি যথার্থই মর্তকে ভালবাসো শ্রুবাবতী।

আমাকে করুণা করে মর্তে নিয়ে চলো বাসব। এত সুখের নিশ্বাস নিতে আমার বুক ভারী হয়ে উঠছে।

একটি বার তোমার জননীর মুখোমুখি দাঁড়াবে না?

ম্লান হাসি হেসে বললেন শ্রুবাবতী, কী হবে তাঁর যৌবন-মহিমাকে পীড়িত করে। আমি যে জননীকে দেখার জন্য স্বর্গলোকে আসতে চেয়েছিলাম, সে জননীর দেখা স্বর্গে পাব না কখনও। কেবল মর্তই সে জননীকে প্রসব করতে পারে।

সুরপতি বললেন, কল্যাণী, আর একটি মাত্র প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে।

শ্রুবাবতী তাকিয়ে রইলেন বাসবের দিকে।

তুমি কি তোমার প্রার্থিত কোনও পুরুষের জন্য স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করো না?

সেই হৃদয়াসীন পুরুষকে আমি মর্তের মাটিতে পেতে চাই। আমি তারই জন্য ধরিত্রীর স্থলপদ্মে অর্ঘ্য রচনা করে প্রতীক্ষায় থাকব।

ধৃতির কাহিনী শেষ হল।

করতলে আনন ন্যস্ত করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অহল্যা। একটা ভাবনার ঢেউ প্লাবিত করতে লাগল তার হৃদয়।

ধৃতি বললেন, কী ভাবছ মা?

শ্রুবাবতীর প্রার্থনা কি পূর্ণ হয়েছিল?

ধৃতি বললেন, শ্রুবাবতী মর্তনারীর আকাঙ্ক্ষার কথাটুকুই নিবেদন করেছে, এখানেই তার কাহিনীর শেষ।

অহল্যা অন্তরের গভীর থেকে বলল, শ্রুবাবতীর আকাঙ্ক্ষা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। আমি যদি শ্রুবাবতী হতাম তা হলে বাসবকে একদিন আমারই তপস্যার পথ বেয়ে নেমে আসতে হত।

হাসলেন ধৃতি। তিনি জানতেন অহল্যা চিরদিনই স্বাধীনচেতা। তাই অহল্যার শিরে হাত রেখে বললেন, প্রার্থিতকে পেতে গেলে প্রার্থনার গভীরতা চাই মা।

মহারাজ অসিতদেবলের কন্যা প্রবাহিনীর আজ আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। সে আজ দিবাভাগে রাজপুরী থেকে রথারোহণে এসেছে বৃদ্ধাশ্বের আশ্রমে। বহুকাল পরে দুই সখী পরস্পরের দর্শনে আনন্দে আকুল। কেউ কাউকে এত স্বল্প সময়ে ছেড়ে দিতে চায় না। পুঞ্জীভূত কথার পাহাড় জমে উঠেছে, তাকে কি এত সহজে ক্ষয় করা যায়?

মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত হল আশ্রমে। দুই বান্ধবীতে পরামর্শের পর প্রবাহিনী গেল অহল্যাকে রাজগৃহে নিয়ে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে।

ধৃতির অনুমতি পেয়ে রথে উঠল দুই বান্ধবী। পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রইল কতক্ষণ।

পথে রথ থামানো হল। গালভ আসছিল বহুদূর থেকে যজ্ঞের ঘৃত আর রন্ধনের লবণ বহন করে। একেবারে একই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি ভ্রাতা-ভগিনীর।

অহল্যাকে রাজার রথ থেকে অবতরণ করতে দেখে প্রথমে সে হতচকিত, পরে সব কিছু জেনে ভগ্নীকে উৎসাহিত করে বলল, মানুষের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন অহল্যা। আমরা আশ্রমিক, তাই বলে সমাজের অন্য বৃত্তির মানুষ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকব, এ তো মূঢ় কূপমণ্ডুকতা। আমি সানন্দে তোমার এ যাত্রায় আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমার সখীকে বলো, আশ্রমে তাঁর যথাযোগ্য সমাদর হয়নি বলে দুঃখিত।

গালভ আশ্রমের পথ ধরল। রথ ছুটে চলল রাজপুরী লক্ষ্য করে।

পর্বতের কোল ঘেঁষে পথ, নিম্নে সংক্ষুব্ধ শতদ্রু। রাজগৃহ থেকে আশ্রম পর্যন্ত প্রসারিত সংকীর্ণ পায়ে চলার পথটিকে রাজা অসিতদেবল প্রশস্ত করে তৈরি করেছিলেন। মহারানি প্রিয়মেধা ঋষি বৃদ্ধাশ্বের পত্নী দিব্যার সখী ছিলেন। বিবাহের পূর্ব থেকেই উভয়ের সখিত্ব। একই অঞ্চলে ছিল উভয়ের পিতৃগৃহ।

মাঝে মাঝে রাজগৃহ থেকে প্রিয়মেধা আশ্রমে আসতেন সখী সন্দর্শনে। প্রথমে শিবিকায় আসতেন। যাতায়াতে বিলম্ব ঘটত। পথ ছিল প্রস্তরাকীর্ণ। অতি সাবধানে শিবিকা বাহকেরা পথ অতিক্রম করত। উর্ধ্বদেশ থেকে অতর্কিতে অসংলগ্ন শিলাখণ্ডের নিম্নে গড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটত। শিলার আঘাতে সংকীর্ণ পথ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

এসব কারণে মহারাজ পথ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। বহুকালের অসংলগ্ন

শিলাখণ্ডগুলিকে তিনি বহু শ্রমিক নিযুক্ত করে স্থানচ্যুত করলেন। পথ প্রশস্ত করে রথ চলাচলের যোগ্য করে তুললেন। পথিপার্শ্বে রোপন করা হল বৃক্ষ। মহারানি সেই পথে রথারোহণে আসতে লাগলেন সখীর আশ্রমে।

দুই সখীই গত হয়েছেন, কিন্তু মহারাজ অসিতদেবল নির্মিত পথ তেমনই অটুট রয়ে গেছে। এই পথেই রথ নিয়ে আসে প্রবাহিনী, মহারাজের প্রিয়তম কন্যা।

রথ নিজের গতিতেই চলছিল, হঠাৎ পার্বত্য ঝঞ্ঝা ধেয়ে এল। মেঘস্তূপ তার জলভার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শৈলশিখর থেকে। ভেসে গেল পথ। স্রোতবাহিত প্রস্তরখণ্ডে নিশ্চিহ্ন হল পথরেখা।

রথ থেকে নেমে দুই বান্ধবীতে তখন আশ্রয় নিয়েছে একটি শৈল গুহায়। অদূরে একাশ্বযোজিত রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রথচালক।

সহসা আকাশের বুক চিরে নীলাভ শুভ্র বিদ্যুৎ খেলে গেল। পর্বত বিদীর্ণ করে বাজ পড়ল। বিশাল এক শিলাস্তূপ গড়িয়ে এসে রথ ও গুহার মাঝে সুউচ্চ ব্যবধান সৃষ্টি করে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কায় মূর্ছাহতের মতো গুহার ভিতর পড়েছিল প্রবাহিনী। পার্বত্য ঝঞ্ঝা মুহূর্তে সব কিছু তোলপাড় করে দিয়ে শান্ত হয়ে গেল। কেবল চতুর্দিকে প্রবাহিত জলের কল্লোলধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

অহল্যা আবাল্য দুঃসাহসী। সে সখীকে গুহার মধ্যে রেখে চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে এল।

সামনে বিশাল শিলাস্তূপ পথ অবরোধ করে আছে, তাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ওপারে সারথী আর রথের কী দশা হয়েছে তা সে জানতে পারল না। কিন্নর কৈলাসের দিকে তাকিয়ে দেখল, বর্ষাধোয়া আকাশের বুকে শেষ সূর্যের হিরন্ময় আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তার মনে হল, ইন্দ্রের কিরীট থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে দীপ্তি।

এখন কী তার কর্তব্য। আশ্রমের পথ ধরে চলতে গেলেও সন্ধ্যার পূর্বে তার পক্ষে পৌঁছোনো সম্ভব হবে না। তা ছাড়া সঙ্গিনীটি একান্ত দুর্বল। পদব্রজে এতখানি পথ অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব।

ভগ্নপথের প্রান্তে গভীর খাদ। উপরের পর্বত থেকে প্রপাতের মতো একটা জলধারা আছড়ে পড়ছে ওই খাদে। এ পথে এই প্রপাত আজিকার প্রাকৃতিক সংক্ষোভের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অবরুদ্ধ, বিপর্যস্ত পথের মুক্তি কবে ঘটবে কে জানে। অহল্যা মনে মনে নিশ্চিত হল, আজ অবশ্যই ওই গুহার অভ্যন্তরে রাত্রিযাপন করতে হবে।

বর্ষার পর নেমে এল পাহাড়ি শীত। এই শীতে অগ্নি প্রজ্বলন ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু সিক্ত সমিধ প্রজ্বলিত হবে কীরূপে।

অহল্যা চিন্তামগ্ন অবস্থায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে লাগল।

সহসা তার দৃষ্টি পড়ল পাশাপাশি আরও দুটি ক্ষুদ্র গুহার উপর। সে উঁকি দিয়ে দেখল, একটি গুহায় কিছু অর্ধদগ্ধ কাঠের সঞ্চয় আছে। তার মনে হল, পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল কাঠুরিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য আসে, তাদেরই রন্ধনের উদ্বৃত্ত এগুলি। অথবা কোনও পশুচারক দলের পরিত্যক্ত এসব অরণি।

অহল্যা অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ বহন করে নিয়ে যেতে লাগল নিজেদের গুহায়। সে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের কৌশল জানত। সুতরাং রাত্রিতে শৈত্যে জমে যাবার আশঙ্কা থেকে সে রক্ষা পেল।

শেষ কাষ্ঠভার নিয়ে সে যখন গুহার দিকে পা বাড়িয়েছে, অমনি দেখল সামনে এক দিব্য পুরুষ। আশ্চর্য কমনীয়তার ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর শৌর্য। তিনি আয়ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন অহল্যার দিকে। তাঁর সে চোখে ছিল মুগ্ধতার ভাষা।

পুরুষ বললেন, এই দুর্যোগের ভেতর অবেলায় এখানে সুকল্যাণী?

অহল্যা বলল, রাজগৃহে চলেছিলাম দুই সখী। মহাদুর্যোগের ভেতর পড়ে গেছি।

আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি? অন্য সখীটি কোথায়?

প্রকৃতির এই বিপর্যয়ে সম্মুখের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনও আশ্রমকন্যা। আমার এ অনুমান কি সত্য কল্যাণী?

অনুমান যথার্থ মহাত্মন। ঋষি বৃদ্ধাশ্বের কন্যা আমি।

পুরুষ বললেন, কোনও প্রশ্নের আগেই তোমাকে চিনে নেওয়া আমার উচিত ছিল ত্রিলোকবাঞ্ছিতা।

এ কথার অর্থ কী পুরুষোত্তম?

ঋষি বৃদ্ধাশ্বের কন্যা অহল্যা ভুবন বিদিত। তুমি যখন মাতৃগর্ভে তখন তোমার জননী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উপাসনা করতেন। তাই দেব চতুর্মুখ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দর বস্তুগুলির সমন্বয় তোমার মধ্যে ঘটিয়েছিলেন। তুমি তিল তিল সৌন্দর্যে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছ। তাই বলছিলাম, তোমার দর্শনমাত্রেই তোমাকে আমার চিনে ফেলা উচিত ছিল।

অহল্যা নত নমস্কারে বলল, আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন পুরুষোত্তম। আপনার পরিচয় পেলে কৃতার্থ হই।

ইন্দ্র নামেই আমি বিদিত। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি আমাকে মর্তের সামান্য একজন মানবরূপে কল্পনা করতে পারো।

'ইন্দ্র' নাম শ্রবণে যাওয়ামাত্র অপার আনন্দে রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অহল্যা। তার বারবার মনে পড়তে লাগল ধৃতির মুখে শোনা শ্রুবাবতীর কাহিনী। সেই সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র স্বয়ং তার সামনে! পুলকে রোমাঞ্চে শিহরিত হতে লাগল তার সর্বদেহ।

সেই মুহূর্তে সে আকাশের বুকে দেখল সূর্যাস্তের লীলা। ছায়াকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে আদিত্যরূপী ইন্দ্র। অহল্যার গভীর আনন্দ এতক্ষণে ভাষা পেল, অপূর্ব! আলোছায়ার কী অপূর্ব লীলা!

তুমি যথার্থই ত্রিলোকনন্দিতা।

সচেতন হল এবার অহল্যা, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার সখী এখনও গুহার অভ্যন্তরে শয্যাশায়িনী। তার দেহ সন্ধ্যাসমাগমে শৈত্যে নিশ্চয়ই কাতর। এই মুহূর্তে তার উত্তাপের প্রয়োজন।

ইন্দ্র বললেন, তুমি গুহায় যাও, আমি অবিলম্বে আসছি। দেখি, তোমার সখীর শীত নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

ইন্দ্র চলে গেলেন। তরুণী অহল্যা অলৌকিক এক আনন্দের ভার বুকে নিয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

অরণি ঘর্ষণে প্রজ্বলিত হল অগ্নি। ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রবাহিনী তাপের ছোঁয়ায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

এ আমি কোথায় রয়েছি?

অহল্যা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কোনও ভয় নেই প্রবাহিনী। বজ্রপাতের শব্দে মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলে তুমি। এখন আমরা গুহার মধ্যে রয়েছি।

প্রবাহিনীর সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ল। সে আতঙ্কিত হয়ে বলল, আমার রথ! পিতা গভীর চিন্তায় পড়বেন।

অহল্যা তাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সমস্ত কাহিনী শোনাল। পরে বলল, ওপর থেকে নেমে আসা এক বৃহৎ শিলাস্তূপ রথের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

প্রায় কান্নার গলায় প্রবাহিনী বলল, তবে উপায়!

ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালেন এক পুরুষ। প্রবাহিনী আতঙ্কে জড়িয়ে ধরল অহল্যাকে!

অহল্যা বলল, ভয় পেয়ো না প্রবাহিনী! ইনি আমাদের পরম শুভার্থী। বিপদের দিনে বন্ধুর মতো আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

প্রবাহিনীর কাছে ইন্দ্রের পরিচয় নিজমুখে প্রচার করল না অহল্যা।

ইন্দ্র গুহামুখে নত হয়ে একটি পাত্র অহল্যার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এতে এক ধরনের তরল পানীয় রয়েছে। তোমার সখী প্রয়োজন মতো এটি অল্প অল্প পান করলে শৈত্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

প্রবাহিনী তরল পানীয় সামান্য পান করামাত্রই একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল।

এখন তার দ্বিতীয় সমস্যা প্রাসাদে ফেরা।

ইন্দ্র বললেন, কিছুকাল পরেই চন্দ্রোদয় হবে। আমার সঙ্গীদের কেউ তোমাদের এই শিলাস্তূপ পার করে রথে তুলে দিয়ে আসবে। তোমাদের রথ অক্ষত রয়েছে। এই অঞ্চলটুকু ছাড়া কোথাও গিরিপথের কোনও ক্ষতি হয়নি। তোমরা নিশ্চিন্তে চন্দ্রালোকে রাজগৃহে পৌঁছে যাবে।

অহল্যা বলল, প্রবাহিনী, তুমি প্রাসাদে চলে যাও। আমি এই গুহায় রাত্রিবাস করে প্রাতে আশ্রমে ফিরে যাব।

কেন সখী? তুমি তো রাজগৃহে যাবার অনুমতি নিয়েই এসেছ।

সবই ঠিক প্রবাহিনী। কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় আমার মাতৃস্বসাও গভীর চিন্তায় পড়বেন। মধ্যপথে ঝড় না এলে কারুরই চিন্তার কোনও কারণ ছিল না।

তুমি নিশ্চিন্তে যাও, আমি নির্বিঘ্নে আশ্রমে পৌঁছোতে পারব।

চাঁদ উঠল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ভাসিত হল চরাচর। ইন্দ্রের ইঙ্গিতে তাঁর দু'জন পার্শ্বচর এগিয়ে এলেন। অহল্যা বলল, প্রবাহিনী, তুমি নির্ভাবনায় এঁদের সঙ্গে গিয়ে রথে আরোহণ করো।

প্রবাহিনী সখীকে আলিঙ্গন করে ইন্দ্রের অনুচরদের সঙ্গে প্রস্থান করল।

ইন্দ্র আর অহল্যা দাঁড়িয়ে রইল গুহার বাইরে।

প্রবাহিণীকে বিদায় দেবার পর অহল্যা এই চন্দ্রালোকেই আশ্রমে ফিরে যাবার কথা ভাবছিল। ইন্দ্র তার মনের কথাটি যেন জেনে নিয়ে বললেন, আমি কি আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি কল্যাণী?

স্মিত হাসি হেসে অহল্যা বলল, পুরুষোত্তম, সে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এ নিশীথে আপনাকে শ্রান্ত না করে আমি অনায়াসে এ গুহায় নিশিযাপন করতে পারি। প্রভাতে আশ্রমের পথে যাত্রা শুরু করা যাবে।

ইন্দ্র বললেন, যদি একান্তই গুহার আশ্রয়ে নিশিযাপন করতে চাও তা হলে আমি তোমাকে তোমারই উপযুক্ত একটি গুহার সন্ধান দিতে পারি। সে গুহা তোমারই মতো রমণীয়, শীত নিবারণের সমস্ত আয়োজনই সেখানে রয়েছে।

অহল্যা বলল, আমি যদি আপনার নির্দিষ্ট গুহায় রাত্রিবাস করি, তা হলে অন্য কেউ আমার জন্য আশ্রয়চ্যুত হবেন না তো?

তুমি নিশ্চিন্তে থাকবে সেখানে। সে গুহা আজিকার রাত্রির মতো একান্ত তোমার।

অহল্যা বলল, চলুন পুরুষোত্তম, আপনার নির্দিষ্ট গুহায় যাত্রা করি।

অহল্যার রূপে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন ইন্দ্র। এখন তার অসংকোচ ব্যবহার ও সাহসিকতায় তাকে রমণীরত্ন বলে ভাবতে লাগলেন।

ইন্দ্র দুর্গম স্থান পারাপারের সময় অহল্যার কর ধারণ করলেন। একটি তীব্র বেগসম্পন্ন স্রোতস্বিনী অতিক্রমের সময় অহল্যাকে তুলে নিলেন দুই করে। পার্বত্য স্রোতধারার মতো তখন প্রবাহিত হচ্ছিল অহল্যার রক্তধারা।

ইন্দ্র তাঁর পরিচ্ছদের অভ্যন্তর থেকে কতকগুলি অর্ধ শুষ্ক পত্র বের করে বললেন, এখন তুষার পর্বতের অনেকখানি ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে হবে। এইপত্রগুলি চর্বণ করো। শরীরে কোনও ক্লেশ বোধ হবে না।

অহল্যা ইন্দ্রের হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে নির্দ্বিধায় চর্বণ করতে লাগল। কোনও কটু স্বাদ ছিল না সেই পত্রগুলির। বরং সুখকর এক প্রকার সুবাস নির্গত হচ্ছিল চর্বণের সঙ্গে সঙ্গে।

আশ্চর্য কার্যকারিতা এই পত্রগুচ্ছের। অহল্যার মনে হল, সে উড়ন্ত পাখির মতো দুটি ডানা লাভ করেছে।

পর্বতশিলায় পুঞ্জীভূত তুষারের স্তূপ। সেই তুষারের মাঝে মাঝে সারি সারি বৃক্ষ। বৃক্ষের শাখা পল্লব শুভ্র হয়ে উঠেছে হিমানী সম্পাতে।

চন্দ্র তার রজত কলস থেকে ঢেলে যাচ্ছিল অফুরন্ত জ্যোৎস্নার ধারা। মায়াময়, স্বপ্নমদির হয়ে উঠছিল চরাচর।

এবার অনেকখানি পথ শুভ্র তুষারের আবরণে মসৃণ। তরুলতাশূন্য প্রসারিত সে পথ উঠে গেছে পর্বতশিখরের দিকে। যেন স্বর্গারোহিণীর পথ।

ইন্দ্রের হাতে হাত রেখে উড়ে চলেছে অহল্যা। শীত আর শ্রমের অনুভূতি লুপ্ত হয়েগেছে দেহ থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে অননুভূত এক রোমাঞ্চের স্পর্শে। এই স্বপ্নময় জগত পেরিয়ে তারা কি প্রবেশ করবে কোনও রহস্যময় জগতে!

দু'জনেই বাক্যহীন। চলার আনন্দে শুভ্র স্রোতধারায় ভেসে চলেছে তারা।

একস্থানে এসে ইন্দ্র গতি সংবরণ করলেন। থামালেন অহল্যাকেও।

কর প্রসারিত করে বললেন, ওই দূরে আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপের নীচে একটি শিখর দেখতে পাচ্ছ? চতুর্দিকে শুভ্র আচ্ছাদনের মাঝে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে?

অহল্যা বলল, 'শিখরটি নীলাভ কৃষ্ণবর্ণের বলে মনে হচ্ছে। তবে আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে এত উচ্চ শিখরশীর্ষেও একবিন্দু তুষারের আবরণ পড়েনি।

ওই হল কৈলাসপতির নিবাস। পার্বতী পরমেশ্বরীর সঙ্গে তিনি ওই আনন্দলোকে নিত্য বিহার করেন।

অহল্যা তুষারভূমির উপর নতজানু হয়ে নমস্কার করল।

ডানদিকে কর প্রসারিত করে ইন্দ্র বললেন, ওই হল অপ্সরাদের গমনপথ। ওর নীচে সংখ্যাতীত পর্বতবেষ্টিত কিন্নরলোক। এখন আমরা অপ্সরাদের গমনপথ ধরে যাত্রা করব।

ওরা এপথ ধরে কোথায় গমনাগমন করে?

স্বর্গ থেকে ওরা এই পথে আসে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করতে।

আবার ইন্দ্রের হাত ধরল অহল্যা। ডানদিকের পথ ধরে এবার ঊর্ধ্বলোকে উঠে চলল। দুই তুষার পর্বতের মাঝে গিরিসংকট পেরিয়ে অহল্যা শুনতে পেল সুমধুর সংগীতধ্বনি। অস্পষ্ট সে সুর। নারীকণ্ঠ নিঃসৃত ঐকতান।

কারা গাইছে পুরুষোত্তম?

কিন্নরীদের সুধাকণ্ঠের শ্রবণ সুখকর সংগীত তুমি শুনতে পাচ্ছ। ওরা অনেক নিম্নের উপত্যকাভূমিতে বসে গাইছে। ওদের কণ্ঠের স্বর্গীয় সুর পবনদেবতা হরণ করে সুরলোক পর্যন্ত প্রেরণ করছে।

এবার কিছু উতরাই পথ অতিক্রম করেই ওরা এসে পৌছোল অনুচ্চ পর্বত বেষ্টিত এক সরোবরের তীরে।

অহল্যার পলক পড়ে না। অনুভূতি কখন তার চরম সীমা স্পর্শ করেছে।

ইন্দ্রনীলমণির মতো জলভার বুকে নিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে আছে অচ্ছোদ। শুভ্র রাজহংসের মতো অলস মধুর গতিভঙ্গিতে তার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে তুষারখণ্ডগুলি। চাঁদের কিরণ দুই শুভ্র শিখরের মাঝ দিয়ে এসে পড়ছে জলতলে। সেই কিরণপথ ধরেই কি অপ্সরার দল নেমে আসে জলে? স্নানলীলা সমাপন করে প্রথম সূর্যের কিরণপাতে গড়া ইন্দ্রধনুর তোরণ-দ্বার দিয়ে ওরা কি প্রস্থান করে সুরলোকে?

অহল্যা সরসীর তীরে দাঁড়িয়ে এই সকল প্রশ্ন মনে মনে আলোচনা করছিল।

ইন্দ্র সহসা তার হাত ধরে আকর্ষণ করতে ধ্যানভঙ্গ হল।

এবার আমাদের যেতে হবে রাতের গুহা নিকেতনে। কিছু পরেই অপ্সরার দল আসবে জল বিহারে। তারা কোনও দর্শকের সন্ধান পেলেই ফিরে চলে যাবে।

অহল্যা ইন্দ্রের হাত ধরে চলল গুহা অভিমুখে। অধিক পথ অতিক্রম করতে হল না। একটি শীর্ণকায়া জলধারা বস্ত্র পরিধানে অনভ্যস্ত কিশোরীর মতো তার নীলাম্বরী শাড়িখানা তুষার পথের উপর লোটাতে লোটাতে এগিয়ে চলেছিল। মাঝে মাঝে লজ্জায় ঢুকে পড়ছিল তুষার আচ্ছাদনের আড়ালে। আবার বেরিয়ে আসছিল কিছু দূরে গিয়ে।

সেই জলধারার একটি তীরে আশ্চর্য মনোরম এক গুহা নিকেতন।

তুষারে গড়া স্তম্ভের উপর বরফ ঢাকা ছাদ। গুহা নিকেতনটি বেশ প্রশস্ত। চারিদিকে তুষারে গড়া আশ্চর্য সব ঝালরের কাজ। দেওয়ালের গায়ে গায়ে প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া অশ্বারোহীদের যুদ্ধযাত্রার ছবি, হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজের শোভাযাত্রা, নর্তকীদের নৃত্যলীলা।

ইন্দ্র প্রথমে গুহায় প্রবেশ করলেন। সহসা জ্বলে উঠল একটি মণিদীপ। স্নিগ্ধদ্যুতিতে দৃশ্যমান হল গুহা।

অহল্যা দ্বার-মুখে নত হয়ে সেই অদৃষ্টপূর্ব রমণীয় গুহাটিকে দেখছিল, ইন্দ্র তাকে কর সঞ্চালনে ভিতরে আহ্বান করলেন।

অহল্যা গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। বাইরের শীতল বায়ুপ্রবাহ না থাকায় গুহাটির অভ্যন্তর-ভাগ বেশ আরামপ্রদ মনে হল।

তুমি ওই চর্মাসনে উপবেশন করো কল্যাণী। ওটি কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম।

অহল্যা ইন্দ্রের নির্দেশ মতো আসনের উপর উপবেশন করল। সে তখন ওই স্বল্প আলোতেও গুহার অভ্যন্তরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। গুহা কোণে নাতিবৃহৎ একটি বেত্র-মঞ্জুষা। কতকগুলি রৌপ্য ও সুবর্ণনির্মিত পাত্র ইতস্তত রক্ষিত। কোনও কোনও পাত্র আচ্ছাদিত।

অহল্যাকে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতে দেখে ইন্দ্র বললেন, এটি শচীর সংসার। তিনি মাঝে মাঝে অচ্ছোদ সরসীতে স্নান করতে আসেন। তখন এসব তাঁর প্রয়োজনে লাগে।

অহল্যা শুধু মন্তব্য করল, অপরূপ এই গুহা।

ইন্দ্র মোহময় কণ্ঠে বললেন, আজ এই গুহা তোমার কল্যাণী।

অহল্যা ইন্দ্রের এ ধরনের উক্তির কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে এই গুহা প্রসঙ্গেই বলল, জ্যোৎস্না-ধোয়া অনন্ত শুভ্রতার রাজ্যে, নীলকান্তমণির মতো নীল জলে ভরা সরোবরের সংলগ্ন অঞ্চলে এই গুহাটি রাজপ্রাসাদের চেয়েও কাম্য।

ইন্দ্র বললেন, তোমার জন্য আমি এই পরিবেশে এমনই এক সুরম্য গুহা নির্মাণ করে দিতে পারি।

সহসা অহল্যার উচ্ছল হাসিতে গুহাটি শব্দিত হতে লাগল। হাসি থামলে অহল্যা বলল, আমি আশ্রমকন্যা। প্রধানত আশ্রম তরুর ফলেই আমাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়। এখানে কি সুরপতি আমার ভরণপোষণের জন্য একটি উদ্যান রচনা করে দেবেন?

ইন্দ্র বললেন, মায়াকানন তৈরি হতে পারে কল্যাণী, কিন্তু চিরস্থায়ী কোনও তরুলতার জন্ম এখানে সম্ভব নয়।

অহল্যা বলল, কেবল স্নানলীলার জন্য আশ্রম থেকে এত দূরে আসা সম্ভব নয় সুরশ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া আজিকার মতো সুযোগ ইচ্ছামাত্রেই পাওয়া যাবে না।

ইন্দ্র বললেন, তুমি তোমার সুযোগ সময় আর বাসনা মতো আসতে পারো।

আপনার অনুগ্রহই আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এ অনুগ্রহ প্রতি রজনীর নয় পুরুষোত্তম। আজিকার এ রজনী আমার মনের মঞ্জুষায় স্মৃতির উজ্জ্বল রত্ন হয়ে রইল জানবেন। কোনও নিভৃত অবসরে এই রত্ন দুঃখের সান্ত্বনা হয়ে দেখা দেবে।

ইন্দ্র সহসা উন্মোচন করলেন তাঁর পেটিকা। একটি ইন্দ্রনীলমণি খচিত অঙ্গুরীয় পেটিকা থেকে তুলে এনে অহল্যার অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই অঙ্গুরীয়ের মণির দিকে তাকালে নামটি তোমার স্মরণে আসবে।

অহল্যার প্রদীপ্ত আঁখির কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। মুক্তার মতো টলটলে সেই ধারা গড়িয়ে পড়ল তার নিটোল লাবণ্যময় কপোলে।

ইন্দ্র সবিস্ময়ে বললেন, তোমার আঁখিতে অশ্রু সুকল্যাণী!

বৃষ্টি শেষের রোদ্দুরের মতো কোমল একটুকরো হাসি ফুটে উঠল অহল্যার মুখে। বলল, এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পাত্রে অলৌকিক আনন্দের এত সুধা কী করেই বা ধরে রাখি। তাই উপচে পড়ল দুটি কণা। এ অশ্রু নয় পুরুষোত্তম, এ সুগভীর আনন্দসুধা।

ইন্দ্র সেই মুহূর্তে আবেগে অহল্যার হস্ত উত্তোলন করে অঙ্গুরীয়ের মণিতে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিলেন।

সহসা অহল্যার মুখমণ্ডলের দীপ্ত আলোকশিখা নিভে গেল। জলপূর্ণ মেঘের ছায়া ঘনাল সুহাসিনী দৃষ্টিতে।

আপনি কেন আমার দেহে কামনার এ স্পর্শ ছড়িয়ে দিলেন পুরন্দর! এর দাহিকা শক্তি অগ্নিরও অধিক। নিত্য হৃদয়কে পোড়াবে।

আমি প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করি কন্যা। আজ নয়, যেদিন তুমি তোমার কৈশোরের কলিকা উন্মোচন করে তারুণ্যের সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছিলে, সেদিন সুরলোকে বসেও সে সৌগন্ধ আমি পেয়েছি। আজ তোমার কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, আমি সঙ্গোপনে আশ্রম তরুর আড়াল থেকে তোমাকে দেখে এসেছি। সেদিন থেকে আমার দিবসের কর্মে, নিশীথের স্বপ্নে তোমারই উপস্থিতি।

দুটি পত্র যেন একটি চম্পক কুসুমকে ধরে রেখেছে, এমনই এক মুদ্রায় নিজের দুই করতলে মুখভার স্থাপন করে বসেছিল অহল্যা। সে স্বপ্নগুঞ্জনের মতো শুধু শুনে যাচ্ছিল ইন্দ্রের মথিত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বাণী।

তার মনে হচ্ছিল অনুরাগ কী আশ্চর্য বস্তু! ত্রিভুবনের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তিও নতজানু হয়ে প্রেম প্রার্থনা করে। প্রেমের শক্তির কাছে ভুবনের সর্বোত্তম আয়ুধও একান্ত নিষ্ফল!

অহল্যাকে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্র আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, তোমার এই ভুবনমনমোহিনী রূপের কল্পনা যিনি করেছিলেন, সেই সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখের কাছে আমি যাই। তাঁর কাছে সাধারণ ভিক্ষুকের মতো তোমার পাণি প্রার্থনা করি। অমনি ব্রহ্মা মৃদু হেসে আমাকে বিরত করে বলেন, শুদ্ধাচারী এক ঋষির সঙ্গে তোমার বিবাহ নাকি স্থির হয়ে আছে। জীবনে এতখানি নৈরাশ্য আর কখনও অনুভব করিনি সুকল্যাণী।

অহল্যা যথার্থই বিস্মিত হল। কারণ সে জানত না যে তার বিবাহ পূর্ব নির্ধারিত। সে বলল, সুরশ্রেষ্ঠকে পতিরূপে লাভ করা ত্রিলোকের যে-কোনও নারীর পক্ষেই পরম সৌভাগ্যের। কিন্তু কোনও ঋষির সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের কথা এতকাল আমার অপরিজ্ঞাতই ছিল।

ইন্দ্র বললেন, আজ আমি পরম সৌভাগ্যবান। অন্তত একটি বিনিদ্র রজনী আমি আমার মানসপ্রিয়াকে কাছে পেতে পারব। অবশ্য যদি তার অন্তরের কোনও দ্বিধা না থাকে।

অহল্যা বলল, বাসব, আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনার শৌর্যের বহু কাহিনী মাতৃস্বসার মুখ থেকেই আমি শুনেছি। সেই কৈশোর থেকেই আমি আপনার পরম অনুরাগিণী। কিন্তু আমি এখনও কুমারী। আপনি জানেন কুমারী কন্যা পিতার অধীন। তাই স্বেচ্ছা-মিলনের কোনও অধিকার এখনও জন্মায়নি আমার। আমি বেদনার্ত, কাতর, কিন্তু আমি নিরুপায় বাসব।

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করবে না কল্যাণী। ইন্দ্র অনার্য রাক্ষস কিংবা দৈত্য কুলোদ্ভব নয়।

ইন্দ্রের প্রতি সম্ভ্রমে পূর্ণ হল অহল্যার অন্তর। সে বলল, প্রিয়তম, আমার গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা গ্রহণ করুন। যে মুহূর্তে আপনার অঙ্গুরীয় আমার অনামিকা স্পর্শ করেছে, আর আমি বিনা প্রতিবাদে তা গ্রহণ করেছি, সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার জীবনের প্রার্থিত পুরুষ।

কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে নীরবে বসে রইল অহল্যা। পরে অনামিকা থেকে অঙ্গুরীয়টি উন্মোচন করে ইন্দ্রের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, প্রিয়তম, আমার এ রত্ন আপনার কাছেই গচ্ছিত থাক। অন্তরে যে নাম খোদিত হয়ে যায় তাকে স্মরণ করার জন্য অন্য কোনও অভিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আমি এখন আশ্রমদুহিতা। আগেই বলেছি পিতার অধীন। বিধাতা আমার ভাগ্যকে কোন পথে পরিচালিত করেন, দেখা যাক। তবে আমার অন্তর থেকে উচ্চারিত একটি বাক্য আপনি সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেন। আমি জীবনের চক্র পরিক্রমায় যেখানেই থাকি না কেন, কোনওদিন একথা ভুলব না যে আপনিই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। তাই আমার ওপর আপনার অধিকার সবার চেয়ে বেশি।

ইন্দ্র অঙ্গুরীয়টি নিজের অঙ্গুলিতে পরে নিয়ে বললেন, তোমার দেহের স্পর্শমাখা এই অঙ্গুরীয়টি প্রতি মুহূর্তে তোমাকে আমার কাছে রেখে দেবে। দূরে গেলেও তুমি থাকবে আমারই দেহের সীমার মধ্যে।

অহল্যা বলল, কেন জানি না এই মুহূর্তে অচ্ছোদ সরোবরের জল স্পর্শ করতে গভীর বাসনা জাগছে।

ইন্দ্র বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব কল্যাণী। চলো, দু'জনে আজ অচ্ছোদের জল স্পর্শ করে অচ্ছেদ্যবন্ধনের শপথ নিই।

ইন্দ্র আর অহল্যা অচ্ছোদের তীরে এসে শীতল জল স্পর্শ করল। অঞ্জলিতে দু'জনেই জল গ্রহণ করে শপথ নিল, তারা সামাজিক বিধানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অন্তরের বিধানে পরস্পরে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

ফিরে আসার পথে শিলাস্তূপের আড়ালে প্রস্ফুটিত কুসুম দেখে ইন্দ্র বললেন, আশ্চর্য! তোমার জন্য প্রকৃতি আজ তুষারের রাজ্যেও কুসুম ফুটিয়েছে।

বলতে বলতেই অহল্যার কবরীতে পরিয়ে দিলেন একটি ফুল। গভীর পুলকে, বসন্ত পবনে শিহরিত কিশলয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল অহল্যার হৃদয়।

ইন্দ্র সহসা অহল্যার হাত ধরে বললেন, এসো আমরা সম্মুখের ওই শিলাস্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করি।

কেন পুরুষোত্তম? এখানে আমরা দু'জন ভিন্ন আর কোনও সচেতন প্রাণীর অস্তিত্ব কি ধরা পড়েছে?

কথা বলতে বলতেই ইন্দ্রের হাত ধরে শিলাস্তূপের আড়ালে চলে গেল অহল্যা।

ইন্দ্র বলল, ওই তাকিয়ে দেখো, স্বর্গলোক থেকে অপ্সরাপথ ধরে আমার নৃত্য বাসরের অপ্সরার দল এগিয়ে আসছে।

অহল্যা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল, জ্যোৎস্নার শুভ্র ওড়না উড়িয়ে নন্দনবন বিহারিণী কন্যারা ছন্দের হিল্লোল তুলে অচ্ছোদ সরসীর দিকে ধেয়ে আসছে।

ইন্দ্র একে একে নর্তকীর পরিচয় দিচ্ছিলেন অহল্যাকে।

সম্মুখে উর্বশী। সমস্ত দলটিকে সুরলোক থেকে পরিচালিত করে নিয়ে আসছে।

হিমানীর তন্তুতে বোনা আশ্চর্য স্বচ্ছ আর কোমল পোশাক পরিধান করেছে সে। প্রতিটি নর্তকীর পরনে সেই একই পোশাক। অপরূপ দেহভঙ্গিমা তাদের। তুষারের রাজ্যে তারা যেন এক একটি তুষার প্রতিমা।

উর্বশীর পিছনে একে একে সুরলোক থেকে নেমে আসছে তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, রুচিরা, সুমধ্যা, সোমা, মিশ্রকেশী আর বিদ্যুৎপর্ণা!

ওরা এসে দাঁড়াল অচ্ছোদ সরসীর তীরে দিগন্ত প্রসারিত প্রাঙ্গণে।

নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের মাঝে উজ্জ্বল রৌপ্য থালিকার মতো চন্দ্র শোভা পাচ্ছে।

শুরু হল নৃত্য। মণ্ডলাকারে জ্যোৎস্নার ওড়না উড়িয়ে তুষারের বুকে পদচিহ্ন এঁকে এঁকে নৃত্য করছে ওরা। হিমানীর স্বচ্ছ পোশাকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেহরেখাগুলি! আশ্চর্য! প্রতি জনের গঠন পারিপাট্য স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিটি দেহভঙ্গি নিখুঁত সুষমামণ্ডিত।

দ্রুতলয়ে নাচছে ওরা। ক্ষিপ্র চরণ সঞ্চালনে তুষারপরাগ উত্থিত হচ্ছে। সংগীতের সুরধ্বনি নির্জন নিস্তব্ধ চরাচরে ছড়িয়ে পড়ছে।

ওরা সংগীতের বাণীতে বলছে, মর্তের মাধুরী আমরা অঙ্গে মেখে নিলাম। স্বর্গ-বিহারের সময়েও আমাদের মনে থাকবে এই সুখস্মৃতি। আমাদের নৃত্য ত্বরান্বিত করুক বসন্তের আবির্ভাব লগ্ন। দিগন্তের অরণ্যলোক পুষ্পিত হোক। পুষ্পগন্ধী পবন বয়ে আসুক আমাদের নৃত্যের আঙিনায়।

একসময় ওদের নৃত্যের দ্রুততম লয়ের সঙ্গে মিশে গেল জ্যোৎস্নার ধারা, হিমানীর তরঙ্গ আর তুষারের পরাগ। শুভ্রতার মেঘ সমস্ত অবলুপ্ত করে দিয়ে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে উত্থিত হল গগনলোকে। সেই শুভ্র অন্তরালের মধ্য দিয়ে মুক্তবসনা অপ্সরার দল কলহংসীর ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল অচ্ছোদ সরোবরে। ওদের দেহতাড়িত জলবিন্দু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অসংখ্য মুক্তা কণিকার শোভা ধারণ করল।

ইন্দ্র বলল, চলো কল্যাণী, এবার গুহায় ফিরে যাই।

অহল্যার যেন স্বপ্নভঙ্গ হল। সে এতক্ষণ বিহার করছিল ওই নর্তকীদের মণ্ডলের মধ্যে একটি রক্তপদ্মের মতো। শ্বেতবসনা নর্তকীদের মনে হচ্ছিল শ্বেত মরাল। তারা প্রস্ফুটিত রক্তকমলটিকে বেষ্টন করে আনন্দে আশ্লেষে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রের আহ্বানে সচেতন হয়ে উঠল অহল্যা। সে ইন্দ্রের হাত ধরে ফিরে গেল গুহায়।

তেমনই মণিদীপ জ্বলছিল। আধো আলো, আধো অন্ধকারে গুহার অভ্যন্তর মায়াময়। ইন্দ্র বললেন, ওই কৃষ্ণাজিনের ওপর রচনা করো তোমার রাতের শয্যা। গুহা কোণে রক্ষিত আছে পানীয়। ওই অমৃত সুধারস তোমার দেহে এনে দেবে উত্তপ্ত সুখনিদ্রা। শয্যা গ্রহণের পূর্বে তুমি অবশ্যই গ্রহণ করবে সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত ভোজ্য সামগ্রী।

অহল্যা বলল, আসনে আপনি উপবেশন করুন, আমি প্রথমে আপনাকে ভোজ্য পরিবেশন করি।

ইন্দ্র অহল্যার পরিশুদ্ধ হস্ত পরিবেশিত আহার্য গ্রহণ করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন অন্তরে। অহল্যা বহু যত্নে আর আন্তরিকতায় সাজিয়ে দিয়েছিল ভোজ্য। পার্শ্বে উপবেশন করে রমণীর

মমতায় তাকিয়েছিল ইন্দ্রর দিকে। আজ তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই ভোজনের অনুষ্ঠানটি কি আর কোনওদিন ফিরে আসবে তার জীবনে।

ইন্দ্র আচমন শেষে গুহার বহির্দ্বার থেকে বললেন, কল্যাণী, আহারাদি সমাপ্ত করে তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। অভ্যন্তর থেকে নিশাকালে একাকী বহির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ তুষার প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণের চেষ্টা করলে সহজেই পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা।

অহল্যা সসংকোচে বলল, কিন্তু পুরুষোত্তম, আপনি কীভাবে নিশিযাপন করবেন? আপনি কি আমার মতো একজন আশ্রমকন্যাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে দীর্ঘ রজনী উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে কাটাবেন? তার চেয়ে আসুন জাগরণ আর আলাপনে এই অলৌকিক রজনী অতিবাহিত করি।

ইন্দ্র বললেন, তোমার আহ্বানে আমার সকল দ্বিধা দূর হল কল্যাণী। এখন কুণ্ঠাহীন চিত্তে লাভ করব তোমার দুর্লভ সান্নিধ্য।

দু'জনের মাঝে জ্বলতে লাগল স্নিগ্ধ মণিদীপ। বিরহ-মিলন, অনুরাগ-অভিমানের ফুলে গাঁথা হল সুপ্তিহীন বিভাবরীর অনির্বচনীয় একখানি মালা।

প্রত্যুষের বর্ণরাগ ছড়িয়ে পড়ল উদয়দিগন্তে। ইন্দ্র অশ্রুভারাক্রান্ত অহল্যার হাত ধরে নিয়ে এলেন বাইরে। বললেন, অচ্ছোদের দিকে চেয়ে দেখো একবার।

অহল্যা তাকিয়ে দেখল সত্যিই অপার বিস্ময়। দুই তুষার পর্বতের মাঝে ঝরে-পড়া জলকণিকায় সৃষ্টি হয়েছে ইন্দ্রধনু। সেই তোরণের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে অপ্সরার দল দাঁড়িয়েছে পর্বতের মধ্যদেশে। অপ্সরাদের পোশাক প্রভাত তপনের ছোঁয়া লেগে লোহিতাভ হয়ে উঠেছে।

সূর্যের সুবর্ণ রশ্মি তুষার পর্বতকে স্পর্শ করামাত্র মনে হল, একখানি স্বর্ণরথে আরোহণ করে অপ্সরার দল সুরলোকে যাত্রা করল।

ইন্দ্র তাকালেন অহল্যার দিকে। নিবিড় স্বরে বললেন, আমাদেরও যাত্রার লগ্ন উপস্থিত কল্যাণী।

অহল্যা বলল, মনে হচ্ছে সুখ দুঃখের এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে এইমাত্র জেগে উঠলাম দেবরাজ। চলুন, যে জীবন অপেক্ষা করে আছে সেই জীবনে ফিরে যাই।

ইন্দ্র বললেন, মর্ত যে এত সুন্দর, মর্তকন্যা যে এত কাম্য, তা তোমাকে না দেখলে, তোমাকে কাছে না পেলে বোঝা যেত না অহল্যা।

আবার সেই স্বপ্নের পথ ধরে স্বর্গ-মর্তের মিলন মহোৎসব রচনা করতে করতে ইন্দ্র আর অহল্যা এসে দাঁড়ালেন পর্বত সানুদেশের অরণ্য প্রান্তে। এখান থেকেই আশ্রম অভিমুখে শুরু হবে যাত্রা।

ইন্দ্র কোনও কথা না বলে তাঁর পরিচ্ছদের অভ্যন্তর থেকে একটি পুষ্প বের করে এনে অহল্যার কবরীতে পরিয়ে দিলেন।

অহল্যা বলল, কাল সমস্ত রাত্রি এই পুষ্পের আঘ্রাণে আমোদিত হয়েছিল আমাদের গুহা নিকেতন। আজ সারাপথ এর সুবাস আমাকে আকুল করেছে। এখন সেই কুসুমকে শিরোভূষণ করে আশ্রমে ফিরে যাচ্ছি। কী নাম এই পুষ্পের দেবরাজ।

অম্লান-কুসুম। এর বর্ণ, গন্ধ কিছুই ম্লান হবে না কোনওদিন। এ এক স্বর্গের অধিবাসী আর মর্তকন্যার অনিঃশেষ অকথিত প্রেমের প্রতীক হয়ে থাকবে।

অহল্যা বলল, প্রেমের বিহ্বল পরিবেশ, সম্পূর্ণ অধিকার আর আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও যে ব্যাধ এক অনভিজ্ঞা হরিণীকে লক্ষ্য করে শর সন্ধান করেনি, সেই ব্যাধের কাছে হরিণীর কৃতজ্ঞতার কোনও শেষ নেই, বাসব।

ইন্দ্র অহল্যার হাত নিজের করপুটে একটি কুসুমের মতো তুলে নিয়ে বললেন, এই যে তোমার সম্মুখ দিয়ে একটি জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এটি সম্পূর্ণ অস্পর্শিত। কালই হয়েছে এর বন্ধন মুক্তি। তোমরা যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝে পড়েছিলে, সে বিপর্যয়ের স্রষ্টা স্বয়ং ইন্দ্র। বাসবের বজ্রই বিশাল এক শিলাস্তূপকে স্থানচ্যুত করেছে। এর কারণ, পর্বতের ঊর্ধ্বে এক বিশাল জলসম্ভারকে ওই সামান্য শিলাস্তূপ আবদ্ধ করে রেখেছিল। আমি আর আমার অনুচরেরা শিলা সরিয়ে ওই জলসম্ভারকে মর্তজনের কল্যাণের জন্য মুক্তি দিয়েছি। আজ থেকে ওই স্রোতধারার নাম হবে, অহল্যা। যে এখন অকর্ষিত, অস্পর্শিত, সে-ই অহল্যা।

প্রিয় প্রভু, আপনি আমার কুমারীত্বকে সম্মান জানিয়েছেন, তাই আজ আমার নামে নামাঙ্কিত এই স্রোতস্বিনীর জলস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনের কোনও অবস্থাতেই আপনাকে অদেয় আমার কিছু থাকবে না। আর কোনওদিন কোনও কারণেই আপনার ওপর থাকবে না আমার বিরূপতা।

ধৃতি বললেন, শিশুকাল থেকেই তোমাকে নির্ভীক আর স্বাধীনচেতা দেখে আসছি মা। গালভ আর তুমি যমজ হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন। কাল যখন অস্বাভাবিক শব্দে বজ্রধ্বনি হয় তখন গালভ তোমার জন্য ভারী অস্থির হয়ে পড়েছিল। এখানে আকাশ নির্মল, তবু বজ্রধ্বনি, তাই শঙ্কিত হয়েছিল গালভ। আমি বলেছিলাম, অহল্যার জন্য চিন্তিত হয়ো না, সে আপনার প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করবার ক্ষমতা রাখে।

অহল্যা বলল, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আর আশীর্বাদই আমার সকল কাজের প্রেরণা আর সাফল্যের মূল।

ধৃতি বললেন, তুমি সে শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিলে, কিন্তু কারণ কিছু অনুমান করতে পেরেছ কি?

সেখানে বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেঘভাঙা বৃষ্টি আর ঝড় হয়েছিল। একটি স্রোতস্বিনীও জন্ম নিয়েছে কাল। ওপরের পর্বতে সঞ্চিত জলরাশি তার উৎস। ঝড় থামলে প্রবাহিনীকে রথে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিই। তোমরা চিন্তিত হবে বলে আমি আশ্রমে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তবে কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসা সম্ভব ছিল না বলে একটি গুহাতে রাত কাটাতে হয়েছে।

যথার্থ কাজই করেছ মা।

অহল্যা বলল, কাল জ্যোৎস্নালোকে আমি অচ্ছোদ সরোবর দেখে এসেছি।

অচ্ছোদ সরোবর! শুনেছি, সে নাকি অনেক উচ্চ তুষার গিরির কোলে অবস্থিত। তুমি সেখানে পৌঁছোলে কী করে মা?

এক দিব্য পুরুষ আমাকে ওই সরসীর সন্ধান দেন এবং পথ প্রদর্শনও করেন।

এ তোমার যেমন এক নতুন অভিজ্ঞতা তেমনই দুঃসাহসের কাজও বটে। তোমার পিতা শুনলে হয়তো শঙ্কিত হতেন।

অহল্যা ধৃতির কণ্ঠলগ্না হয়ে বলল, আশৈশব তোমার প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছি, তাই দুঃসাহসই বলো আর যাই বলো, সে তোমারই দান।

এখন বলো, কেমন দেখলে সে সরোবর?

অহল্যা সরোবর এবং পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেল। শেষে অপ্সরাদের নৃত্য আর স্নানলীলার কথা যখন বলতে লাগল তখন ধৃতি বললেন, এমনই এক সরোবরে দেবনর্তকী উর্বশীর স্নানলীলা দেখে এক দৈত্য কামোন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

অহল্যা বলল, সত্যিই উন্মত্ত হবার মতো রূপ উর্বশীর। তার গমনের ছন্দ, নয়নের কটাক্ষ, মুখের হাসি, নৃত্যের লীলা চিনিয়ে দেয়, সে সবার থেকে স্বতন্ত্র। এখন তুমি ওই উর্বশী আর দৈত্য সম্বন্ধে যা জানো, তাই শোনাও।

ধৃতি বললেন, এ শুধু উর্বশী আর দৈত্যের কাহিনী নয়, একজন রাজাও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত ওই ঘটনা রাজা আর সুরনর্তকীকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছিল।

আজ কিছু বিলম্বে চন্দ্রোদয় হয়েছে। যজ্ঞে নিবেদিত প্রসাদ, সন্ধ্যার কিছু পরে তিনজনে গ্রহণ করেছে। নৈশাহারের পর গালভ নিভৃত একটি স্থানে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। সে সময় অহল্যাকে কাছে বসিয়ে ধৃতি নানা ধরনের গল্প করেন। আজ দু'জনে তেমনই বসে। ধৃতি তাঁর গল্পের জাল বুনে চললেন।

রাজা পুরুরবা বেরিয়েছেন মৃগ শিকারে। একাকী পার্বত্য অরণ্যে এই তাঁর প্রথম আসা। অনুচরদের সাহায্য ছাড়াই মৃগবধ করবেন, এর ভেতর আছে আলাদা এক রোমাঞ্চ।

অরণ্যের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করতে করতে রাজা এক পরমাসুন্দরী কুরঙ্গীর সন্ধান পেলেন। তিনি মৃগীটিকে দেখামাত্র অশ্ব চালিয়ে দিলেন তার দিকে। মৃগীও পেছনে সাক্ষাৎ শমনকে দেখে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল।

এমন সময় অরণ্যের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল একটি চিতা। সেও তার ভক্ষ্য বস্তুটিকে লক্ষ্য করে ছুটে চলল। রাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে চলেছিল, কিন্তু রাজা কিংবা অশ্বের দিকে তার কোনও দৃষ্টিই ছিল না।

রাজা সমস্যায় পড়লেন। তাঁর তূণীর বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন ছিল। তিনি ধনুতে একটিমাত্র তির সংযোজন করে দ্রুত বেরিয়ে এসেছেন। এখন তিনি ভাবলেন, যদি আমি হরিণীকে তির-বিদ্ধ করি তা হলে ওই চিতার দৃষ্টি আমার ওপর নিপতিত হবে। তখন ওই হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারব না।

এইরূপ বিবেচনা করে রাজা তাঁর ওই একমাত্র শরে চিতাটিকেই বধ করলেন। কুরঙ্গী দ্রুত প্রস্থান করল।

রাজা পুরুরবা ফিরে এলেন নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে। তিনি এবার তাঁর তূণীর পৃষ্ঠে বেঁধে নিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকারে চরাচর বিদীর্ণ হতে লাগল।

রাজা দ্রুতবেগে ধাবিত হলেন শব্দ অনুসরণ করে।

তিনি নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখলেন, এক ভীষণাকার দৈত্য একটি সরোবরের জল তোলপাড় করছে। আর এক পরমাসুন্দরী নারী আত্মরক্ষার জন্য কখনও সন্তরণ করে পালাবার চেষ্টা করছে, কখনও বা জলে ডুব দিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে।

রাজা প্রথমেই সুন্দরী কন্যাটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় নেই। দুর্বৃত্তকে আমি শাসন করছি! তার উপযুক্ত শাস্তি সে এখুনি পাবে।

এবার দৈত্যকে উদ্দেশ করে বললেন, উঠে আয় হীন কাপুরুষ। একজন শক্তিহীন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করতে তোর বিবেকে একটুও বাধল না। তোকে আমি শরাঘাতে এখনই যমসদনে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তুই অস্ত্রহীন। জন্তু ছাড়া কোনও অস্ত্রহীনকে আমি অস্ত্রাঘাতে বধ করি না।

গর্জন করতে করতে সরোবর থেকে তীরে উঠে পুরুরবার দিকে ধেয়ে এল দৈত্য।

অস্ত্র ছেড়ে রাজা দৈত্যের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

তিন দিন দুই রাত্রি সেই সরোবর তীরে চলল রাজা পুরুরবা আর দৈত্যের সংগ্রাম। সে অকল্পনীয় যুদ্ধ দেখতে লাগল মূক প্রকৃতি আর নির্বাক নীলাকাশ।

তৃতীয় দিনে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ছড়ানো আকাশের মতো রক্তবমন শুরু করল দৈত্য। রাত্রির প্রথম যামে চন্দ্রোদয় হলে দেখা গেল, দৈত্য গতায়ু হয়েছে।

রাজা পুরুরবা দৈত্যের সৎকার শেষে স্নান সমাপন করলেন।

পুষ্করিণী থেকে উঠে এসে দেখলেন, সেই কান্তিময়ী কন্যা পুষ্পমাল্য হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা সেই মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে বললেন, কী নাম তোমার সুভগে?

মহাত্মন, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সভানটী উর্বশী।

পুরুরবা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, তুমি উর্বশী! যার রূপ ও নৃত্যের মহিমা ত্রিলোক বিদিত, সেই উর্বশী আমার সম্মুখে।

উর্বশী বলল, আপনার বিস্ময়ের কোনও হেতু নেই মহারাজ। যত কিছু বিস্ময় সবই আপনাকে কেন্দ্র করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, বিশ্রাম ভুলে আপনি যেভাবে নিরন্তর এক অসহায় নারীর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা ত্রিলোকের কোথাও আমি দেখিনি। এখন আর বাক্য নয় মহাত্মন, আসুন ওই তরুতলে। সামান্য কিছু ভোজ্যবস্তু দ্যুলোক থেকে নিয়ে এসেছি, তাই গ্রহণ করুন।

যত্ন করে উর্বশী পুরুরবাকে ভোজন করাল। পরে সঞ্জীবনী সুধা পান করতে দিল, যাতে রাজার দেহ থেকে সমস্ত আঘাত ও ক্লান্তির চিহ্ন নিঃশেষে মুছে যায়।

উর্বশী বলল, ভদ্র, এখন আপনার পরিচয়টুকু পেলে ধন্য হই। অবশ্য একটি মানুষের যথার্থ পরিচয় আমার আগেই জানা হয়ে গেছে।

রাজা বললেন, আমাকে পুরুরবা নামেই জেনো। আমি একটি রাজ্যের অধিপতি।

মহারাজ, ত্রিলোকবন্দিত আপনার নাম। আমার পরম সৌভাগ্য আপনাকে স্বচক্ষে দেখলাম। আপনার শৌর্য ও মহান হৃদয়ের পরিচয় পেলাম।

আমাকে মর্তভূমির সামান্য একজন মানুষ বলে ভাবলে আমি খুশি হব নটী।

উর্বশী বলল, আমাকেও সুরনটী, অপ্সরা না ভেবে সামান্য একজন নারী বলেই ভাববেন। যে নারী একমাত্র পুরুষের পৌরুষকেই মনে-প্রাণে পূজা করে।

মহারাজ পুরুরবা বললেন, তোমাকে উর্বশী ভেবে আমি উদ্ধার করতে আসিনি। এসেছিলাম, বিপন্ন এক নারীর আর্ত চিৎকার শুনে।

আমি সেই নারী, আর তাতেই আমি চরিতার্থ মহারাজ। গত দুটি রাত্রি আমি স্বর্গের নৃত্যসভায় চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু বারে বারে তালভঙ্গ হয়েছে আমার। দেবরাজ বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছেন আমার শারীরিক কুশলবার্তা। আমি অসুস্থতার কথা উচ্চারণ করতে পারিনি। কারণ তখনই দেববৈদ্য আমাকে পরীক্ষা করে জানতে পারতেন, শারীরিক দিক থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। মহারাজ, উদ্বেগে আকুল হয়েছিলাম। আপনি আজ সন্ধ্যায় তার অবসান ঘটালেন।

পুরুরবা বললেন, কিন্তু আজ এই রাত্রিতে তুমি স্বর্গলোকে কেমন করেই বা ফিরবে? আর নৃত্যসভার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেই বা কেমন করে?

আজ নৃত্যের আসর বসবে না মহারাজ। আজ নাটক অভিনীত হবে।

তোমার অনুপস্থিতি সবার দৃষ্টিগোচর হবে।

আমি মিশ্রকেশীকে বলে এসেছি, কেউ আমার অন্বেষণ করলে যেন বলে, আমি একান্ত নির্জনে নতুন একটি নৃত্যের পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে আছি।

পুরুরবা বললেন, আজ এই নিশীথিনী তা হলে একান্তই তোমার?

এই মুহূর্তে আমি উদ্বেগহীন। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো ভারহীন আমার দেহমন।

তবে এসো আমরা দু'জনে আজ এই প্রান্তরে পর্বতে বিহার করি। সুমধ্যমা, জগতের আনন্দ স্বরূপিণী তুমি। আজ তোমার আনন্দমদিরা পানের সুযোগ আমাকে দাও।

তিন দিন দুটি রাত্রি আমি আপনার জয়ের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। আজ সে প্রতীক্ষার আনন্দময় অবসান ঘটেছে। আজ নিশীথে আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হলে সে বুভুক্ষুর মতো ইন্ধন চায় প্রিয়দর্শিনী। দেহের অগ্নি একবার জ্বলে উঠলে সে সহজে নির্বাপিত হবে না।

উর্বশী আপনার দেহমনের প্রীতিসাধনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত বীরোত্তম।

সেই মধুরাত্রি স্বর্গনটীর সঙ্গে আনন্দ-বিহার করে কাটালেন মহারাজ পুরুরবা।

নিশা যখন মিলিত হল উষার সঙ্গে, তখন সরোবর তীরে এসে দাঁড়াল স্বর্গের নট-নটী, নর্তক-নর্তকীর দল। তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে স্বর্গের সর্বশ্রেষ্ঠা নর্তকীকে।

পুরুরবার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ উর্বশী নীবিবন্ধনী সংযত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীদের সম্মুখে গিয়ে বলল, দানবের সঙ্গে তিন দিবস দুই রাত্রি নিরন্তর সংগ্রাম করে এই বীর্যবান পুরুষ আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। তাই এঁকে সমর্পণ করেছি আমার তনু মন প্রাণ। আমি আর স্বর্গে ফিরে যেতে চাই না।

রম্ভা বলল, আমরা অনন্তযৌবনা। একমাত্র স্বর্গের কাছেই নিবেদিত।

ঘৃতাচী বলল, মর্ত-বিহারে আমাদের বাধা নেই সত্য কিন্তু স্বর্গই আমাদের যথার্থ আশ্রয়।

মিশ্রকেশী বলল, দেবতাদের আনন্দদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উর্বশী। দেবতারা আমাদের বিচরণের স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই আমরা স্বর্গের বন্ধনকে ছিঁড়তে পারি না।

নাগদত্তা বলল, আমরা অপ্সরা। অপ বা জলে গমন করি, জলবিহার ভালবাসি, তাই আমাদের এই অভিধা। কিন্তু আমাদের হৃদয় কখনও জলের মতো তরল নয়।

বিদ্যুৎপর্ণা বলল, উরু বা মহৎ ব্যক্তিদের বশ করার জন্যই তুমি উর্বশী। কিন্তু তুমি তো কারও বশ্য নও সখী।

রুচিরা এগিয়ে এসে একখানা হাত ধরল উর্বশীর। বলল, অপ্সরাদের প্রধানা তুমি। তুমিই আমাদের পরিচালিকা শক্তি। স্বয়ং দেবরাজ তোমাকে সেই সম্মানীয় আসনে বসিয়েছেন। আমাদের দলভ্রষ্ট করে, সুরপতির সম্মানে আঘাত হেনে, তুমি কী এমন আনন্দ পেতে চাও উর্বশী?

দুটি হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়াল উর্বশী। ঝড়ের মুখে সাগর তরঙ্গের মতো আলোড়িত হচ্ছে তার অন্তর। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

সোমা বলল, যদি তুমি একান্তই ওই পুরুষপ্রবরকে সান্নিধ্য দানের জন্য মর্তে থাকতে চাও, তা হলে অবশ্যই স্বর্গাধিপতির অনুমতি প্রার্থনা করো!

উর্বশী চোখ মেলে বলল, বেশ তাই হবে। আমি তাঁর কাছেই আমার মনের বাসনা জানাব।

অপ্সরার দল দূরে অপেক্ষা করতে লাগল। উর্বশী বিদায় নিতে এল পুরুরবার কাছে।

আমি এখন সুরলোকে যাচ্ছি প্রিয়তম। অচিরেই ফিরে আসব আপনার কাছে। আপনি মুহূর্তকালও আমার জন্য চিন্তা করে কষ্ট পাবেন না।

পুরুরবা অধীর হয়ে বললেন, তোমার কি সত্যিই মনে থাকবে আমার কথা। শুনেছি স্বর্গের প্রলোভন অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

সমস্ত রাত্রি যে আনন্দ-সম্ভোগে কেটেছে আপনার সঙ্গে সে স্মৃতি ভুলে যাবার নয় প্রিয়। আমি অবিলম্বেই আসব, আপনার সঙ্গে আবার মিলিত হব এই সরোবর তীরে।

পুরুরবাকে প্রবোধ দিয়ে উর্বশী ফিরে গেল স্বর্গলোকে। সে রাত্রিতে পুরুরবার দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠল বাতাস। সে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হল নভোলোকে। নভোলোক স্পর্শ করে তা প্রবাহিত হল সুরলোকে।

দেবসভা আজ পূর্ণ। উর্বশী কাল ছিল অনুপস্থিত। সে নাকি নৃত্যের নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাই আজ দেবসভা উদগ্রীব উর্বশীর নতুন নৃত্য দেখবার জন্য।

মঞ্চে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে উর্বশী, এমন সময় বুকে এসে বাজল পুরুরবার দীর্ঘশ্বাস। মর্ত থেকে ভেসে এল একটা ক্ষীণ স্বর, তুমি কোথায় প্রিয়তমা।

মঞ্চে প্রবেশ করল উর্বশী। প্রোষিতভর্তৃকা নারীর কাতরতা তার সর্বাঙ্গে। বিরহ-বিধুরা নারীমূর্তি এই প্রথম দেখল স্বর্গলোকবাসীরা।

আবার মনে হল, কোনও নারী প্রিয়তমকে হারিয়ে উন্মাদিনীর মতো তার সন্ধান করে ফিরছে। অরণ্য বৃক্ষের অন্তরালে সে খুঁজে ফিরছে তার হারানো রতন। পুষ্পিত লতাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, তুমি কি দেখেছ আমার প্রিয়তমকে? তুমি যে বৃক্ষকে আশ্রয় করেছ, আমার প্রিয়তমও অমনই এক বৃক্ষের মতো বলিষ্ঠ। আমি তাকে আশ্রয় করেছিলাম।

এমনই বিষাদিনীর অভিনয় করতে করতে ঝড় নেমে এল। মেঘের ঘনঘটায়, বিদ্যুতের চমকে, অঝোর বর্ষণে সমস্ত চরাচর স্তম্ভিত, মথিত, বিপর্যস্ত।

উর্বশী বিষাদিনী, উর্বশী উন্মাদিনী। সে প্রমত্ত ঝড়ের নৃত্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নিতম্ব ছাড়িয়ে নেমেছে তার কৃষ্ণমেঘের মতো কেশ। চোখে বারে বারে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। পায়ের নূপুরে বেজে উঠছে বর্ষার ধারাপতন ধ্বনি।

সারা মঞ্চ পরিক্রমা করে সভাগৃহে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব তুলে বিষাদময়ী উর্বশী বিদায় নিল। সাধু, সাধু, ধ্বনিতে মুখরিত হল ইন্দ্রের নৃত্য-মণ্ডপ।

সেই রজনীতে নন্দনবনে পারিজাত বৃক্ষের তলায় ইন্দ্রের আহ্বানে এসে দাঁড়াল উর্বশী।

তোমার আজ রাতের নৃত্য পরিকল্পনার জন্য গ্রহণ করো এই মন্দার মালিকা।

উর্বশী নত নমস্কার জানিয়ে গ্রহণ করল সে মালা।

ইন্দ্র সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বললেন, এ কী উর্বশী! স্বর্গের আনন্দরূপিনীর চোখে অশ্রু!

উর্বশীর অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

তুমি মর্ত-মানবের মতো শোকে আকুল হচ্ছ উর্বশী! এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত।

প্রভু, প্রার্থনা আছে।

তোমার প্রার্থনা কি কোনদিন অপূর্ণ থেকেছে উর্বশী।

সত্যই প্রভু মর্তের স্পর্শ লেগেছে আমার দেহ মনে, তাই এ অশ্রুর প্রবাহ। আমি মর্তের এক মানুষকে ভালবেসেছি। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অনুমতি দিন, এই প্রার্থনা।

ইন্দ্র কিছু সময় নীরব থেকে বললেন, কে সে সৌভাগ্যবান উর্বশী?

মহারাজ পুরুরবা।

পুরুরবা। অত্যন্ত বীর্যবান পুরুষ, দানব-দ্রোহী, দেবতাদের পরম মিত্র।

তিনি আমাকে এক দানবের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কয়েকদিন মল্লযুদ্ধের শেষে দানব তাঁর হাতে নিহত হয়েছে।

মহারাজ পুরুরবাও কি তোমার প্রণয়প্রার্থী?

তাঁর প্রশ্রয় এবং আনুকূল্য আমি লাভ করেছি।

মর্তে অবস্থান করলে স্বর্গের বন্ধন তোমাকে ছিন্ন করে যেতে হবে উর্বশী।

আমি কি আর কোনওদিন ফিরে আসতে পারব না প্রভু?

পারবে। যেদিন প্রেমের উন্মাদনা কেটে যাবে। তোমরা প্রেমের প্রতিমা। প্রেমের রাজ্যে যদি হৃদয়ের অন্য কোনও ভাব প্রবেশ করে তা হলে দুর্বার প্রেমের স্রোতে লাগবে ভাটার টান। তখন ওই ভাটার টানেই ফিরে আসতে হবে মর্ত থেকে স্বর্গে।

আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন দেবরাজ।

তুমি যদি পুরুরবার সঙ্গে তোমার প্রেম অক্ষয় সূত্রে বেঁধে রাখতে চাও তা হলে কোনওদিনই জননী হতে চেয়ো না। যেদিন জননীপদ লাভ করবে, সেদিন কেটে যাবে তোমার প্রেমের উন্মাদনা আর তখনই তোমাকে ফিরে আসতে হবে স্বর্গে। বিধি প্রেম দিয়েই গড়েছেন অপ্সরাদের তনুমন। প্রেম ত্যাগ করে তারা দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারবে না।

প্রতীক্ষাকাতর পুরুরবার কাছে এসে দাঁড়াল উর্বশী।

তুমি সত্যই ফিরে এলে স্বর্গনটী।

আপনার ভালবাসাই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে প্রিয়তম।

মহারাজ বললেন, রাজ্যের মানুষ নিশ্চয়ই কাতর হয়ে পড়েছে আমার অদর্শনে। তারা অবশ্যই অন্বেষণ করে ফিরছে আমাকে। তুমি চলো আমার সঙ্গে। রাজ্যের কলালক্ষ্মীরূপে সুরম্য কোনও প্রাসাদে করব তোমার প্রতিষ্ঠা।

একটি অঙ্গীকারের প্রশ্ন আছে মহারাজ।

কী সে অঙ্গীকার কলাবতী? যে-কোনও অঙ্গীকার পালনের জন্য আমি সত্যবদ্ধ হয়ে রইলাম।

আমাদের ভালবাসার বন্ধনকে যদি অটুট রাখতে হয় তা হলে আমার গর্ভে কোনও সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন না।

তোমার এ শর্ত মেনে নিলাম ভদ্রে।

অন্তঃপুরচারিণী রমণীকুল, যাঁরা এতকাল রানির গৌরব মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা উর্বশীর আগমনে ম্লান হয়ে গেলেন। তাঁরা আর রাজার কক্ষে প্রবেশ করতেন না কৌতুক কলহাস্যে। যদি কোনওদিন কোনও প্রয়োজনে প্রবেশ করতেন, তা হলে প্রতিহারিণীর মুখে শুনতে পেতেন, মহারাজ দেবী উর্বশীর লীলা নিকেতনে।

পুরুরবা উর্বশীকে নিয়ে অরণ্যে যেতেন। অশ্বপৃষ্ঠে উর্বশীকে বসিয়ে নিজে পরিচালনা করতেন অশ্ব। অরণ্যের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁরা আদিম অরণ্যচারী নরনারীর মতো ঘুরে বেড়াতেন।

শিকার-লব্ধ পশুপক্ষীর মাংস, কন্দ, মূল, ফল তাঁরা আহার্যরূপে গ্রহণ করতেন। পান করতেন ঝরনার বা কোনও স্রোতস্বিনীর জল।

কখনও বা থাকতেন পর্ণকুটির নির্মাণ করে। পশুপক্ষী, জোনাকি, প্রজাপতি সেই পর্ণকুটির ঘিরে উর্বশীকে দেখাত মর্তের লীলা নৃত্য। শোনাত অশ্রুতপূর্ব সংগীত।

উর্বশী আনন্দে আত্মহারা হত। পুরুরবা বলতেন, এই অরণ্যভূমিতে, ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরের মধ্যে যে সুখ, তা রাজসিংহাসনে কিংবা রাজপ্রাসাদে নেই।

উর্বশী বলত, আমি এখানে এসে স্বর্গের সুখের কথা ভুলে গেছি প্রিয়তম। এই অরণ্যের লতা, পুষ্প, পল্লবে নিত্য চলছে প্রেমের আনন্দ উৎসব। আমি চিত্রিত প্রজাপতি, আর আলোর দূত খদ্যোতের কাছ থেকে শিখেছি নৃত্যের অভিনব লীলা। মর্ত আমাকে মগ্ন করেছে তার রূপে, বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে। বারবার একটি কথা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, আমি তৃপ্ত, আমি আনন্দিত।

অরণ্যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। মহারাজ দুরন্ত বালকের মতো বৃক্ষে আরোহণ করে শাখা থেকে কুসুম চয়ন করেন। নিম্নে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বালিকার ক্ষিপ্রতায় ছুটে এসে সে কুসুম কুড়িয়ে নেয় উর্বশী। মহারাজ অবতরণ করে ফুলের অলংকারে সাজিয়ে তোলেন প্রেয়সীকে।

কখনও বা দুর্গম পর্বতে আরোহণ করে উভয়ে নিশিবাস করেন পর্বত কন্দরে। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে গন্ধর্বগীত ভেসে আসে সুরলোক থেকে। মর্তভূমি থেকে উত্থিত কিন্নরগীত মিশে যায় তার সঙ্গে। সে এক অপার্থিব সুর-সঙ্গম।

পর্বত অথবা নদীতীরে পরিভ্রমণের কালে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় মেষচারক অথবা গোচারকের দল। সাধারণ বস্ত্রে আবৃত থাকায় মহারাজ অথবা উর্বশীকে চিনতে পারে না কেউ। ওরা কখনও বা তাদের সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও ওদের সঙ্গে একাসনে বসে আহার্য গ্রহণ করে, দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হয়।

তুষারশৈলে পরিভ্রমণকালে হিমানী বিগলিত জলপূর্ণ সরোবরে ওরা স্নানলীলায় মাতে। উর্বশীর প্রস্তুত করা আহার্য পানীয় গ্রহণ করার ফলে ওদের দেহে থাকে না কোনও প্রকার শৈত্যবোধ।

জলক্রীড়ায় মথিত হয় সরোবর। রাজহংস-রাজহংসীর মতো কখনও জলের গভীরে আবার কখনও বা জলতলে ওরা বিচরণ করে। স্বাভাবিক মিলনে যে এত আনন্দ, এত সুখ, সেই উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠে ওদের অন্তর।

কোনও এক দ্বিপ্রহরে একটি বৃক্ষতলে বসে ওরা সামান্য ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছিল। এমন সময় দেখা গেল দূরে দাঁড়িয়ে একটি লোক ওদের নিরীক্ষণ করছে।

সামান্য পোশাক পরিহিত দুটি নরনারীকে নিবিষ্ট হয়ে দেখছে একটি মানুষ, নিশ্চয়ই তার ভেতর কোনও কিছু উদ্দেশ্য আছে, এই ভেবে মহারাজ পুরুরবা গর্জন করে উঠলেন, কে তুমি? এই জনমানবশূন্য প্রদেশে কার অন্বেষণ করে ফিরছ?

লোকটি এগিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করে বলল, মহারাজ, এতক্ষণে আপনাকে চিনতে পেরেছি! আপনার কণ্ঠস্বরই আপনাকে চিনিয়ে দিয়েছে। আমি আপনার প্রাসাদের অন্যতম কঞ্চুকী। পশ্চাৎ দ্বার রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

এতকাল পরে প্রাসাদের একটি মানুষকে দেখে মহারাজ বড় প্রীত হলেন।

কী সংবাদ কঞ্চুকী? রাজ্যের কুশল তো? সভাসদেরা প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করছেন তো?

কঞ্চুকী একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র মাটিতে রেখে তার উপর উপবেশন করল। করজোড়ে বলল, মহারাজ, প্রভুহীন গৃহ চন্দ্রহারা রাত্রির মতো। অমানিশায় তস্কর ও অন্যান্য নিশাচরদের উপদ্রব বাড়ে। ধূর্ত শৃগালেরা অন্ধকারের সুযোগে গৃহপালিত পশুপক্ষীদের হত্যা করে। সূর্য বর্তমানে প্রায় দৃষ্টিহীন পেচক রাতের অন্ধকারে পূর্ণদৃষ্টি ফিরে পায়। তখন সে ভয়ংকর মূর্তিতে বিচরণ করে।

শস্যভাণ্ডারের রক্ষকের দৃষ্টি উপরিভাগের শস্য অপসারণের কাজে নিযুক্ত, তাই ভাণ্ডারের নিম্নভাগে মুষিকের উপদ্রব অত্যধিক। মহারাজ শেষ সংবাদ, শবদেহের অধিকার নিয়ে ভাগাড়ে শকুনিদের বিবাদ শুরু হয়েছে।

হুংকার দিয়ে উঠলেন মহারাজ পুরুরবা, ওরা কি ভেবেছে, পুরুরবা মুছে গেছে পৃথিবী থেকে? নিঃশব্দে, নিশ্চিন্তে চলে যাও কঞ্চুকী। আমি কোনও সংবাদ না দিয়ে ছদ্মবেশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হব রাজধানীতে।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল কঞ্চুকী। বলল, প্রভুর কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষায় সারা রাজ্য উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে।

কঞ্চুকী প্রস্থান করলে উর্বশী বলল, সকল অপরাধের মূলে যে তাকে দূর করুন মহারাজ।

অবশ্যই তাকে বিতাড়িত করব! রাজ্যে পৌঁছোলেই তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

উর্বশী নিজের বুকের দিকে তার চম্পক অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, আপনার সম্মুখেই সে অপরাধী মহারাজ।

পুরুরবা বললেন, ভালবাসায় অপরাধ নেই প্রিয়তমা।

কিন্তু মহারাজ, যে ভালবাসা মানুষের কর্তব্যকেও ভুলিয়ে রাখে সে ভালবাসা নিখাদ নয়?

পুরুরবা বললেন, হৃদয়ের সকল বৃত্তির ওপরে ভালবাসা। সে প্রচলিত পথ ধরে চলে না। সামাজিক অনুশাসন তাকে বাঁধতে পারে না। সব বৃত্তির ওপর শাসন চলে কিন্তু ভালবাসা কোনও শাসন মানে না। তুমি অকারণে তোমার ভালবাসাকে অপরাধী করছ প্রিয়ে।

উর্বশী বলল, এখনও আপনার মুকুট কেউ কেড়ে নেয়নি মহারাজ। তাই প্রজারা আপনার দিকেই চেয়ে আছে। আপনি তাদের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করুন, তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করুন।

পুরুরবা বললেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই রাজমুকুট আমি ভুল করে মাথায় তুলে নিয়েছি প্রিয়ে। এর গুরুভার বইবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। আর একে মাথায় ধারণ করার প্রবৃত্তিও আমার নেই। তুমি বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমার রাজ্যের একজন সাধারণ কৃষকও আমার ঈর্ষার পাত্র। সারাদিন মৃত্তিকা কর্ষণের পর সে যখন ক্লান্ত দেহে তার পর্ণকুটিরে ফিরে যায়, তখন দুটি প্রতীক্ষাকাতর হাত তার সেবায় নিযুক্ত হয়। সারারাত্রি দেহমনের বেদনা ভুলিয়ে দেয় একটি উত্তপ্ত ভালবাসার স্পর্শ। আমি যতই ওদের কথা ভাবি, রাজকার্য আমার কাছে তত গুরুভার হয়ে উঠে।

তুমি সম্রাট নও প্রিয়তম, তুমি যথার্থ প্রেমিক।

রাজ্যে ফিরে রাজকার্যে মন দিলেন পুরুরবা। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন অচিরে।

উর্বশী বলল, মহারাজ, অন্তঃপুরে আপনার অনুরাগিণী রমণীকুল আপনার প্রতীক্ষাকাতর। তাঁরা প্রিয়তমের বিচ্ছেদে নিদ্রাহীন নিশি যাপন করেন। তাঁদের দীর্ঘশ্বাস আমাকে প্রায়ই পীড়িত করে। তাঁদের ঈর্ষা কিংবা ঘৃণার পাত্রী হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না মহারাজ।

তুমি এত উদার উর্বশী! নারীর জন্য নারীর এতখানি ভাবনা সত্যই আমাকে বিস্মিত করেছে।

আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন মহারাজ।

সে বাক্য রক্ষিত হবে প্রিয়তমা।

মহারাজ পূর্বের ন্যায় তাঁর কক্ষে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন অন্তঃপুরচারিণীদের। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, উর্বশীর সঙ্গে মহারাজের সুখ-সঙ্গমের ঘোর কেটে গেছে।

মধ্যরজনীতে মহারাজ আসেন উর্বশীর লীলা-নিকেতনে। স্বর্গের স্বভাব ধর্মে উর্বশী পুষ্পের তোরণ আর পুষ্পসজ্জা নির্মাণ করে রাখে প্রতিদিন।

মহারাজ পুরুরবা পুলকিত হয়ে বলেন, প্রতিদিন নব নব ফুলসজ্জা!

পুষ্পের সৌরভই আপনার আগমনবার্তা বয়ে আনে। মহারাজ, প্রতিদিন আপনার ভালবাসা ওই বর্ণ গন্ধময় পুষ্পের মতো বিকশিত হোক, এই প্রার্থনা।

সম্প্রতি মহারাজ পুরুরবার অন্তরে একটি বাসনা জাগ্রত হয়েছে। তিনি ভালবাসার শেষ পরিণতি জানতে চান।

শুরু হল ছদ্মবেশে নগর পরিক্রমা।

একদিন তিনি এসে দাঁড়ালেন, একটি জরাজীর্ণ গৃহের সামনে। দ্বার উন্মুক্ত। অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিল ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর।

ছদ্মবেশী মহারাজ দ্বারে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলেন।

বৃদ্ধ বলল, শেষ জীবনে অসহায় অবস্থায় পড়ব, কে জানত। যৌবনের জোয়ারে আনন্দের স্রোতে ভেসেছি, তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, এমন করে ভাটার টানে তলিয়ে যেতে হবে।

বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, একটি সন্তান যদি আমার কোলে আসত তা হলে আজ এমন করে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসে থাকতে হত না। সে-ই আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টির মতো কাজ করত।

বৃদ্ধের কাশি শুরু হল। সহজে কি থামতে চায়। শেষে থামল, তখন প্রায় হত চেতন।

মহারাজ উঁকি দিয়ে দেখলেন, বৃদ্ধা ইতিমধ্যে নিজের কোলে তুলে নিয়েছে বৃদ্ধের মাথাটি। নিজের হাতে একটু একটু করে বুকের উপর ঘষে দিচ্ছে কোনও একটা প্রলেপ।

পুরুরবা পথে বেরিয়ে এলেন। সন্তানহীন বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার পরিণতি দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সত্যই তো, একটি সন্তান যদি থাকত ওদের তা হলে এমন সান্ত্বনাহীন জীবন হয়তো কাটাতে হত না।

কয়েকদিন পরে আবার মহারাজ বহির্গত হলেন ছদ্মবেশে।

জনপদ অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালেন একটি বনের ধারে! পাহাড়ি বন। একটি ঝরনা দুরন্ত বালিকার মতো পাথরের স্তূপের পাশ কাটিয়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে এসে মহারাজ পুরুরবার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

ক্লান্ত ছিলেন মহারাজ। প্রখর সূর্যতাপে দগ্ধ হচ্ছিল চরাচর। পিপাসার্ত পুরুরবা নত হয়ে অঞ্জলি ভরে জলপানের জন্য ঝরনার জলে হাত বাড়ালেন।

সহসা বৃক্ষান্তরাল থেকে নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ শব্দে তিনি জলপানে বিরত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন!

আবার সেই শব্দ ভেসে এল, পথিক, ওই জল পান করবেন না।

মহারাজ এই নিষেধের কারণ জানতে না পেরে অবাক হয়ে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এবার সেই রমণীকণ্ঠেই উচ্চারিত হল, আরও উপরের পাহাড়ে আরোহণ করুন, সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন।

কৌতূহলী মহারাজ শব্দ লক্ষ করে উপরে উঠে গেলেন।

সামান্য উপরে উঠেই তিনি রমণীকে দেখতে পেলেন।

রমণী একা ছিল না। বিকৃত মনুষ্যরূপধারী আরও একজনকে দেখা যাচ্ছিল রমণীর পাশে। রমণী সেই মানুষটিকে ঝরনার জলে স্নান করাচ্ছিল।

মহারাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানুষটিকে লক্ষ করে বুঝতে পারলেন, গলিত কুষ্ঠে মানুষটির দেহ একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। মুখমণ্ডল কোনও মানুষের বলে মনে হচ্ছিল না। হস্তপদ প্রায় অঙ্গুলিবিহীন।

কিন্তু কী আশ্চর্য। রমণী পরমাসুন্দরী, বয়ঃক্রমও অধিক নয়। অন্তরের সমস্ত যত্ন ঢেলে সেই নারী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মানুষটির সেবায় নিযুক্ত ছিল।

স্নান শেষে সন্তানের স্নেহে মানুষটিকে বুকের উপর তুলে নিয়ে রমণী ঢুকল পাশের কুটিরে।

মহারাজ হতবাক হয়ে কুটিরের সামনে একটি বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে, সম্ভবত মানুষটির পরিচর্যা শেষে রমণী কুটির থেকে বহির্গত হল।

বিস্মিত হয়ে ছদ্মবেশী মহারাজকে জিজ্ঞেস করল, আপনি।

মহারাজ বললেন, অপরাধ নিয়ো না, আমি কৌতূহল বশে এখানে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে আছি।

কী সে কৌতূহল মহাশয়?

এই নির্জন অরণ্যে একাকিনী এ ধরনের একটি মানুষকে নিয়ে দিনের পর দিন থাকা কী করে সম্ভব, তাই ভাবছিলাম।

নারী বলল, আমার ভাগ্যই আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে। ঈশ্বর আমার স্বামীসেবার পরীক্ষা নিচ্ছেন।

কতদিন এই কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রয়েছ তুমি?

দীর্ঘ দশ বৎসরকাল।

তোমার ভরণপোষণ?

জনপদে দাসীবৃত্তি করে কিছু উপার্জন করি। তা ছাড়া অরণ্য থেকে কন্দ, মূল, ফল, কাষ্ঠ, সবই সংগ্রহ করি।

তোমার কোনও সন্তানাদি নেই?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল, সে সন্তানহীনা। মনে হল, তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। অঞ্চলে দুটি চোখ মার্জনা করে বলল, স্বামী বলুন, সন্তান বলুন, ইনিই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন।

একটু থেমে আবার শুরু করল, আমি একসময় একজন বলিষ্ঠ যুবককে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। সেই স্মৃতি আজও আমার বুকের ভেতর উজ্জ্বল হয়ে আছে। ওর দিকে আজও যখন চেয়ে থাকি ওর এই গলিত অঙ্গের উপরে সেদিনের সেই পরিপূর্ণ মানুষটি এসে দেখা দেয়?

মহারাজ পুরুরবা ফিরে আসতে আসতে ভাবলেন, প্রেমই যথার্থ স্পর্শমণি, যা সমস্ত জীবনটাকে ধন্য আর পূর্ণ করে দিয়ে যায়। তবু এই প্রেমের পূর্ণতার জন্য জীবন আর একটি অঙ্কুরের প্রত্যাশা করে। সে অঙ্কুর সন্তান। যে একদিন পুষ্পিত হয়ে বৃক্ষটিকে পূর্ণতা দান করবে।

মহারাজ উর্বশীর লীলা নিকেতনে প্রবেশের পূর্বে উদ্যান অতিক্রম করতে গিয়ে দেখলেন, একটি চম্পক বৃক্ষে কয়েকটি পক্ষীশাবক ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দ করছে। হঠাৎ মুখে খাদ্যবস্তু নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হল পক্ষীজননী। পরম মমতায় ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাল সন্তানদের।

কিছুদিন পূর্বে দুটি পক্ষীকে এই বৃক্ষশাখায় নীড় রচনা করতে দেখেছিলেন মহারাজ। তারপর ওই কুলায় বসে তারা যে সুমিষ্ট কূজন তুলত তাও শুনেছেন পরম আগ্রহে। কিন্তু আজ নতুন মূর্তিতে দেখলেন সেই পক্ষিণীকে। মাতৃমমতায় পূর্ণ একটি হৃদয়ের ছবি।

মহারাজ ভুলে গেলেন, উর্বশীর সঙ্গে তাঁর মিলনের নির্দিষ্ট শর্তটি। অপুত্রক পুরুরবা পুত্র কামনায় অধীর হয়ে উঠলেন।

কিছুকাল পরে উর্বশী হল সন্তানসম্ভবা। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন পুরুরবা। কিন্তু নির্বাক উর্বশী। তার ভালবাসার নিভৃত নিকেতনে এতদিন পরে বয়ে এল নন্দনের বাতাস। সূর্যের সোনালী অক্ষরে লেখা পত্র তার হাতে এসে পৌঁছোতে লাগল। ধারা পতন ধ্বনিতে সে শুনতে পেল সুরলোকের নৃত্যমণ্ডপে অপ্সরাদের মঞ্জীর ঝংকার।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মহারাজ পুরুরবা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। রাজ্যে উৎসবের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সেই কান্তিমান শিশুটির মুখ দর্শন করল না একজন। সে তার গর্ভধারিণী, উর্বশী।

এক জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে সহসা মহারাজ পুরুরবার নিদ্রাভঙ্গ হল। একী! কোথা গেল প্রাণের প্রতিমা উর্বশী।

মহারাজ দেখলেন, দ্বার উন্মুক্ত। উন্মাদের মতো ছুটে চললেন পুরুরবা। জনপদ, পথ, প্রান্তর পার হয়ে তিনি প্রবেশ করলেন অরণ্যে। সেই অরণ্যভূমিতে উচ্চারিত হতে লাগল স্মৃতির প্রেম-গাথা।

মহারাজ পুরুরবা শোকে কাতর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি চেতন-অচেতনের পার্থক্য ভুলে সবাইকে শোনাতে লাগলেন তাঁর শোকবার্তা।

অবশেষে তিনি এসে পৌঁছোলেন সেই সরোবর তীরে যেখানে তিনি দেখেছিলেন স্বর্গের আনন্দস্বরূপিণী উর্বশীকে। উদ্ধার করেছিলেন দানবের সঙ্গে সংগ্রাম করে। উর্বশী তখন স্নান শেষে প্রস্তুত হচ্ছে সরসীর পরপারে পর্বতারোহণের জন্য।

পুরুরবা আর্তকণ্ঠে বললেন, যেয়ো না। একটি মুহূর্তও আমি তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না প্রিয়তমা।

উর্বশী ফিরে দাঁড়াল। বলল, প্রিয়তম, মর্তের ভালবাসা ছেড়ে যেতে আমারও বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবু যেতে হবে, এ আমার নির্বন্ধ।

শোকে উন্মাদ পুরুরবা বললেন, তোমাকে হারিয়ে আমি হিংস্র জন্তুর মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করব। এমনি করে ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব আমি।

উতলা হওয়া বীর্যবান পুরুষের ধর্ম নয় প্রিয়তম। আমার হৃদয় দয়ামায়াহীন হিংস্র ব্যাঘ্রীর মতো জানবেন। আপনি উত্তরাধিকারী পেয়েছেন, তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। সেখানেই আমি বেঁচে থাকব।

তোমার সন্তানকে তুমি ভুলে যাবে উর্বশী?

স্বর্গের অপ্সরা কারও জায়া নয়, জননী নয়, সে শুধু প্রেমিকা। অনন্ত যৌবনের হাতে সে বাঁধা পড়ে আছে। যৌবনকে অতিক্রম করে যাবার কোনও ক্ষমতাই তার নেই প্রিয়তম।

ধীরে ধীরে আকাশ থেকে প্রসারিত হতে লাগল উষার পথ। সূর্যের সোনালি রথ এসে থামল পর্বতের তুষার চূড়ায়। উর্বশী নূপুরের ধ্বনি তুলে লীলায়িত দেহভঙ্গিমায় পর্বতারোহণ করতে লাগল সেই রথ লক্ষ করে।

পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনী সমাপ্ত হওয়ামাত্র একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অহল্যার বুক ঠেলে। সে বলল, জানি না, মিলনের গভীর লগ্নে কেন এমন করে বিচ্ছেদের হাহাকার বেজে ওঠে।

ধৃতি বললেন, স্বর্গ চিরদিনই মর্তকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সে কখনও কোনও সুরলোকবাসীকে মর্তে ফেলে রেখে দিতে চায় না।

অহল্যা মনে মনে উচ্চারণ করল, যদি কোনওদিন সুযোগ আসে তা হলে স্বর্গের দেবশিশুকে বন্দি করে রাখব মর্ত-মায়ের স্নেহ-বন্ধনে।

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হল অহল্যার অধর। আলো-অন্ধকারের তরল তরঙ্গে সে ছবি ধৃতির দৃষ্টির অলক্ষে মিলিয়ে গেল।

আজ আশ্রম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিব্য আভায়। কিংশুক বেদিকায় বসে আছেন চতুর্মুখ। কিংশুকের শাখায় শাখায় সজ্জিত পুষ্পের প্রজ্বলিত প্রদীপ।

চতুর্মুখের পার্শ্বে বসে রয়েছেন মহারাজ অসিতদেবল! কন্যা প্রবাহিনীকে সম্প্রদান করছেন তিনি। বৃদ্ধাশ্বের পুত্র গালভের হাতে কন্যা সম্প্রদানের পরামর্শ দিয়েছেন স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা।

প্রবাহিনীর অন্তর আজ আনন্দে পূর্ণ। সখী অহল্যার যমজভাই গালভ তার জীবনসঙ্গী হতে চলেছে। আবাল্য পরিচিত গালভ তার গোপন অন্তরে ভালবাসার স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছিল। এখন সে গোপন আসন ছেড়ে উঠে এসেছে প্রকাশ্য বেদিতে। গালভ সুন্দর, গালভ সংযতবাক। নিত্য দেবার্চনা আর জ্ঞানার্জনই গালভের একমাত্র আরাধনা।

ব্রহ্মা অসিতদেবলকে বলেছিলেন, তোমার কন্যা অতিশয় সুশীলা। এই স্নিগ্ধ স্বভাবের কন্যা কোনও রাজগৃহের বধূ হয়ে গেলে সুখী হবে না। প্রতিটি রাজপ্রাসাদই অসিতদেবলের প্রাসাদ নয়! রাজগৃহ প্রায়ই ষড়যন্ত্র আর ব্যভিচারে পূর্ণ হয়। তোমার এ কন্যা সেইসব রাজগৃহকে অন্তর থেকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

অসিতদেবল বলেছিলেন, প্রভু আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য করেই আমি রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেছি। প্রজাদের সেবার ভেতর দিয়েই আমি পেয়েছি তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। এ সকলই আপনার সুমঙ্গল উপদেশের ফল প্রভু। আজ আপনি আদেশ করুন কার করে আমি আমার একমাত্র মাতৃহীন কন্যাটিকে সমর্পণ করব।

ব্রহ্মা বলেছিলেন, তোমার পরলোকগতা মহিষীর প্রিয় সহচরীর পুত্র গালভ থাকতে আমি অন্য কোন সৎপাত্রের কথা চিন্তা করব অসিতদেবল?

তাই এ বিবাহ অনুষ্ঠান। ব্রহ্মার ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও প্রাসাদে সম্পন্ন না করে এই আশ্রমের মাঙ্গলিক পরিবেশে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

এ আশ্রমটি মহারাজ অসিতদেবলই নির্মাণ করেছিলেন প্রিয় মহিষীর অনুরোধে। অহল্যার জননী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাঝে মাঝে দুই সখীতে আসতেন এই আশ্রমে। কিছুকাল কাটিয়ে যেতেন।

এরপর একসময় মর্তের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন দুই সখী। তখন পবিত্র আশ্রমটি পরিণত হল ঋষি-নিবাসে। যে-কোনও তপস্বী ইচ্ছা করলেই কিছুদিন এই তপোবন পরিবেশে থেকে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হতে পারতেন।

আজ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ঋষি বৃদ্ধাশ্ব। তিনি সম্প্রতি হিমালয় থেকে মহারাজ অসিতদেবলের প্রেরিত রথারোহণে এসে পৌঁছেছেন আশ্রমে। এ বিবাহে তিনি সুখী। তবু পূর্ণ আনন্দ তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। কন্যা অহল্যাকে এখনও তিনি পাত্রস্থ করতে পারেননি। যদিও ব্রহ্মা তাঁকে আশ্বস্ত করে রেখেছেন তবু পিতার অন্তর থেকে অনূঢ়া কন্যার ভার একেবারে লাঘব হয়ে যেতে পারে না।

ধৃতি কল্যাণী জননীর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আচার অনুষ্ঠানের যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, যাজ্ঞিকরা চাইবামাত্র হাতের কাছে যাতে সব কিছুই পেয়ে যান, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছেন ধৃতি।

অহল্যা আজ আনন্দে উদ্বেল। পিতা এসেছেন বহুদিন পরে। দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলন হয়েছে পিতা-পুত্রীর। অহল্যা মোচন করেছে আনন্দাশ্রু।

এদিকে আবাল্যের প্রিয়সখী হচ্ছে ভ্রাতৃজায়া। কোনও কিছু হারাতে হবে না তাকে। বিচ্ছেদের বাঁশি ব্যথিত করবে না তার হৃদয়।

যজ্ঞে হোতার আসনে বসেছেন ঋষি গৌতম। নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত কার্য পরিদর্শন করছেন তিনি। উন্নত ললাট, প্রদীপ্ত চক্ষু, মধ্যবয়সি কান্তিমান তপস্বী। সবার মধ্যে থেকেও দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা আছে তাঁর।

বর-বধূ অগ্নি প্রদক্ষিণ করল। মন্ত্র উচ্চারণ করলেন গৌতম। তাঁর সুস্পষ্ট সুরেলা উচ্চারণ বহুদূর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেল বাতাস।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সকলেই তাকাচ্ছিল গৌতমের দিকে। অহল্যা অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ক্রিয়াকলাপ। তারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল ঋষি গৌতমের দিকে।

বিবাহ কার্য শেষ হতেই বর-বধূকে নিয়ে ধৃতি আর অহল্যা আশ্রম-অভ্যন্তরে চলে গেলেন।

ব্রহ্মা বেদির উপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হোমাগ্নি নির্বাপিত কোরো না। এবার হোতার আসনে বসবে ঋষি মেধাতিথি।

গৌতম তাকালেন ব্রহ্মার মুখের দিকে। উপস্থিত সকলেই বিস্মিত। কারণ, গৌতম এখানে প্রধান পুরোহিতের কর্তব্য পালন করছিলেন। ঋষি গৌতম যোগ্যতম ব্যক্তি। চারজন প্রধান পুরোহিত ও দ্বাদশজন সহকারী ঋত্বিককে নিয়ে তিনি সমস্ত কর্ম পরিচালনা করছিলেন। সহসা ব্রহ্মার আদেশে বিচলিত হল গৌতমের অন্তর।

ব্রহ্মা বললেন, গৌতম, আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা চিরদিনই অবিচল। আজ আমি তোমাকে একটি আদেশ করব, প্রতিপালন করার জন্য প্রস্তুত হও।

গৌতম বিনীত মস্তকে বললেন, আদেশ করুন প্রজাপতি।

ব্রহ্মা এবার অহল্যার পিতা বৃদ্ধাশ্বকে বললেন, তোমাকে আমি একসময় অহল্যার উপযুক্ত পাত্র স্থির করে রেখেছি বলেছিলাম। জিতেন্দ্রিয় গৌতমই আমার সেই নির্বাচিত পাত্র। তুমি এই বাসরেই কন্যা সম্প্রদান করো। গৌতমের দিকে ফিরে বললেন, আমার বাসনা নিশ্চয়ই আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না বৎস।

গৌতম সম্মতি জানালেন মস্তক নত করে।

ব্রহ্মা বললেন, অন্তঃপুরে যাও বৃদ্ধাশ্ব। কন্যাকে সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত করো।

আশ্রমের নারীনিবাসে পৌঁছে গেল সংবাদ। অহল্যা বিহ্বল, স্তম্ভিত। বয়সের পার্থক্য তার মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সে সারাক্ষণ সম্ভ্রমের চোখে দেখছিল গৌতমকে, কিন্তু জীবনসঙ্গীর আসনে বসিয়ে দেখার কথা তার সুদুর কল্পনাতেও আসেনি।

বৃদ্ধাশ্ব রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, প্রস্তুত হও মা। পিতৃগৃহ থেকে তোমার বিদায় আসন্ন।

অহল্যা ঋষি পিতার কাছে কোনও আবেদন করল না। আকৈশোর সে শুনে এসেছিল, তার জীবনসঙ্গী নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু সে রহস্যের দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল। আজ উন্মুক্ত হয়েছে সেই দ্বার। বেরিয়ে এসেছে প্রকাশ্য আলোকে সেই অজানা পাত্রটি। এখন তাকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নিতে হবে। হৃদয়াসনে বসাতে পারবে কি না, সে চিন্তা এখন অবান্তর।

শুধু বিবাহমন্ত্র উচ্চারণের সময় একবার সে বিচলিত হয়েছিল। বর বলছিল বধূকে :

যদ্ ইদং হৃদয়ং তব
তদ্ ইদং হৃদয়ং মম
মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু... ।'

তোমার হৃদয় আমার আর আমার হৃদয় তোমার। আমার ব্রতে মিলুক তোমার হৃদয়।

অহল্যা ভাবছে, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, এ বধূর প্রার্থনা নয়। কী করে দুটি হৃদয় মিলবে একসঙ্গে। কী করেই বা সে হবে গৌতমের ব্রতের অনুগামিনী। তার হৃদয় থেকে এখনও যায়নি আর একজনের স্মৃতি। তার মনের মুকুরে আজও এসে পড়ে সেই পুরুষোত্তমের প্রতিচ্ছবি।

নববধূকে নিয়ে গৌতম আশ্রমে প্রবেশের আগে যে প্রান্তর পেরিয়ে এলেন, সেটি বন্ধ্যা। কঠিন পার্বত্যভূমি, হলকর্ষণের অনুপযুক্ত।

গৌতম বললেন, আশ্রমের দক্ষিণে অনুর্বর এই অহল্যা-ভূমি। বামে শতদ্রুর একটি শাখানদী আশ্রম স্পর্শ করে চলে গেছে। ওই স্রোতস্বিনীর কল্যাণেই আশ্রম ফল পুষ্প পল্লবে পূর্ণ।

অহল্যা অনুর্বর প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল। তার নামের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল এই প্রান্তরের!

গৌতম দ্বিতীয় দিনে অহল্যাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি আশ্রমবাসী তপস্বী। আমাদের বিবাহ, তপস্যাধর্মের বিঘ্ন না ঘটিয়ে তার সহায়ক হয়। তোমাকে আমার তপস্যা-সঙ্গিনী হতে হবে।

অহল্যা বলল, আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অনুগ্রহ করে আমার কর্তব্য নির্দেশ করুন।

গৌতম বললেন, পঞ্চবর্ষের জন্য আমি দুরূহ ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছি। তৃতীয়বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও ব্রত উদযাপনে দুই বৎসর বাকি।

গৌতম থামলেন। অহল্যা কোনও মন্তব্য করল না।

গৌতম আবার বলতে লাগলেন, তুমি আমার এই ব্রতসাধনে প্রতিনিয়ত সাহায্য করবে, এই আমার ইচ্ছা। আশা করি আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে তোমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

অহল্যা নতমুখে নির্বাক বসে থেকে তার সম্মতি জানাল।

গৌতম বললেন, এখন থেকে আশ্রমের প্রতিদিনের কাজ তোমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হোক, এই আমার অভিপ্রায়।

অহল্যা বলল, তাই হবে। প্রথমে কিছু ত্রুটি ঘটবে, ক্ষমা করে নেবেন।

অনভিজ্ঞের ত্রুটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরে সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে।

অহল্যা পুষ্প চয়ন, গাভীর পরিচর্যা, সলিল সঞ্চয়, খাদ্যপ্রস্তুত, সর্ব কর্মেই নিজেকে নিযুক্ত রাখল। নিত্যকার হোম-যজ্ঞাদিতে স্বামীকে সাহায্য করতে লাগল নানাভাবে।

গৌতম নব বিবাহিতা পত্নীর আচার আচরণে বিশেষ পরিতৃপ্ত হলেন।

নিশীথে পাশাপাশি প্রস্তুত থাকে দুটি শয্যা। গৌতমের অঙ্গ সংবাহন করে, স্বামী নিদ্রা গেলে তবেই অহল্যা নিজের শয্যা গ্রহণ করে।

জিতেন্দ্রিয় গৌতম নিজেকে পরীক্ষার আর একটি সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই অপরূপা সুন্দরীর সাহচর্যে থেকেও তিনি প্রথম রিপুর রাশ টেনে ধরতে পেরেছেন। এতে তাঁর আত্মশক্তি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। অহল্যাকে এখন স্ত্রীরূপে না ভেবে সাধনসঙ্গিনীরূপেই ভাবছেন গৌতম।

অপ্সরাদের বিমোহিনী শক্তিতে ধ্যানভঙ্গ হয় ঋষিদের। তাঁরা চঞ্চল হন স্বর্গনটীদের কটাক্ষপাতে। গৌতম তাই অনুশীলন করে চলেছেন কঠোর ব্রহ্মচর্যের। ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে

যদি ইন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে উর্বশীকেও পাঠান তা হলেও তাকে ফিরে যেতে হবে প্রত্যাখ্যানের অপমান আর লাঞ্ছনা বহন করে।

অহল্যার আগমনে তাই খুশি হয়ে উঠলেন গৌতম। ব্রহ্মার আদেশে প্রথমে বিস্মিত, বিচলিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখন বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, ব্রহ্মা তাঁকে আদেশের ছলে আশীর্বাদই করেছেন।

মাঝে মাঝে গৌতম তপস্যার জন্য বহির্গত হন হিমালয়ের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে। সেখানে তপস্বীদের সঙ্গে চলে তাঁর পারমার্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা। দুই বা তিনটি ঋতু কাটিয়ে তিনি ফিরে আসেন আশ্রমে।

অহল্যার কর্মে বিরতি নেই। আলস্য তার স্বভাব-ধর্মও নয়। বৃহদায়তন আশ্রমের নানাবিধ কর্মে নিযুক্ত থাকতে হয় তাকে। সারাদিনের কর্মের শেষে সে যখন শ্রান্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করে তখন সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে নামে নিদ্রা।

কোনও কোনও সময় দক্ষিণের বাতাস সহসা প্রগলভ হয়ে ওঠে। কুলুকুলু ধ্বনিতে বন বনান্ত কার যেন আগমনের বার্তা শুনতে পায়। মঞ্জরিত হয় আম্রতরু, অনুরাগের রঙে আরক্ত হয় অশোক, কৃষ্ণচূড়া, কিংশুক।

সেই বিশেষ সময়গুলি অহল্যাকে সহসা বিহ্বল করে তোলে। সমস্ত কর্মের মধ্যেও সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে কোনও অনিমন্ত্রিত অতিথির আগমন প্রত্যাশায়।

সে রাত্রিগুলি বোবা কান্নায় কূলপ্লাবী।

আবার যখন বর্ষাগমে কদম্ব তরু পুষ্পিত হয়, তখন সেদিকে তাকিয়ে শিহরন জাগে অহল্যার। কোনও অন্তরঙ্গ জনের স্পর্শ কামনায় সে রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

বর্ষার রাত্রিগুলি প্রতীক্ষা-কাতর। মেঘধ্বনিতে, বিদ্যুতের ঘন ঘন চমকে, বৃষ্টিধারার পুষ্প বর্ষণে মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে তার একান্ত প্রার্থিত জন। ঝলকে ঝলকে কেয়ার গন্ধ আশ্রম কুটিরে ভেসে এসে বলে, ওই আসে তোমার মন-বন বিহারী রাজ রাজেশ্বর।

কিন্তু দিনের পর দিন শুধু প্রত্যাশায় বসে থাকা, যৌবনের পুষ্পিত নিকুঞ্জে কেউ আসে না।

এক দ্বিপ্রহরে আহারান্তে চম্পক তরুতলে বসে ছিল অহল্যা। এমন সময় আশ্রমের পথে রথের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা গেল।

সচকিত অহল্যা উঠে দাঁড়াল। রথ এসে থামল মাধবী বিতানের সামনে। এগিয়ে গেল অহল্যা। রথ থেকে নেমে এল প্রবাহিনী।

দুই বান্ধবী বাঁধা পড়ল বাহুবন্ধনে।

কতক্ষণ পরে প্রবাহিনী প্রথম কথা বলল, ঋষিবর কোথায়?

অহল্যা অশ্রুসিক্ত আঁখি মার্জনা করে বলল, তপস্যা ও ধর্মালোচনার কারণে তিনি মাসাধিককাল ঋষিকুলের সম্মিলনভূমিতে গমন করেছেন।

তুমি একাকিনী এই বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে কাটাচ্ছ!

ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল অহল্যার মুখে। বলল, আরও নির্জন, আরও সুবিশাল এক প্রান্তর আছে। সেই প্রান্তরই আমার শঙ্কার কারণ প্রবাহিনী।

বুদ্ধিমতী প্রবাহিনী সখীর মানসিক শূন্যতা এবং হাহাকার উপলব্ধি করল। সে এ বিষয় নিয়ে অধিক দূর অগ্রসর হল না।

এবার সকৌতুকে বলল, তোমার অন্তঃপুর লুণ্ঠনের ভয়েই কি তুমি আমাকে বাইরের অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে রাখলে সখী?

অহল্যা প্রবাহিনীর হাত ধরে সাগ্রহে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তপস্যার ধনে পূর্ণ হয়ে আছে ঋষির ভাণ্ডার। ঋষি অনুপস্থিত। যত পারো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাও।

প্রবাহিনী বলল, তুমি কি সত্যই একা সখী?

নিঃসঙ্গতা বাইরে নয় প্রবাহিনী, অন্তরে। সে নিঃসঙ্গতার ভার দুর্বহ।

সহসা পরিস্থিতিকে লঘু করে নিয়ে অহল্যা বলল, একা নই প্রবাহিনী, ঋতুচক্র আমার দৃষ্টিকে নন্দিত করে আবর্তিত হয়। আশ্রমতরু প্রতিদিন আমাকে সুরভিত পুষ্প উপহার দেয়। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা, পাখিদের কাকলি ধ্বনিতে পূর্ণ থাকে আশ্রম। ধেনুগুলি আমার আহ্বানের অপেক্ষায় গোশালায় হাম্বাধ্বনি করতে থাকে। আমার সঙ্গীর অভাব নেই সখী।

প্রবাহিনীকে নিয়ে সে এবার প্রবেশ করল তার কুটিরে।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্রবাহিনী খুশি হয়ে উঠল। অহল্যার গৃহিণীপনার ছবি তাকে তৃপ্ত করল।

গালভ কেমন আছে প্রবাহিনী? সে তার হোম আরাধনার অবসরে তোমার দিকে দৃষ্টি দিতে পারছে তো?

প্রবাহিনী বলল, আমি কিছুকাল পিত্রালয়ে এসে রয়েছি। সেখান থেকে চলে এলাম তোমাকে দেখতে। তোমার ভ্রাতার সম্বন্ধে আর প্রশ্ন কোরো না। এখন হোমকর্ম গৌণ, পত্নীর মনোরঞ্জনই মুখ্য কর্ম হয়ে উঠেছে। আমি সংকোচ এড়াতে কিছুকাল চলে এসেছি পিত্রালয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে অহল্যা বলল, তোমার সৌভাগ্যকে যে-কোনও নারীই ঈর্ষা করবে। স্বামীর সঙ্গ তোমার দুর্বহ হয়ে উঠল প্রবাহিনী!

না না, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সখী। আর্যপুত্রের জন্য সর্বক্ষণ মন আমার ব্যাকুল। আমি চাই কিছুকাল অদর্শনে বিরহ বাড়ুক। পুনর্মিলন মধুময় হবে।

আর্যা ধৃতিকে কী রকম দেখে এসেছ? তাঁর মনের প্রসন্নতা অটুট আছে তো?

তিনি চির আনন্দময়ী। তবে তোমার অদর্শনে মাঝে মাঝে কাতরতা প্রকাশ করেন।

তিনি তোমাকে নাগকেশরের তলায় নিয়ে গিয়ে জ্যোৎস্না রাতে গল্প শোনান তো?

প্রবাহিনী বলল, কোনওদিনও না। সন্ধ্যায় তাঁর মুখোমুখি হলেই বলেন, সারাদিন আশ্রমের কাজে গালভ বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তুমি গিয়ে তার একটু পরিচর্যা করো।

পিতা এখন কি তাঁর তপস্যার ক্ষেত্রে চলে গেছেন?

বহুকাল। যাবার সময় বলে গেছেন, এ আশ্রম তোমাদের। নিয়ত কল্যাণ-কর্ম করে যাবে। আমি তোমাকে সংসারী করে নিজে সংসার থেকে মুক্তি নিয়ে গেলাম। এখন থেকে পরিপূর্ণ পরমার্থ চিন্তায় কাটবে আমার দিন। পরমানন্দ লাভ করে ধন্য হব আমি।

অহল্যা মনে মনে বলল, ঋষির কন্যা হয়ে, মহাতপস্বীর পত্নী হয়ে আমিই কেবল নিজেকে ধন্য মনে করতে পারলাম না।

অহল্যা এবার প্রবাহিনীর দুটি হাত ধরে বলল, তুমি কয়েকটা দিন আমার এখানে কাটিয়ে যাবে তো সখী?

সেই ভেবেই তো এসেছিলাম এখানে, কিন্তু তোমাকে একা দেখে ভরসা পাচ্ছি না মনে।

অহল্যা বলল, লুণ্ঠনের ভয় রাজগৃহে, যেখানে সম্পদ আছে। আমার এখানে কীসের আশায় দস্যু ধাওয়া করবে সখী?

তোমার মতো রত্ন কোনও রাজার রাজপ্রাসাদেই মিলবে না। যে দস্যু রত্নের সন্ধান রাখে সে বৈজয়ন্ত ধাম ফেলেও এখানে আসবে রত্নের সন্ধানে।

প্রবাহিনীর কথা শুনে সহসা চমকে উঠল অহল্যা। সে কোন দস্যু, যে সুরলোকের সম্পদ ফেলে চলে আসবে অহল্যার আকর্ষণে।

একটি মহান দস্যুর মুখচ্ছবি এই মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠতে দেখল অহল্যা।

রথের চালককে নির্দিষ্ট একটি দিনে পুনরায় আসতে বলে প্রবাহিনী থেকে গেল অহল্যার আশ্রমে।

সেই রাতে একই শয্যায় বহুদিন পরে শয়ন করল দুই সখী। অহল্যা জানতে পারল প্রবাহিনী গর্ভে ধারণ করছে গালভের সন্তান। সে মনের আনন্দে জড়িয়ে ধরল প্রবাহিনীকে।

পরদিন প্রভাতে কেমন এক উদাস দৃষ্টিতে অহল্যা তাকিয়ে ছিল আশ্রমের দক্ষিণে সেই আকর্ষিত ধূ ধূ প্রান্তরের দিকে। বড় রিক্ত, বড় শূন্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। গতরাতে প্রবাহিণী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সন্তান-সম্ভাবনার কথা। সে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বলতে পারেনি, সে এখনও অ-হল্যা, ওই অনুর্বর প্রান্তরের মতোই অকর্ষিতা।

কাছে এসে দাঁড়াল প্রবাহিনী। বলল, আশ্রমের স্থান নির্বাচনে ঋষিবরের প্রশংসা না করে পারছি না। সামনেই খরস্রোতা নদীর সুনীল জলপ্রবাহ, অদূরে ধূমল পর্বতশ্রেণি। শুধু স্থান নির্বাচনই নয়, আশ্রমের অঙ্গসজ্জাতেও ঋষিবরের নিপুণ হস্ত ও কুশলী পরিকল্পনা কাজ করেছে!

অহল্যা তার সামনে প্রসারিত বন্ধ্যা ভূমির দিকে প্রবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আশ্চর্য! এমন বিশাল প্রান্তর, একেবারে অ-কর্ষিত! শস্যের বিরাট সম্ভাবনা এমনিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

রহস্যময় হাসি অহল্যার মুখে। বলল, করুণা পায়নি। ফলবতী হতে গেলে কর্ষণ চাই, বলিষ্ঠ বীজ চাই আর সর্বোপরি চাই অফুরন্ত প্রেমবারির প্রবাহ।

স্বল্পকালের অবস্থিতির মধ্যেই প্রবাহিনী বুঝতে পারল, নিঃসঙ্গতা কীভাবে ধীরে ধীরে একটি নারীকে গ্রাস করে ফেলছে। তার প্রাণ প্রাচুর্যের মূল, জলশূন্য বিশুষ্কতার মধ্যে শুধুমাত্র কঙ্করের স্তূপকে আঁকড়ে ধরে আছে।

বিদায়ের আগের রাত্রি। দুই সখীর চোখে নিদ্রা নেই।

সহসা একটি প্রশ্ন তুলল প্রবাহিনী, আচ্ছা সখী, আমাদের সেই রথযাত্রার বিপর্যয়ের কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই।

সে দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রবাহিনী বলল, আমি সেদিন হতচেতন হয়েছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করার মতো সামর্থ্য ছিল না। আজ একটি কথা জানতে চাইব, সখীর কাছে অসংকোচে বলবে কি?

অহল্যা প্রবাহিনীর হাতে চাপ দিয়ে বলল, তোমার কাছে আমার না বলার কিছু নেই।

আমি যখন বিদায় নিয়ে চলে আসি তখন আমাদের উপকারী যে বন্ধুটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি কি তোমাকে সেই রাত্রেই আশ্রমে পৌঁছে দিয়েছিলেন, না তুমি গুহায় নিশিযাপন করেছিলে?

অহল্যা অসংকোচেই বলল, আশ্রমে ফিরে যাইনি সে রাতে। গুহায় নিশিযাপন করেছি, এ কথাও বলতে পারব না।

তবে কি তুমি মুক্ত আকাশের নীচে ঘুরে বেড়িয়েছিলে?

ঠিক তাই। সেদিনের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা আমি বলে বোঝাতে পারব না। তবু তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কিছু বলছি শোনো।

আমি সে রাতে ওই উপকারী বন্ধুটির সঙ্গে নিশি-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি উপযুক্ত গুহার সন্ধান দেবেন বলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুহার আশ্রয় কি পেয়েছিলে তুমি?

পেয়েছিলাম। তবে নিশীথের বেশির ভাগ সময়ই আমাদের কেটেছিল অপূর্ব এক তুষার প্রান্তরে পরিভ্রমণ করে।

আশ্চর্য!

অহল্যা বলল, আশ্চর্যই বটে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সে অলৌকিক তুষার প্রান্তরের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। সেই সুরম্য ভূমিকে দেবলোকও বলা যায়। সেখানে এক সরোবরে অপ্সরার দল সুরলোক থেকে স্নান করতে নেমে আসে।

তুমি কি সেখানে গুহার আশ্রয়ে নিশিযাপন করেছিলে?

করেছিলাম। তুষারে তৈরি সে গুহার শিল্প সৌন্দর্য তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি সেই বন্ধুর সঙ্গে কিছুক্ষণ সেই গুহাতে কাটিয়েছিলাম।

সত্যি, তোমার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না।

সাহস আমার নয় প্রবাহিনী। যিনি আমার কুমারীত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে সাহস জুগিয়েছিলেন, প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

প্রবাহিনী বলল, আমি তো সেদিন বজ্রের ভয়ংকর গর্জন শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। ওই মানুষটি সে সময় এলেন কোথা থেকে?

অহল্যা বলল, উনিই তো ওঁর বজ্রের আঘাতে জলের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তুমি তোমার সামনে দেখেছিলে ওই গড়িয়ে পড়া শিলাস্তূপ। এখন দেখবে, ওপরের পর্বতের সেই সঞ্চিত জলরাশি স্রোতস্বিনীর আকারে মানুষের কল্যাণের জন্য মর্তে বয়ে চলেছে।

প্রবাহিনীর কণ্ঠে বিস্ময়, সত্যই এক আশ্চর্য পুরুষ!

অহল্যা অমনি বলে উঠল, এই পুরুষই চিরদিন নারীর প্রার্থনীয়, প্রবাহিনী।

সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন করে প্রবাহিনী নীরবে বসে রইল।

অহল্যার আশ্রম ছেড়ে পরদিন প্রবাহিনী চলে গেল পিত্রালয়ে। আবার সেই নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরল অহল্যাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই আকাশের বুকে জমে উঠল আষাঢ়ের মেঘভার। দ্রিমি দ্রিমি বাজতে লাগল মেঘের মৃদঙ্গ। রোমাঞ্চিত হল কদম্ব তরু। মল্লিকা আর যূথীর সুবাসে আকুল হল অঙ্গন।

বিরহকে উজ্জীবিত করল বর্ষা।

এক ধারামুখর রাত্রিতে বজ্রধ্বনি হতে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল অহল্যার। বাতায়ন পথে দেখল, আকাশের বিদ্যুৎ চরাচরকে আলোকিত করে রেখেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু ধ্বনি।

সে শয্যার উপর উঠে বসল। বিপুল জলকল্লোল কানে ভেসে এল। তার মনে হল, নদী অনেক কাছে সরে এসেছে। সে যেন বয়ে চলেছে বাম থেকে দক্ষিণে।

ভোরের আলো ফুটল। মেঘ-ভাঙা রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অহল্যা পূজার ফুল তুলতে নেমে এল অঙ্গনে।

একমনে ফুল তুলছিল সে, হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি গৌতম। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী।

পলকমাত্র দৃষ্টি ফেলেই অহল্যা নত করল মুখ। সে পাদ্য-অর্ঘ্য সাজিয়ে আনার জন্য ত্বরায় প্রবেশ করল গৃহের অভ্যন্তরে।

বহিরঙ্গন থেকে ডাক দিয়ে বললেন গৌতম, অতিথিনিবাসে নিয়ে এসো তোমার উপচার। ওখানে শ্রান্ত অতিথি তোমার সেবার প্রতীক্ষায় রইল।

ঋষি গৌতম চলে গেলেন অতিথিনিবাসে। অহল্যা পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে নত নেত্রপাতে অতিথি ভবনের দিকে অগ্রসর হল।

পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, প্রথম দর্শনেই সে গৌতমের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখেছে। গৌতমের মুখে মৃদু হাস্য কখনও তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তপস্বীর গাম্ভীর্যে পূর্ণ তাঁর মুখ।

তবে কি সে একইরকম জটাজালে আবৃত অন্য কাউকে দেখেছে। হয়তো তাই, মুহূর্তমাত্র সসংকোচ দৃষ্টিপাতে সে তার স্বামীকে চিনে নিতে পারেনি।

অতিথি ভবনের সামনে এসে সে দাঁড়াল দ্বিধাকম্প্র পায়ে। তার সলজ্জ নত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অতিথির চরণে। না, চরণ দেখে চেনার কোনও উপায় নেই। সে কতটুকুই বা হৃদয়ের চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছে গৌতমকে। যে দৃষ্টিপাতে একজনকে চিরদিনের করে চেনা যায় সে দৃষ্টি তার কখনও ধেয়ে যায়নি গৌতমের দিকে।

অতিথির চরণ ধুইয়ে শুষ্ক বস্ত্রে মুছে নিয়ে অহল্যা আসন পেতে দিল। সামনে রাখল অর্ঘ্য-সম্ভার। তারপর গলবস্ত্র হয়ে করজোড়ে প্রণামের উদ্দেশ্যে নত হল!

একী! কে তার প্রণামে বাধা দিল। তার চম্পকের মতো দুটি হাত নিজের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করে তাকে টেনে তুলে নিল দেহলি প্রান্তে!

অহল্যার বিস্ময়ভরা চোখের পাপড়ি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল। স্বামীর এতখানি সোহাগ যে তার কল্পনার অতীত।

এ কাকে দেখছে সে। স্থির সরসীতে পূর্ণ চন্দ্রমার প্রতিচ্ছবির মতো অহল্যার স্থির দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এক পূর্ণ বীর্যবান পুরুষ।

অহল্যার মুখ উজ্জ্বল হাসিতে এবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পুরুষের মুখে কৌতুকের হাসি।

অহল্যা বলল, কোথায় লুকোলেন আপনার ছদ্মবেশ।

পুরুষ বললেন, তোমার উন্মুক্ত অতিথিশালার অভ্যন্তরে।

অহল্যা বলল, ছদ্মবেশ কি ওই আকৃতি প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে। ওই মনোহরণসস্মিত মুখ।

তুমি কি প্রথম দর্শনেই আমাকে চিনেছিলে প্রিয়দর্শিনী?

এক ঝলকে আমি শুধু আপনার ছদ্মবেশটুকুই দেখেছিলাম! তাতে স্বামীর আকৃতি ছিল কিন্তু প্রকৃতির ভিন্নতা আমাকে সংশয়ের দোলায় দুলিয়ে দিয়েছিল।

ইন্দ্র বললেন, আমি ঋষি গৌতমকে দূর থেকে দেখেছি, মানসের জলে অবগাহন করতে। ঋষিরা দাঁড়িয়ে আছেন তীরে। স্নান-সমাপনান্তে জিতেন্দ্রিয় উর্ধ্বরেতা যোগীর অভিধা লাভ করবেন তিনি।৮

অহল্যা প্রশ্ন করল, ওই অভিধা লাভ করলে কী হয়?

ঋষিপত্নী হয়ে তাও জানো না? ওই উর্ধ্বরেতা যোগীর অসাধারণ ক্ষমতা জন্মে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তাঁর করতলগত।

অহল্যা মধুর পরিহাস উজাড় করে দিয়ে বলল, স্বর্গ হাতছাড়া হলে আপনি গৃহহীন হয়ে পড়বেন, তাই বুঝি এ আশ্রমে থাকার অগ্রিম আবেদন নিয়ে এসেছেন?

ঠিক তাই, তবে আর একটি প্রার্থনা আছে।

কী সে প্রার্থনা?

আশ্রম-লক্ষ্মীকে এখানেই অবিচল থাকতে হবে।

অহল্যা বলল, সে ভেবে দেখা যাবে, আগে তো স্বর্গ হস্তচ্যুত হোক।

অতিথি সৎকারের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করল অহল্যা। আজ বহুদিন পরে প্রাণের মানুষটিকে কাছে পেয়ে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সেবা উজাড় করে দিল অতিথির উদ্দেশে! বর্ষণ মুখরিত রাত্রি নিদ্রাহীন কাটল দু'জনার অতিথি নিবাসে।

ইন্দ্র বললেন, প্রিয়বাদিনী, তোমার জন্য পারিজাতের একটি স্ফুটনোন্মুখ কলিকা এনেছি, তুমি একে তোমার কেশে ধারণ করো। দিনে দিনে ওই পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলবে ওর প্রস্ফুটন ক্রিয়া।

সেই স্মৃতির স্বপ্নে ভরা মায়াময় পরিবেশে একদিন যেমন করে আমার কেশে পরিয়ে দিয়েছিলেন কুসুম, তেমনই আজ পরিয়ে দিন নিজের হাতে এই পারিজাত।

সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘরে সহসা জ্বলে উঠল একটি দীপ। দীপ হস্তে অহল্যা দাঁড়াল লীলায়িত ভঙ্গিতে। তার কেশচূড়ায় ইন্দ্র পরিয়ে দিলেন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ কুসুম, পারিজাত।

ইন্দ্রের চরণ প্রান্তে প্রদীপ রেখে নতজানু হয়ে বলল অহল্যা, পুরুষোত্তম, ধন্য হয়েছি আমি আপনার দানে। এর সৌরভ চিরদিন আমাদের স্মৃতিকে সুরভিত করুক, এই কামনা।

তৃতীয় রজনীতে স্বপ্নের স্বর্গলোক নেমে এল ধূলার ধরণীর বুকে। পূর্ব দিগন্তে মেঘের কোলে ফুটে উঠল চন্দ্রালোকের মহিমা। নিবিড় হল ইন্দ্রের কামনাকাতর বাহুবন্ধন।

নিশিশেষে ওরা এসে দাঁড়াল সিক্ত চরণে কদম্ব বীথিকার তলায়।

অতি কোমল সুরভিতে মন্থর বাতাস।

অহল্যা ইন্দ্রের বুকে মাথা রেখে বলল, আমি স্বর্গের অফুরন্ত সুখ চাই না প্রিয়তম। মর্তের অনন্ত ব্যথার পারাবারও নিঃশব্দে মুখ বুজে পার হতে চাই না আমি। সুখ দুঃখ, ভোগ ভালবাসা, কর্ম ও ধ্যান আমাকে পরিপূর্ণ এক নারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুক, এই আমার অভিলাষ।

ইন্দ্র বলল, কোনওদিন কি সতীত্বের তাড়নায় আমাদের এই ক্ষণ-মিলন তোমার কাছে গ্লানিময় মনে হবে না প্রিয়তমা?

স্থিরচিত্তে স্বেচ্ছায় আমি যা করেছি, তাকে কোনও অনুতাপ কোনওদিনই স্পর্শ করতে পারবে না। নারীত্বের অবমাননা যেখানে, অহল্যা সেখানে চির বিদ্রোহিনী। যোগ্য পুরুষের স্পর্শে বঞ্চিত নারীর বেদনাকে মুক্তি দিতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি প্রিয়তম।

এক মায়াময় সোনালি স্বপ্ন ছড়িয়ে মেঘের ফাঁকে সবিতার আবির্ভাব হল। ইন্দ্র অহল্যার হাত ধরে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

অহল্যা প্রিয়তম পুরুষের হাতে হাত রেখে সামনে এগিয়ে চলল।

আশ্রমের অতিথি ভবন পেরিয়ে, উদ্যান বীথিকার ভেতর দিয়ে তারা এসে পৌঁছোল মূল কুটিরের সামনে।

ইন্দ্র বললেন, এই কুটিরের দক্ষিণে সেই অনুর্বর বন্ধ্যা ভূমি, তাই না কল্যাণী?

সঠিক অনুমান প্রিয়তম।

ইন্দ্র বললেন, চলো সেখানে, প্রকৃতির অনন্ত লীলার আর এক মহিমা প্রত্যক্ষ করি।

উভয়ে এসে দাঁড়ালেন সেই প্রান্তরের প্রান্তে।

নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অহল্যা। উষর বন্ধ্যা ভূমির বুকের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সৃষ্টির আনন্দে মত্ত অমৃতধারা।

একসময় অহল্যার দৃষ্টি ফিরে এসে স্থির হল ইন্দ্রের মুখের ওপর।

এ তোমারই করুণার দান প্রিয়তম।

পরিতৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হল ইন্দ্রের মুখ। বললেন, একটি পাষাণের স্তূপ শতদ্রুর জলগমনের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। আমি সেই বাধাটিকে অপসারিত করেছি মাত্র। সৃষ্টির প্রাণপ্রবাহিনী তার স্বভাব ধর্মে নিম্নমুখী। আপন গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে।

অহল্যার পলকহীন দৃষ্টির মুগ্ধতা ইন্দ্রের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের একটি পুরুষকে খুঁজতে লাগল।

সাধনলোক থেকে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন ঋষি গৌতম। তপস্যার তেজে প্রদীপ্ত তাঁর তনু। সুকঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রত অন্তে ফিরে এলেন তিনি।

অহল্যা দেখল, সাধনার শক্তিতে আরও অহংকৃত হয়েছেন ঋষি।

ব্রত উদযাপনের পর প্রথম সহবাস রজনীতে ঋষি গৌতম বললেন, নিরর্থক সহবাস, চিত্তবিক্ষেপমাত্র। সন্তান উৎপাদন ও সুচারুভাবে গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্যই বিবাহ। সহবাস স্বামী-স্ত্রীর পুত্র উৎপাদনকে নিশ্চিত করে। তাই সহবাসকালে নিরন্তর সন্তান সৃষ্টির কথাই চিন্তা করতে হয়। সম্ভোগের চাঞ্চল্য শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ।

অহল্যা বলল, কেবলমাত্র আপনার ন্যায় ঊর্ধ্বরেতা পুরুষই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

গৌতম অহল্যার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপকে স্তুতি বলে ধরে নিয়ে তৃপ্ত হলেন।

অন্য এক রাতে সুরতলীলার পূর্বে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করে গৌতম বললেন, কোথা থেকে ভেসে আসে পুষ্প সুবাস?

অহল্যা বলল, আমার কেশপাশে গ্রথিত পুষ্প থেকে।

বিস্মিত গৌতম বললেন, কোথা থেকে পেলে ও পুষ্প? এ তো মর্ত্যের উদ্যানজাত কোনও পুষ্প নয়।

অহল্যা সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আপনার অনুমান যথার্থ ঋষিবর। এ পুষ্প, পারিজাত। স্বর্গের কানন থেকে চয়ন করে দেবরাজ আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন।

ক্রোধে কম্পিত হল গৌতমের তনু। অন্ধকারেও অহল্যা উপলব্ধি করল, গৌতম প্রজ্বলিত এক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসে রয়েছেন।

কতক্ষণ পরে কক্ষ প্রকম্পিত করে গৌতম উচ্চারণ করলেন, ভ্রষ্টা, সৈরিণী, হীন চরিত্রা, কামজর্জর পুরুষের অঙ্কশায়িনী নারী!

হ্যাঁ মহাত্মন, একমাত্র সেই পুরুষই আমার নারীধর্মকে রক্ষা করেছেন। আমার প্রতি মুহূর্তের অবমাননার যন্ত্রণা থেকে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

গৌতম অন্ধকারেই উঠে দাঁড়ালেন। গৃহত্যাগের পূর্বে বললেন, যে সম্ভোগে সামাজিক অনুশাসন নেই, সংযম নেই, তা পশ্বাচার।

অহল্যা বলল, সবই সত্য ঋষি। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দিয়েছেন প্রবৃত্তি। দেহ মনের এই প্রবৃত্তি চায় তার সহজ স্বাভাবিক বিকাশের পথ। স্রোতস্বিনীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হলেই সে দুকূল প্লাবিনী হয়ে ওঠে।

গৌতম সেই নিশীথেই পত্নী, আশ্রম উভয়কে পশ্চাতে ফেলে সত্যের সন্ধানে বহির্গত হলেন।

পঞ্চবর্ষ আত্মানুসন্ধানের পর একদিন ঋষি গৌতম আশ্রমের পথে ফিরলেন। তিনি দেখলেন, অনুর্বর ভূমি স্রোতবাহিত পলিমৃত্তিকার সঞ্চয়ে উর্বর হয়ে উঠেছে। স্থানে স্থানে জেগে উঠেছে সবুজ, শ্যামল, দৃষ্টিনন্দন লতাগুল্ম।

পরিতৃপ্ত গৌতম স্রোতস্বিনীর সুশীতল বারিতে অবগাহন করলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করেই তিনি দেখলেন, কুটিরের সম্মুখে স্বর্গীয় এক চিত্র। জননী তাঁর সন্তানকে নিয়ে মমতাময়ীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

গৌতম অগ্রসর হলেন। জননীর পরিশুদ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অহল্যা।

প্রথম বাক্য উচ্চারিত হল গৌতমের মুখে, এই অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রটি কোন ভাগ্যবানের?

অহল্যা উত্তর দিল, সৃষ্টিকর্তার।

কী নাম রেখেছ কুমারের?

শতানন্দ।

গভীর আবেগে অহল্যা আর শতানন্দকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন মহাত্মা গৌতম।

অহল্যা

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।।

—রামায়ণ

[আপন অন্তরে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে অহল্যা সুরশ্রেষ্ঠ শচীপতিকে বললেন, হে সুরপতি, আমি আপনার সঙ্গে মিলনে কৃতার্থ হয়েছি। আপনি অতি সত্বর এ স্থান ত্যাগ করে চলে যান]

[কাব্যের উপেক্ষিতা]—রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গ কথা

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যা-কাহিনীর একটি নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক পরম রমণীয়া নারী সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্র মোহিত হলেন সে নারীর যৌবন-সুষমায়। তিনি জানতে চাইলেন, সৃষ্টিকর্তা এই অনিন্দনীয়াকে কার হাতে অর্পণ করতে চান। ব্রহ্মা গৌতমকে জিতেন্দ্রিয় জেনে তাঁর করেই কন্যা সম্প্রদান করতে চাইলেন। আশাহত ইন্দ্র প্রস্থান করলেন সুরলোকে।

অহল্যার দ্বিতীয় কাহিনী সর্বজনবিদিত; যদিও বাল্মীকির রামায়ণে কোথাও অহল্যার পাষাণমূর্তি ধারণের কথা নেই।

স্বইচ্ছায় অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতমের আশ্রমে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ রূপে বরণ করলেন।

এরপর অভিশাপ পর্ব। বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের বহু বর্ষ পরে গৌতমের তপোবনে আগমন। অহল্যার শাপমোচন।

সামাজিক বিচারে অহল্যা অপরাধিনী নারীরূপে গৃহীতা। কিন্তু অহল্যাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতার বলে অভিশপ্ত করলে যথার্থ ন্যায়ানুমোদিত বিচার হয় না। অহল্যার এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। কে বলবে, ব্রহ্মার সান্নিধ্যে ইন্দ্রকে প্রথম দর্শন করে অহল্যার মনে আবেগমথিত পূর্বরাগের সূত্রপাত হয়নি।

সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিই হয়তো তাঁকে সজ্ঞানে সুরপতিকে গ্রহণ করার শক্তি জুগিয়েছে।

আমরা যুগ যুগ ধরে অহল্যা সম্বন্ধে রামায়ণের কবির বক্তব্যই শুধু শুনে এসেছি, কিন্তু তার বিপরীতে আত্মপক্ষ সমর্থনে অহল্যারও যে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে তা একবারও ভেবে দেখিনি।

[সৃষ্টির দেবতা মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, আর প্রণতা রক্তিমবসনা এক কন্যা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।]

ব্রহ্মা :

সৃষ্টির আদিম উষা জাগো জাগো কায়া মূর্তিমতী
জাগো আজ নারীরূপা সুলক্ষণা পরমা ভাস্বতী,
নিশীথের স্বপ্ন তন্তু ছিন্ন করে অনন্য বৈভবে
এসো তুমি জ্যোতির্ময়ী, ত্রিলোকের উচ্চারিত স্তবে
পূর্ণ হোক অভিষেক, তূর্ণ এসো ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা
কামনার সরোবরে শতদল পদ্ম আকাঙ্ক্ষিতা,
বর্ণ গন্ধ মধুস্বাদ; অহল্যা তোমার শুভ নাম।

অহল্যা :

কী আশ্চর্য অনুভব, আমি নারী! ললিত সুঠাম
অঙ্গে অঙ্গে যন্ত্রণার কী প্রার্থিত আবর্ত-বলয়
আমারে রেখেছে ঘিরে, আমি এক কলি কুবলয়
প্রার্থিতের করপুটে উৎসর্গের আছি অপেক্ষায়,
কম্পিত আনন্দ আজ তনুদেহে বেদনা বিছায়।

[ইন্দ্রের আগমন]

ইন্দ্র :

এ কী অপরূপ কান্তি, হৃদয়ের সমস্ত কামনা
কায়ারূপ ধরে ওই নারীমূর্তি করেছে রচনা,
কী পরম আকাঙ্ক্ষিতা, সর্ব দেহ কাঁপে থরোথর,
এ নারী পুরুষ দেহে নিক্ষেপিত তীক্ষ্ণ পুষ্পশর।

অহল্যা :

কী অভিলষিত এই কান্তিমান পুরুষ প্রধান,
কেন কাঁপে দেহমন, কী আস্বাদ, কীসের আঘ্রাণ
আমারে পীড়িত করে, মনে হয় আমি সমর্পিতা।

ইন্দ্র :

পিতামহ, এই নারী ত্রিলোকের একান্ত বাঞ্ছিতা,
সৃষ্টির মন্থনসার, কামনার হোম বহ্নিশিখা
বলো স্রষ্টা, কার ভালে এই কন্যা দেবে জয়টীকা?

ব্রহ্মা :

সংযমের বাঁধনে যে ইন্দ্রিয়ে বেঁধেছে দৃঢ় পাশে,
কামিনী কাঞ্চন যার চিত্তের প্রাকার থেকে আসে

বারবার ফিরে ফিরে, অনাদরে, কুণ্ঠিত লজ্জায়,
যাগ যজ্ঞ নিত্য জ্বালে দীপ্ত দীপ যার তপস্যায়,
সেই তপঃসিদ্ধ ঋষি গৌতমের সকল কর্মের
এ নারী সঙ্গিনী হবে, ধর্ম আর নিভৃত মর্মের।

[ইন্দ্র আশাহত দৃষ্টি মেলে তাকালেন অহল্যার দিকে। তারপর ব্রহ্মাকে নমস্কার করে ধীরে ধীরে অপসৃত হলেন।]

অহল্যা :

কেন, কেন, কেন এই আশাহত রূঢ় নির্বাসন
কেন জাগে ভীরু চিত্তে বারবার তরঙ্গ-কম্পন,
মনে হয় ওই মূর্তি একান্তই আমার আমার,
অন্য কারও নয় আমি; কিন্তু একী যন্ত্রণা দুর্বার
আমায় পীড়ন করে; হৃৎপিণ্ড ছিন্ন শতদল
পবিত্র পূজার অর্ঘ্যে এই পদ্ম একান্ত নিষ্ফল।
ওই দৃষ্টি, ওই বাণী আকাশের দিয়েছে ইশারা,
ইচ্ছার বিরুদ্ধ দুর্গে বন্দি পাখি কেঁদে হই সারা;
প্রথম প্রভাত লগ্নে পূর্বাশায় রক্তরাগ লেখা
যে শিল্পী দেখাল হায়, এ জীবনে শেষ হল দেখা
তার সঙ্গে; জানি জানি কোনওদিন কোনও সহবাস
এমন আলোর রঙে রাঙাবে না আমার আকাশ।

[পট পরিবর্তিত হল। অহল্যা বধুবেশে তপোবনে পুষ্পচয়নের চেষ্টা করছেন। গৌতমবেশী ইন্দ্র এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।]

ছদ্মবেশী ইন্দ্র :

হেমন্তে শিশির স্পর্শে পুষ্পেরা খসেছে মৃত্তিকায়
ঊর্ধ্ব শাখে দু'-চারিটি কোনওমতে জাগে প্রতীক্ষায়,
শ্রমে সিক্ত তনুদেহ, সফল কি হবে ও প্রয়াস?
যদি অনুমতি করো সাজিখানি ভরে দেবে দাস।

অহল্যা :

অপরাধ কী করেছি, প্রভু আজ একী আচরণ,
বিলম্ব হয়েছে বুঝি? প্রাতঃস্নান হল সমাপন?

ছদ্মবেশী ইন্দ্র .

বিলম্ব হয়েছে কিনা, এ কথার কী দেব উত্তর,
কত পল অনুপল পার হল যুগ যুগান্তর!
প্রতীক্ষা প্রদীপ শিখা, ঊর্ধ্বমুখী নিত্য জাগরণ
আশার পতঙ্গগুলি তারে ঘিরে নাচে সারাক্ষণ;
কিন্তু হায় একে একে অনিবার্য মৃত্যুর বিধানে
ঢলে পড়ে শূন্যতায়, হতাশার রিক্ত শর হানে।

যন্ত্রণাবিক্ষত দেহ, আশাহীন দুর্ভর জীবন
তবু তার আসা-পথে প্রতীক্ষিত আমার নয়ন।

স্নান সমাপন কিনা, এ তোমার আর এক জিজ্ঞাসা,
প্রেমের অমৃত নীরে ঘোচে কভু স্নানের পিপাসা?
যেদিন প্রথম ঢেউ উঠেছিল ও আঁখি সাগরে
সেদিন করেছি স্নান পরিপূর্ণ তনু মন ভরে;
তারপর তপ্ত দেহে খুঁজেছি অমৃত সরোবর
কোথা চিহ্ন অমৃতের, জ্বালাময়ী বালুকা প্রান্তর,
আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে কী দুঃসহ অগ্নির প্রবাহ
মেলেছে সহস্র জিহ্বা, সর্বভুক কামনার দাহ।
ভিক্ষা মাগে চিরদাস, প্রণয়ের অজস্র বর্ষণ
নামুক তৃষিত চিত্তে, করো দেবী অগ্নি নির্বাপণ।

অহল্যা :

মেঘের সজল অঙ্গে কামনার প্রদীপ্ত অশনি
ঢাকা থাকে চিরদিন, মাঝে মাঝে গুরু গুরু ধ্বনি
জেগে ওঠে মর্মকোষে, তারপর বিদ্যুৎ দহনে
দীর্ণ হয় হৃৎপিণ্ড, অমনই সে গভীর নিঃস্বনে
নিজেকে প্রকাশ করে; সমুদ্যত সেই গুরুভার
কে আর বহন করে, বজ্রপাণি সে অস্ত্র তোমার।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র :

চিনেছ আমারে তুমি, হে আমার স্বপ্নের সঙ্গিনী!

অহল্যা :

রক্তে যার লাগে দোলা, তারে আমি চিনি বন্ধু চিনি।
অরণ্যের পত্রবাসে নিজেকে গোপন করে ফুল
বায়ুর তরঙ্গে কিন্তু দোলে তার গন্ধের দুকূল;
চিনি বন্ধু চিনি আমি তোমার ও দেহের আঘ্রাণ
চিরদিন জেনো সখা ওই ঘ্রাণে সমর্পিত প্রাণ।

[একট পুষ্প চয়ন করে ইন্দ্র অহল্যার কবরীতে পরিয়ে দিলেন।]

ইন্দ্র :

এ পুষ্প পূজার নয়, এ কুসুম আর্তের কামনা
এর বর্ণ গন্ধ কায়া প্রণয়ের প্রমূর্ত এষণা,
এ আমার লিপি লেখা, বাণীমূর্তি গোপন মনের
একান্ত অর্পিত অর্ঘ্য অভিজ্ঞান প্রিয় স্মরণের।

অহল্যা :

কী দেব তোমারে সখা বিনিময়ে কিছু নেই আর।

ইন্দ্র :

আমার প্রার্থিত রত্ন পূর্ণ আছে হৃদয়ে তোমার;
যে স্মৃতি খোদিত ওই বক্ষমাঝে রক্তিম ফলকে,
সেই শিলালেখখানি আমি যে দেখেছি অপলকে;
সেখানে রৌদ্রের খেলা, কখনও বা মেঘের আঁধার
ওই আলোছায়া লীলা, সে আমার একান্ত আমার।
বিরহ প্রেমের কন্যা, বিরহ সে বিচিত্র রূপিণী
বেদনার বন্ধনেতে জননী সে সুখ-প্রসবিনী;
সেই দুঃখ জাত সুখে তুমি আমি এক অংশীদার,
কন্টক সংলগ্ন পুষ্পে পান করি এসো সুধা সার।

অহল্যা :

এসো তবে এসো বন্ধু, মুছে যাক মিথ্যা এ সংসার,
জয় হোক অন্তরের, প্রিয়তম একান্ত দুর্বার
শক্তিতে জাগ্রত হও, করো আজ সমস্ত লুণ্ঠন
দস্যুতার দুই করে আমার সর্বস্ব সমর্পণ।

[গৌতমের সহসা আগমন। ইন্দ্রকে কুটির থেকে নির্গত হতে দেখে প্রদীপ্ত হল ঋষির নয়ন।]

গৌতম :

আশ্রমে অনার্য লীলা, সংযমের একী পরাভব!
পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে মৃত্যুরূপী মোহের বৈভব;
তপস্যার পূত তীর্থে কামনার কলঙ্কিত ছায়া
ধরেছে আশ্চর্য মূর্তি; সঙ্গে তার সর্বগ্রাসী মায়া
লীলা-রস-মত্ততায় নরকের উৎসব সৃজন
করেছে বিপুল লাস্যে, কল্যাণের চির নির্বাসন।

দেবতার প্রতিনিধি, দেবত্বের স্বর্ণ ধ্বজাধারী
তোমার সকল শক্তি নিল কেড়ে ওই ভ্রষ্টা নারী;
হলে তুমি শক্তিহীন, হীনবীর্য, আজ অভিশাপ
দিলাম তোমারে ইন্দ্র, পুরুষের সকল প্রতাপ
তোমাতে নিষ্ফল হবে, কামনার স্বভাব-প্রয়াস
হবে না সফল জেনো, আজ হতে পুরুষত্ব নাশ।

আর ওই ধর্মভ্রষ্টা রমণীর রূপের গৌরব
চির অস্তমিত হবে, নারীত্বের সকল সৌরভ
লুপ্ত হবে ওই অঙ্গে, সবার অলক্ষ্যলোকে ওর
হবে মৌন অবস্থান, রবে আত্ম চিন্তায় বিভোর।

[কিছুক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করে]
দীর্ঘকাল যাবে কেটে, তারপর দূর্বাদলশ্যাম
সর্ব পাপ তাপহারী কল্যাণের প্রতিমূর্তি রাম
আমার এ তপোবনে করে শুভ পূণ্য পদার্পণ
মুক্তি দেবে পাপ থেকে, এ নারীর আত্ম-উদ্বোধন
সেদিন সম্ভব হবে; ভ্রষ্ট আত্মা যাও ক্ষিপ্রগতি
দৃষ্টি থেকে বহুদূরে, সরে যাও স্খলিত দুর্মতি।

[বহুবর্ষ পরে বিশ্বামিত্রসহ শ্রীরামের গৌতম পরিত্যক্ত তপোবনে প্রবেশ। রামচন্দ্রের আগমনে জ্যোতির্ময়ী এক আলোকসত্তার কায়ারূপ ধারণ।]

রাম :

কে ওই আশ্চর্য নারী ছিল কোন অন্তরাল লোকে
এইমাত্র আবির্ভূত আমাদের দৃষ্টির আলোকে!

বিশ্বামিত্র :

মহর্ষি গৌতম জায়া, ইন্দ্রে সমর্পিত তনুমন,
পতির জাগ্রত ক্রোধে শাপগ্রস্ত হল সেকারণ;
সবার অলক্ষ্যলোকে এতকাল আত্মমগ্ন থাকি
পাপের প্রহরগুলি পরিতাপে কাটাল একাকী;
তুমি এসে তপোবনে অহল্যার মুক্তি দিলে রাম।

অহল্যা :

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নাও আজ আমার প্রণাম।
আত্মচিন্তা রত হয়ে কেটে গেল সুদীর্ঘ প্রহর
সত্যের যথার্থ স্পর্শে চেতনারা হয়েছে প্রখর,
সংস্কারের যুক্তিজালে সত্যের স্বরূপ আছে ঢাকা
চিন্তার বিশুদ্ধ পটে আছে তার স্পষ্ট চিত্র আঁকা,
মিথ্যার মোহন স্বর্গে সত্যের পেতেছে সিংহাসন
সমাজের কুলপতি; আজ আমি সেই মোহাঞ্জন
মুছে ফেলে অনাবৃত করেছি সত্যের উজ্জ্বলতা।

বিশ্বামিত্র :

বলো মহীয়সী নারী কী সে সত্য যার অভিজ্ঞতা
তোমার অন্তরলোক করেছে অপূর্ব উদ্ভাসিত?

অহল্যা :

ইন্দ্র আজও প্রিয়তম, সেই সত্যে রয়েছি সংস্থিত;
দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণে পেয়েছি যে সত্যের আলোক
তারই দীপ্ত বিভা স্পর্শে দূর হয়ে গেছে মিথ্যা শোক;
আমার যৌবন পুষ্পে ইন্দ্র সে যথার্থ মধুকর।

বিশ্বামিত্র :

স্তব্ধ হোক মূঢ় নারী তোমার ও অনৃত অধর।
অগ্নির সম্মুখে তুমি যেই হস্ত করেছ গ্রহণ
জন্ম জন্মান্তরে জেনো মিথ্যা নয় কভু সে বন্ধন;
উন্মাদ যৌবন শক্তি যদি করে বিরুদ্ধ আচার
সত্যের শাণিত খড়্গে হবে তার নির্মম বিচার;
কামনার ক্লেদপঙ্কে তুমি নারী পূর্ণ নিমজ্জিতা।

অহল্যা :

তোমার ও রূঢ় বাক্যে নহি আমি সামান্য লজ্জিতা;
পঙ্ক থেকে জাগে পদ্ম, কখনও কি পদ্মের সুবাসে
বলো প্রাজ্ঞ মুনিবর পঙ্কের ক্লেদাক্ত গন্ধ ভাসে?
তবু সত্য বলে জানি ওই পঙ্ক পদ্মের জননী
কামনার স্তূপে জাগে পঙ্কজের শুভ আগমনী;
দেবতার চরণেতে পঙ্ক-কন্যা শ্রেষ্ঠ উপচার,
বলো ঋষি সেই পদ্মে কোন জন দিয়েছে ধিক্কার?
আমার কামনা পঙ্কে জেগেছে সহস্রদল মন
সেই বর্ণ গন্ধময় শতদল করেছি অর্পণ
একান্ত বাঞ্ছিত জনে, আমি তৃপ্ত এই আত্মদানে।

রাম :

ব্যভিচারী চিত্ত ধায় চিরদিন নরকের টানে;
যে মন শতধা ভগ্ন, শতমুখে রাখে তার গতি
সেই নিষ্ঠাহীন মন কোনও কালে পায় না সদ্গতি;
চিত্ত জেনো অবিভাজ্য, একনিষ্ঠ, একমুখী স্থির।

অহল্যা :

সত্য নয় রামচন্দ্র, চিরদিন হৃদয় অস্থির;
বহুরূপে এই মন নিত্য করে বিচিত্র বিলাস
কখনও সে জায়ারূপে পুরুষের মাগে সহবাস
কখনও বা সন্তানের শিরে ঢালে স্নেহের অমিয়,
কী বিচিত্র এই মন, অপরূপ, চারু রমণীয়।

রাম :

কিন্তু এই ব্যভিচার, কী করে এড়াবে অপরাধ?

অহল্যা :

অনভিজ্ঞ রামচন্দ্র প্রকৃতির রাখো না সংবাদ!
পুষ্পে পুষ্পে মধুকর পরাগের করেছে মিশ্রণ
কিন্তু ব্যভিচারী বলে কে দিয়েছে পুষ্পে বিসর্জন?
একই পুষ্প দেবতার কখনও বা পূজা উপচার
সেই পুষ্প দয়িতার আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠলগ্ন হার।

বিশ্বামিত্র :

একান্তই দেহবাদী, তুমি নারী দেহের আশ্রয়ে
বেঁধেছ তোমার মন, কলুষিত কামনার দহে
আকণ্ঠ ডুবেছ আজ, এই দেহ জেনো সত্য নয়।

অহল্যা :

শোনো ঋষি, এই উক্তি জীবনের পরম বিস্ময়।
পাত্র ছাড়া পদার্থের আশ্রয় কে দেবে তুমি বলো,
দেহের আধার ছাড়া প্রাণ মন সকলই বিফল;
এই দেহ জেনো ঋষি জীবনের পরমার্থ ধন,
কর্দমের পিণ্ড ছাড়া কখনও কি প্রতিমা গঠন
হয়েছে সম্ভব বলো? দেহ হল চিত্তের আধার
দেহকে বিযুক্ত করে সর্ব চিন্তা একান্ত অসার।
শোনো ঋষি যেই স্তন সন্তানের অমূল্য-জীবন
সেই বস্তু দেখো চেয়ে পুরুষের কামনার ধন;
একই দেহে জননী যে, সেই দেহে জায়া ও দুহিতা,
দেহবাদ সত্য জেনো, জীবনের অমূল্য সংহিতা।

রাম :

যে মন চঞ্চল হয়, তার মাঝে কোনও শান্তি নাই
অস্থির চিত্তের মাঝে স্থিতির আনন্দ কোথা পাই?
তাই চিন্তাবিদ করে চিত্তের বিক্ষোভে পরিহার
স্থিত-চিত্ত পায় জেনো জীবনের অমূল্য সম্ভার।

অহল্যা :

স্থিতি আর গতিশক্তি একই বস্তুপিণ্ডে বর্তমান
বস্তুকে বিভক্ত করে পেতে হয় তাহার প্রমাণ;
রাত্রির প্রসন্ন শান্তি আমাদের চিত্তে করে স্থির,
প্রভাতের কর্মযজ্ঞে চিরদিন আমরা অস্থির;
দুই সত্য একই অঙ্গে, কর্মান্তরে ধরে ভিন্ন রূপ
সংস্কারে অজ্ঞান যারা অর্থ করে একান্ত বিরূপ;
স্থিতির মাঝেই গতি এই সত্য জানি মনে মনে
অগ্নি থাকে স্ব-স্বভাবে প্রবাহিত বায়ুর তাড়নে;
কামনার যে আক্ষেপ চিত্তে করে উদ্বেল আকুল
আছে তার সত্য মূল্য, জেনো তাহা স্থিতি অনুকূল।
আবদ্ধ যে সরোবর, নিস্তরঙ্গ তার স্থির নীরে
ক্লেদের মালিন্য জমে, স্রোতহীন জলের গভীরে
পঙ্কের সঞ্চয় বাড়ে; অন্যদিকে চঞ্চল তটিনী
অঞ্চল দুলায়ে তার ক্ষিপ্র গতি সহাস্য নটিনী
বয়ে চলে নৃত্য রসে, কোনওদিন জেনো অঙ্গে তার
থাকে না গ্লানির স্পর্শ, মালিন্যের হয় না সঞ্চার।

বিশ্বামিত্র :

চিত্তের বিভ্রান্তি আসে ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বিলাসে
সেই চিত্ত শান্ত হয় সংযমের দৃঢ় বল্‌গাপাশে,
ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে কামনার শতমুখী তির
প্রশান্ত চিত্তেরে জেনো করে তোলে অশান্ত অস্থির।

অহল্যা :

ইন্দ্রিয়কে নমস্কার, সে জীবের প্রাণের সরণী
সেই পথে শোনা যায় জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি;
আঁখির প্রসাদে পাই বিধাতার বর্ণের বৈভব,
সুরের তরঙ্গ রচে শ্রবণেতে মহা মহোৎসব,
আঘ্রাণের পথ বেয়ে আসে নিত্য আনন্দ কম্পন,
রসনায় কী বিচিত্র আকাঙ্ক্ষিত রস আস্বাদন,
স্পর্শ আনে সর্বদেহে রোমাঞ্চিত কদম্ব-বিকাশ,
ইন্দ্রিয়ে উপেক্ষা করে পূর্ণ হবে কোন অভিলাষ?

ঈশ্বর মহান শিল্পী রূপ রস গন্ধ স্পর্শ গানে
পূর্ণ করে এ পৃথিবী নিরন্তর আকুল আহ্বানে
ডাকেন রসিকজনে; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মুক্ত দ্বারে
রসমগ্ন যে মানুষ বিধাতার সৃষ্টির সম্ভারে
করে আনে আমন্ত্রণ, একমাত্র ঈশ্বরে সম্মান
দেখায় সে রসগ্রাহী, কিন্তু তাঁকে করে অপমান
ইন্দ্রিয় নিরোধকারী মুষ্টিমেয় তাপসবিগ্রহ,
আত্মার মুক্তির যজ্ঞে করে তারা আত্মার নিগ্রহ।

রামচন্দ্র :

ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুপুঞ্জে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত করে মন
তাই এ বিশাল বিশ্বে না পাওয়ার আকুল ক্রন্দন,
সর্ব চিন্তা ঈশ্বরের অভিমুখে প্রদীপ্ত শিখায়
যে জন জাগ্রত রাখে, কোনও ক্ষোভ কোনও যন্ত্রণায়
পীড়িত হয় না তার বস্তু-সীমা-মুক্ত শুদ্ধ মন,
একক ঈশ্বরে তার চিত্ত করে নিত্য আবর্তন।

অহল্যা :

অতি ক্ষুদ্র পরমাণু তার মাঝে ঈশ্বর-প্রকাশ,
নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা চেয়ে দেখো সেও করে বাস
সামান্য তৃণের ফুলে; এ বন্ধনে মুক্তির আস্বাদ
এখানে আনন্দ যজ্ঞে দূর হয় সর্ব নেতিবাদ।

ভূমি থেকে ভূমালোক, সর্বত্র যে বস্তুর বিস্তার
ইন্দ্রিয়ের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয় তার মণিহার,
সে হারের দুই প্রান্তে আনন্দ ও বেদনা-কম্পন
সংযুক্ত সে মাল্যখানি চিত্তে আনে নিত্য শিহরন;
এই বস্তুকণা-মুক্ত কোন নব কল্পিত ঈশ্বর
বলো প্রিয় রামচন্দ্র, পূর্ণ করে দেবে এ অন্তর?

তুমি যে ঈশ্বর বলো, আমি তাঁরে দেখেছি আলোকে
দেখেছি আঁধার রাতে, সুখে দুঃখে সান্ত্বনায় শোকে,
কখনও সন্তানমূর্তি, কখনও বা জননীর স্নেহ,
প্রগল্‌ভ প্রেমের স্বপ্নে নিত্য তাঁর মোহমগ্ন দেহ
পড়েছে আমার চোখে; আমি জানি তাঁর সর্ব ভাব
বৈচিত্র্যের আলোড়নে জড় থেকে বিমুক্ত স্বভাব।

রামচন্দ্র :

মোহতে আনে না মুক্তি, অতৃপ্তির জ্বলন্ত অঙ্গার
শান্ত শুদ্ধ স্বভাবেরে দগ্ধ করে বিকৃত সংহার
নিত্য করে অনুষ্ঠান; মোহগ্রস্ত মানুষের মন
মুগ্ধতার ছলনায়, করে মিথ্যালোকে সঞ্চরণ।

অহল্যা :

পাখি ওড়ে ডানা মেলে নীলকান্ত আকাশের কোলে
সোনালী সূর্যের দীপ্ত উত্তরীয় অঙ্গে তার দোলে,
কী মোহন আলপনা বাতাসের বুকে এঁকে যায়,
তুমি কি দেখোনি রাম, সেই চিত্র পরম তৃষ্ণায়?
কখনও কি ওই মুখে বলোনি, মধুর আহা, আহা,
হওনি কখনও মুগ্ধ তারে দেখে চারিদিকে যাহা
একান্ত আনন্দময়? এই বিশ্ব পূর্ণ মধুস্থলী
একথা স্মরণ করে দাওনি কি চিত্তের অঞ্জলি
পরম স্রষ্টার পায়ে? অন্যমনে পথে কোনও দিন
মনে কি পড়েনি রাম অতীতের সুখ-স্বপ্নলীন
কোনও স্মরণীয় কথা? যদি আসে সে মুহূর্ত ফিরে,
মনে কি জাগেনি ইচ্ছা সেই কাম্য ক্ষণটিরে ঘিরে
আবার প্রমত্ত হই? এ অতৃপ্তি, এ মোহ-বন্ধন
জেনো রাম, জীবনের মহাসত্য, পরমার্থ ধন।
এই মন-বিহঙ্গম, আকাশে মেলেছে তার পাখা
দুই পক্ষে মোহ আর অতৃপ্তির চিত্র আছে আঁকা
সে মোহন চিত্রে দেখো লেখা আছে বিশ্ব ইতিহাস
জড়ত্বের পিণ্ড থেকে জীবনের বিপুল বিকাশ।

বিশ্বামিত্র :

শাণিত তোমার যুক্তি হে রমণী শোনো তবু বলি,
প্রণয়ের যজ্ঞকুণ্ডে কারে দিলে প্রাণের অঞ্জলি!
ব্যভিচারী দেবরাজ, নিত্য সঙ্গী মেনকা উর্বশী,
স্বর্গের সুরার পাত্রে বিম্বিত সে আকাশের শশী;
ইন্দ্র করে নিত্য পান যৌবনের মদমত্ত সুধা
তবু তার তৃপ্তি কোথা, ইন্দ্রিয়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
জ্বলন্ত অগ্নির মতো দাহ করে সর্ব চরাচর,
সেই জ্বালা অঙ্গে মেখে কামিনীর কম্পিত অধর
ইন্দ্র করে উপভোগ; তৃপ্তিহীন সেই ব্যভিচারী
বহুকান্তা সমাবৃত, তার করে হে বিদুষী নারী
নিজেকে অর্পণ করে প্রণয়ের কোন শুভ ফল
পেয়েছ আমারে বলো? চিত্ত শুধু হয়েছে চঞ্চল;
সহস্র নায়িকা রঙ্গে বিক্ষত কি হয়নি হৃদয়,
ঈর্ষার সুতীক্ষ্ণ শর বেঁধেনি কি তীব্র জ্বালাময়
ইন্দ্রের প্রণয়মুগ্ধ ওই দুটি আঁখির তারায়?

অহল্যা :

ঈর্ষাহীন ভালবাসা একদিন সকলই হারায়;
যে পাওয়া শুধুই পাওয়া, বেদনার স্পর্শ থেকে দূরে
আপনার সুখনীড় নিরুদ্বিগ্ন মিলনের সুরে
গেঁথে চলে, একদিন জেনো সেই সুখ-স্বর্গ হতে
ভ্রষ্ঠ হয় নরনারী; সীমাহীন অবসাদ স্রোতে
ভেসে চলে লক্ষ্যহারা; একোদর ভিন্নগ্রীবা পাখি
পরস্পর সংযোগের পরিণামে শুধু ডাকাডাকি,
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে নিরুপায়, বিষময় ফল
সর্বদেহে করে দেয় সঞ্চারিত তীব্র হলাহল।

অন্যদিকে প্রণয়ের পাত্র ভরে ঈর্ষারূপ সুধা
যে করে নিয়ত পান, বেদনা-সম্ভব এক ক্ষুধা
নিরন্তর তাড়নায় করে তার প্রেমে সঞ্জীবিত,
ঈর্ষা মন্থনের ফলে জন্ম নেয় অনাদি অমৃত।
প্রেমে ঈর্ষা সঞ্জীবনী, ঈর্ষা সেই আঁধার আকাশ
যাকে দীর্ণ করে সূর্য আপনার মহিমা প্রকাশ
নিত্য নিত্য করে চলে; নিশীথের বাধার আড়াল
আছে বলে সবিতার চিরদিন হিরন্ময় ভাল
সবার লক্ষ্যের বস্তু; ঈর্ষা তাই জীবন প্রবাহ।

রাম :

ঈর্ষা অনলের কণা, ঈর্ষা জেনো আগুনের দাহ।

অহল্যা :

গৃহদাহ করে অগ্নি, তাই বলে বলো কোন জন
নিত্য সংসারের সঙ্গী সে অগ্নিরে দেয় বিসর্জন?
যে ঝড় ডোবায় তরী, জলমগ্ন মানুষে আবার
এককণা বাতাসের প্রার্থনাই করে বারংবার।

বিশ্বামিত্র :

বহু প্রযত্নের ফলে সামাজিক সত্য প্রতিষ্ঠিত
এই চিরন্তন সত্য মানুষের একান্ত ঈপ্সিত,
তপস্যা জীবন সত্য, কামনা তাহারে বার বার
ভ্রষ্ট করে সিংহাসন, চালায়েছে তীব্র ব্যভিচার;
তোমার যুক্তির ওই পঙ্গপাল জেনো দলে দলে
সমাজের ক্ষেত্রে নেমে সুসজ্জিত সত্যের ফসলে
গ্রাস করে আচম্বিতে করে দেবে শূন্য অন্তঃসার

অহল্যা :

বহু মিথ্যা পুঞ্জীভূত, বাড়ায়ো না আর তার ভার;
সত্য কভু এক নয়, অবস্থার বিচিত্র বিধানে
সমাজের পরিস্থিতি এই সত্যে রূপান্তর আনে,
আমাদের প্রয়োজনে আজ যাকে সত্য বলে মানি,
নবতর প্রয়োজনে পুরাতন সে সত্যেরে টানি
ফেলে দিই বিস্মরণে, নব সত্য সেই সিংহাসনে
ততদিন চলে জেনো, যতদিন মানুষের মনে
থাকে তার শক্তিক্রিয়া; তারপর আবার কখন
সমাজের চিন্তাক্ষেত্রে নব নব ওঠে আলোড়ন,
তখন আবার ত্যাগ; রাজ্য থাকে চিরদিন স্থির
রাজা হয় স্থানচ্যুত, শাসনের লীলাই অস্থির;
যতকাল প্রজা চায়, ততকাল রাজার শাসন
চলে তার স্ব-স্বভাবে, তারপর সেই সিংহাসন
ছেড়ে চলে যেতে হয়; সমাজের নব আন্দোলনে
নতুন সত্যের জন্ম, পুরাতন যায় নির্বাসনে;
মাঝে শুধু ক্ষণিকের তোলপাড়, সমাজ সংক্ষোভ,
আবার নতুন দিনে দূরে যায় সকল বিক্ষোভ।

তপস্যা যেমন সত্য, কামনাও তুল্যমূল্য জানি
ইন্দ্র আর গৌতমের দুই রূপ সত্য বলে মানি;

সমস্ত জীবন-ধর্মে দুই সত্য করে অধিবাস,
কখনও আত্মস্থ মূর্তি, কখনও বা উদ্বেল প্রকাশ।

বিশ্বামিত্র মুনিবর, মনে কি পড়ে না সেই স্মৃতি
সহস্র বর্ষের তপ ভঙ্গ করে কী গভীর প্রীতি
দেখালে স্বর্গের সেই কলাবতী মেনকার পরে?
সেদিন বালার্ক-রাগ ফোটেনি কি মানস-অম্বরে?
বলোনি কি যাক দূরে সকল তপস্যা পুণ্যফল,
হে নারী প্রসাদ দাও; তোমার ও স্খলিত অঞ্চল
ঢেকে দিক আমার এ রূঢ় রুক্ষ্ম তপস্যা-কঠিন
দেহখানি, এ মুহূর্তে করে দাও একান্তই লীন
তোমার উত্তপ্ত বক্ষে; মিথ্যা মিথ্যা তপস্যা, আচার,
তুমি আছ, আমি আছি, এই সত্য জীবনের সার।

সেদিনের সেই রূপ কেন আজ ভুলে গেলে সাধু,
সেই স্বর্ণনীরে ধোয়া উজ্জ্বল দিনের মুগ্ধ জাদু!
আজ তুমি ঋষিশ্রেষ্ঠ এ কথা করি না অস্বীকার,
সেদিনের বিশ্বামিত্র সেই সত্য-মূর্তি কামনার;
দুই রূপই জেনো সত্য, একই দেহে জায়া ও জননী
পবিত্রতা সর্বদেহে, এই সত্য বেদমন্ত্র ধ্বনি।

[বৃক্ষের আড়াল থেকে গৌতমের আবির্ভাব]

গৌতম :

এসো নারী শুচিস্নাতা, আমার ক্রোধান্ধ অভিশাপ
ক্ষমা করো মুক্তমনে, তোমার ও যুক্তির উত্তাপ
আমার দেহের জড় তুষারের পিণ্ডে দিল নাড়া,
পেয়েছি ঊষর বক্ষে তরঙ্গিত জীবনের সাড়া;
তুমি নারী সর্বজয়ী, সত্যে অবস্থিত তনুমন,
তোমার বোধের কাছে গৌতমের আত্ম সমর্পণ।

বিশ্বামিত্র :

ঋষিশ্রেষ্ঠ আজ তুমি যথার্থই হলে ভাগ্যবান,
পরম ঐশ্বর্যময়ী এই নারী সর্ব অসম্মান
মুছে ফেলে, সংস্কারের চিররুগ্ণ আঁধার-নির্মোকে
সবলে ফেলেছে টানি; সুমার্জিত বুদ্ধির আলোকে
সমাজে করেছে দীপ্ত; এ সত্যের সীমাহীন দাম।

রাম :

ধন্য নারী মহীয়সী, শ্রীচরণে বিনীত প্রণাম।/

যৌবন

মাথার উপর আকাশে চৈত্রের দাহ। অশ্বারোহী ন্যুব্জদেহে প্রাণপণে বলগা আকর্ষণ করে চলেছেন। বেগবান অশ্ব বাধা পেয়ে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানাচ্ছে হ্রেষাধ্বনি তুলে।

জরাগ্রস্ত কম্পিত কলেবর যযাতি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। শুক্রাচার্যের আশ্রম ছাড়িয়ে এসেছেন বহুক্ষণ, কিন্তু ধীর গতির জন্য এখনও অতিক্রম করতে পারেননি দানবরাজ বৃষপর্বার রাজ্য। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের গভীর থেকে উঠে মিলিয়ে গেল চৈত্রের তপ্ত হাওয়ায়। গতকালও তিনি গিয়েছেন এ পথে। অশ্বকে কষাঘাত করে দ্রুত গতিতে পৌঁছে গিয়েছেন শুক্রাচার্যের আশ্রমে।

মধ্য যৌবনেও যযাতি বিক্রমকেশরী। কিন্তু একটি দিনের ব্যবধানে কী অবিশ্বাস্য পরিণতি তাঁর দেহের। অভিশপ্ত যযাতি আজ পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত, লোল চর্ম, ক্ষীণ দৃষ্টি এক বৃদ্ধ।

ওঃ কী ভীষণ, কী ভীষণ পরিণতি আমার।

কথা ক'টি উচ্চারণ করার সময় উত্তেজনায় কম্পিত হল দেহ। সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হস্ত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল বলগা। রাজা যযাতি চলমান অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন অনুর্বর প্রান্তরে। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর পতনের পর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে একটা মূর্ছার ভিতর থেকে যেন জেগে উঠলেন রাজা যযাতি। ভূমিশয্যা থেকে প্রান্তরের কঠিন মৃত্তিকায় উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হল শুক্রাচার্যের ধিক্কার, কী প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি আমার কন্যা দেবযানীকে গ্রহণের কালে? মিথ্যাচারী, তুমি না বলেছিলে, আমি অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হব না? দেবযানী হবে আমার অদ্বিতীয়া। নীতিভ্রষ্ট, তুমি অসুরকন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সংগোপনে লিপ্ত হলে ব্যভিচারে! তুমি তার গর্ভে করলে পুত্র উৎপাদন। মদমত্ত যযাতি, রাজা হয়ে মনে করেছ সর্বশক্তির অধীশ্বর তুমি। যে যৌবনমদে মত্ত হয়ে তুমি বিস্মৃত হলে তোমার শপথ বাক্য, সেই যৌবন এই মুহূর্ত থেকে হরণ করলাম আমি। জর্জরিত হবে কামনায়, কিন্তু তোমার ওই অক্ষম দেহ আক্ষেপে মূর্ছিত হয়ে পড়বে মাত্র। ভোগের বস্তু সম্মুখে দেখে হৃদয় তোমার হাহাকার করে উঠবে। কিন্তু অক্ষম ওই দেহ দগ্ধ হয়ে যাবে কামনার অগ্নিতে।

কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন যযাতি, প্রভু, দয়াময়, সংবরণ করুন আপনার ক্রোধ। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। আমি ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট। আমি মিথ্যাচারী, সর্বপ্রকার শাস্তির যোগ্য আমি। কিন্তু প্রভু, আমার অন্তরে কামনার অগ্নি আজও অনির্বাণ। ঐশ্বর্য, রাজ্য, যৌবন, সকল ভোগই এখনও আমার অপূর্ণ। আমাকে জরা দিয়ে আপনি মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করবেন না। তার চেয়ে কৃপা করে আমাকে মৃত্যু দিন প্রভু।

মুহূর্তে ক্রোধ সংবরণ করলেন ঋষি শুক্রাচার্য। বললেন, ব্যর্থ হবে না আমার অভিশাপ। তবে কেউ যদি তোমার জরা গ্রহণ করে তার যৌবন তোমাকে দান করে তবে কেবল তুমি তোমার পূর্বাবস্থা ফিরে পেতে পারো।

চতুর্দিকে উত্থিত শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল দিগন্তে। রাজা যযাতি সম্মোহ থেকে উঠে

দাঁড়ালেন। চৈত্রের তপ্ত রবিকরে আবার তিনি পিপাসার্ত হয়ে তাকাতে লাগলেন জলাশয়ের সন্ধানে।

প্রান্তরের দক্ষিণ সীমায় একটি বনস্থলী। যযাতি অশ্বারোহণে সেই কাননভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এসে পৌঁছল জলচর প্রাণীদের কলধ্বনি। তিনি মনে মনে জলাশয়ের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে প্রবেশ পথের সন্ধান করতে লাগলেন। অচিরে তিনি দেখতে পেলেন লতা পুষ্প শোভিত তোরণ পথ। অভিশপ্ত রাজা যযাতি সেই পথে প্রবেশ করলেন কাননে। সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর। তৃষ্ণার জলে পূর্ণ সে জলাশয়। রাজা অশ্ব থেকে অবতরণ করে অগ্রসর হলেন স্ফটিক নির্মিত সোপানের অভিমুখে। একবুক পিপাসা নিয়ে তিনি জলের সমীপবর্তী হলেন। কাকচক্ষু জল স্থির হয়ে আছে। নীলাকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে তার উপর। ঠিক যেন একখানি স্বচ্ছ দর্পণের উপর নিখুঁত প্রতিচ্ছবিটি। রাজা যযাতি অঞ্জলিবদ্ধ হাত নিয়ে নত হলেন, জলপানের আশায়।

কিন্তু এ কার ছবি ফুটে উঠল জলের দর্পণে! কাকে দেখতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত রাজা যযাতির অঞ্জলিবদ্ধ হাত খসে পড়ল। জলপানের আকুল বাসনা বিকৃত এক বেদনার স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মধ্য যৌবনের দীপ্তিতে ভাস্বর যযাতি দেখতে লাগলেন জরার ভারে আক্রান্ত আর এক যযাতিকে।

নবাগত এক অতিথিকে দেখে জলে তরঙ্গ তুলে এগিয়ে আসছিল হংসশ্রেণি। তাদের আন্দোলনে ভেঙে গেল রাজা যযাতির বিকৃত প্রতিকৃতি। হংসশ্রেণির উপর কৃতজ্ঞ রাজা এতক্ষণে আকণ্ঠ পান করলেন সুশীতল সলিল। পানশেষে উঠে এলেন স্ফটিকমণ্ডপে। সেখানে উপবেশন করে তাকাতে লাগালেন চতুর্দিকে। ঋতুরাজ বসন্তের রঙিন পতাকা উড়ছে অরণ্য বিটপীর শাখায় শাখায়। বসন্ত সখা মদন তার নিক্ষিপ্ত বাণে বিহ্বল করে তুলেছে বনভূমি। রাজা যযাতি সম্মুখের শাল্মলী তরুর শাখাভরা রক্ত পুষ্পের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন। অন্তরে তাঁর শুরু হল রক্তক্ষরণ। তিনি এই রক্তরাঙা বসন্তের গবাক্ষ পথে আর এক নবীন বসন্তের ছবি দেখতে লাগলেন।

সেদিনও দানবরাজ বৃষপর্বার এই কাননভূমিতে শুরু হয়েছিল বসন্তের লীলা। অশোকে শিমুলে পলাশে সে কী প্রমত্ততা। বিরহিণী বকুল মাটিতে ঝরাচ্ছিল তার অশ্রু। মধুকের শাখায় শাখায় গুঞ্জন করে ফিরছিল মধুকর।

সহসা আম্রমঞ্জরীর অন্তরালে ডেকে উঠল কোকিল। অমনি চারিদিক থেকে শুরু হয়ে গেল কোকিলের কলতান। সে যেন এক প্রতিযোগিতা। পিয়াল শাখায় বাঁধা কুসুম-দোলনায় দুলছিল দ্বাদশটি তরুণী কন্যা। তারা আম্রমঞ্জরীর আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোকিলটিকে বিভ্রান্ত করছিল তাদের ডাকে।

কাননভূমির বাইরে সেদিনও অশ্বারোহণে এসেছিলেন এক তরুণ। মৃগয়ায় এসে এক তরুণী হরিণীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তিনি পথ হারিয়েছিলেন। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেই রাজবেশধারী তরুণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন অসুররাজ বৃষপর্বার এই কাননভূমির বহির্ভাগে।

প্রবেশের পথ না দেখে সেই তরুণ যুবা লতাগুল্মের আচ্ছাদন সরিয়ে পত্রান্তরাল থেকে

দেখেছিলেন একটি আশ্চর্য ছবি। তিনি জলতৃষ্ণা ভুলে আর এক গভীর তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

অচ্ছোদ সরোবরের জলে খেলা করছিল হংস কারণ্ডবের দল। তারা সূর্যের সোনালি শরগুলির ভয়ে যেন ডুব দিয়ে লুকোচ্ছিল জলের তলায়। আবার উঠছিল, আবার লুকোচ্ছিল।

তরুণীরা দুলছিল ফুলের দোলনায়। তারা লাবণ্যময় বাহু উত্তোলন করে ধরেছিল পুষ্পে গাঁথা রজ্জু। চরণ মৃত্তিকায় আঘাত হেনে তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল শূন্যে। তাদের নানা বর্ণ-রঞ্জিত সূক্ষ্ম উত্তরীয় কণ্ঠ বেষ্টন করে উড়ছিল দুই প্রান্তে। মনে হচ্ছিল পক্ষযুক্ত দেবকন্যারা নির্জন নন্দন কাননে আনন্দের পরাগ ছড়াতে উড়ে ফিরছে।

কতক্ষণ চলল এমনি দোলন-লীলা। সঙ্গে সঙ্গে চলল গান আর গ্রীবা বাঁকিয়ে কথার চতুরালি।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তরুণ। সহসা সব কিছুকে স্তব্ধ করে দিয়ে নেমে এল তরুণী কন্যারা হিন্দোলা ছেড়ে।

সামনেই বৃত্তাকার স্ফটিক নির্মিত পুষ্পপত্র আচ্ছাদিত লতামণ্ডপ। সেখানে দ্বাদশটি সখী খুলে ফেলল তাদের অঙ্গবাস। স্তম্ভিত তরুণের হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসছিল।

তরুণীরা কঙ্কতিকা চালিয়ে কেশগুচ্ছ বিন্যাস করল। তারপর চূড়া করে বেঁধে নিল কেশকলাপ।

হংসশ্রেণি জলের বুকে ছোট ছোট তরঙ্গ তুলে এগিয়ে আসছিল। সহসা করতালি দিতে দিতে ছুটে গেল দ্বাদশটি তরুণী। তারা প্রায় একই সঙ্গে ডানা মেলে শ্বেত রাজহংসীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

হংসের শ্রেণি এখন দ্রুত পাখা টেনে ঢেউ কেটে পালাচ্ছে বিপরীত মুখে। তাদের পশ্চাতে তাড়া করে চলেছে সন্তরণ-পটু কন্যারা। হংসপক্ষ সঞ্চালিত জলবিন্দু এসে পড়ছে পশ্চাদবর্তী কন্যাদের চোখে মুখে আর কেশগুচ্ছে। ঠিক যেন মুক্তোর মালায় সজ্জিত হয়েছে কেশকলাপ।

এবার শুরু হল জলকেলি। ডুব দিয়ে কোনও কন্যা অন্যজনের চরণ ধরে আকর্ষণ করছে। কেউ বা সবলে নিমজ্জনের ব্যবস্থা করছে কোনও দুর্বলা সখীর। কোনও তরুণী কটিদেশ জলমগ্ন করে মুখের জল ফুৎকারে ছুড়ে দিচ্ছে শূন্যে। অমনি সেই জলকুয়াশায় সূর্যালোক পড়ে সৃষ্টি করছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রধনু।

স্তনাগ্রচূড়ায় সেই ইন্দ্রধনুর লীলা দেখে মনে হচ্ছিল, সুমেরু শিখরে রামধনু উদিত হয়েছে।

জলক্রীড়া শেষ করে সোপানে চরণ-স্পর্শ রেখে উঠে আসছিল কন্যারা। তারা কেশগুচ্ছ থেকে জল নিষ্কাশন করে আবার তা চূড়াবদ্ধ করে নিচ্ছিল। সহসা কোথা থেকে ছুটে এল এক ঝলক ঘূর্ণি হাওয়া। পলাশ, শিমুল, বকুলের ফুল ঘুরতে লাগল একাকার হয়ে। সেই ঘূর্ণিতে লতামণ্ডপে তরুণীদের রেখে দেওয়া বেশবাস উড়ে চলল ইতস্তত।

এখন তরুণীরা ক্ষিপ্র পদসঞ্চালনে এক একটি বস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে আবৃত করতে লাগল অঙ্গ।

অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা ছুটে গেল জল-কিনারায়। যে বস্ত্রখানি জল স্পর্শ করতে চলেছিল সেখানি ত্রস্তে আকর্ষণ করে জড়িয়ে নিল অঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এল আর এক তরুণী। শর্মিষ্ঠার দিকে তর্জনী তুলে বলল, আশ্চর্য স্পর্ধা তোমার শর্মিষ্ঠা, আমার বস্ত্র তুলে তোমার দেহ আবৃত করছ!

বিশ্বাস করো দেবযানী, তোমার আর আমার পরিধেয়ের বর্ণ প্রায় এক, তাই ভুল হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ দেবযানী বলল, ভুল কক্ষনও নয়, এ তোমার ইচ্ছাকৃত।

শর্মিষ্ঠা এবার নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। কঠোর কণ্ঠে বলল, সত্যিই আমি নির্বোধের মতো কাজ করেছি। আমার বোঝা উচিত ছিল একজন দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ কন্যা আর একজন রাজকন্যার বস্ত্র কখনও এক হয় না।

কী বললে?

যা সত্য তাই বললাম! তুমি আমার পিতার গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা, তাই তোমাকে সমাদরে আমাদের দলে টেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না তোমার ব্রাহ্মণত্বের এত অহংকার।

নিশ্চয়ই। শ্রেষ্ঠ বর্ণে জন্মেছি, অহংকার থাকবে না! দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে যখন তোমার দানবকুলের যোদ্ধারা নিহত হয় তখন মৃতসঞ্জীবন সুধা দিয়ে কে বাঁচায় তাদের? তাই তো আমার পিতাকে তোমার পিতা মাথার মুকুটমণি করে রেখেছে।

তোমার পিতার কথা আর বোলো না দেবযানী। সভার কাজ শেষ করে যখন আমার পিতা বিশ্রামগৃহে যান তখন তোমার পিতা শুক্রাচার্য তাঁর পশ্চাতে গমন করেন। পিতা যখন অর্ধশায়িত থাকেন তখন তোমার পিতা নিম্নাসনে বসে তাঁর সাংসারিক প্রার্থনা জানিয়ে যান। পিতা সেগুলি মঞ্জুর করলে তবেই তোমাদের ভরণপোষণ চলে।

একটু থেমে আবার বলল, এই যে বস্ত্রটি তুমি পরছ, এ-ও আমার পিতার কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেওয়া।

গুরুকন্যার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তা জানো না, —বলেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শর্মিষ্ঠার কেশাকর্ষণ করল দেবযানী।

সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় ঘটে গেল। শর্মিষ্ঠা সজোরে আঘাত করে দেবযানীকে ফেলে দিল জলে। তারপর দেবযানীর বস্ত্র মাটিতে ফেলে রেখে সখীদের নিয়ে দৃপ্ত পায়ে চলে গেল স্থান ত্যাগ করে।

তরুণ অশ্বারোহী সব কিছুই লক্ষ করলেন। কন্যারা যখন কানন থেকে নিষ্ক্রান্ত হল তখন তরুণ সন্ধান পেলেন প্রবেশ পথের। তারপর তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে তিনি প্রবেশদ্বার দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন।

দেবযানী সন্তরণে অপটু ছিল না, কিন্তু সে যে স্থানে পড়েছিল সে স্থানটি দৃঢ় জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হয়েছিল। শত চেষ্টাতেও দেবযানী সেই উদ্ভিদের তন্তু বন্ধন ছিন্ন করতে পারল না। তার মুক্তির আকুলতা যত বাড়ল, বন্ধন তত দৃঢ় হল।

তরুণ সরোবর তীরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

কাতর কণ্ঠে দেবযানী বলল, আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত। আমি মৃত্যু-পাশে জড়িয়ে পড়েছি, দয়া করে উদ্ধার করুন।

তরুণ তখন শর্মিষ্ঠা-পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি ভূমিতল থেকে তুলে নিয়ে একপ্রান্ত ধরে অন্য প্রান্ত ছুড়ে দিলেন দেবযানীর দিকে। দেবযানী বস্ত্রপ্রান্ত ধারণ করলে তিনি সজোরে তাকে আকর্ষণ করলেন কূলের দিকে। ছিন্ন হয়ে গেল বন্ধনপাশ, কিন্তু সেই মুহূর্তে বসন্তসখা মদন দুটি তরুণ তরুণীর হৃদয়কে আর এক বন্ধন-পাশে বেঁধে ফেললেন।

অগভীর জলে দাঁড়িয়ে দেবযানী বলল, আমার বসনখানি সিক্ত, তাই এ বস্ত্র পরিধান করে আপনার সম্মুখে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপরীত দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ যুবা পুরুষটি বললেন, আমার মস্তকের উষ্ণীষটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এক বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তৈরি। আপনার অসম্মতি না থাকলে আমার উষ্ণীষ আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে ধন্য হতে চায়!

দেবযানী অপরিচিত যুবার কথায় রোমাঞ্চিত হল। সে গ্রহণ করল তরুণের উষ্ণীষ। তা থেকে সযত্নে রত্নমালা মুক্ত করে সে পরিধান করল।

তীরে যখন দেবযানী উঠে দাঁড়াল তখন তাকে জলকন্যা বলে ভ্রম হচ্ছিল।

দেবযানীই প্রথমে কথা বলল, আপনি আমার প্রাণদান করলেন, আমি চিরদিন আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

যুবাপুরুষ এতক্ষণে দেবযানীর দিকে ফিরে বললেন, আমি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই কাননভূমিতে এসে পড়েছিলাম। আপনাকে দেখে আমার তৃষ্ণা দূর হল।

কপট কৌতুকে দেবযানী বলল, 'আমি তো জানি, তৃষ্ণা কোনওদিন দূর হয় না।'

ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন তরুণ, কী নাম তোমার?

অন্তরঙ্গতার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হল দেবযানী। বলল, আমি দানবগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্যের কন্যা। দেবযানী আমার নাম। কিন্তু আমার প্রাণদাতার পরিচয়টি এখনও জানা হয়নি আমার।

আমি মহারাজ নহুষের পুত্র যযাতি।

দেবযানী সসম্ভ্রমে বলল, মহারাজ নহুষের নাম ভুবনবিদিত। শুনেছি তাঁর দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে।

তোমার অনুমান সত্য কন্যা। তাই এ নবীন বয়সে পিতৃসাম্রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছে।

আশ্চর্য, আপনি মহারাজ যযাতি! আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করে সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আপনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়, তাই বর্ণশ্রেষ্ঠের প্রতি আমার অভিবাদন জানাচ্ছি।

দেবযানী সসংকোচে বলল, আমি সামান্য নারী, আপনার মতো মহাসম্মানীয় ব্যক্তির অভিবাদন গ্রহণের যোগ্য নই। আমার পিতার প্রতি সম্মান জানালে সেটি শোভনীয় হয়।

তোমার পিতার চরণ দর্শন করা কি সম্ভব হবে?

ক্ষণকাল চিন্তা করে দেবযানী বলল, মহারাজ, একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান আগে আমি করে নিতে চাই। তারপর আপনাকে পিতার সম্মুখে উপস্থিত করার বাসনা। আপনি কি সপ্তাহ অন্তে এই বনপ্রান্তে আর একটিবার দর্শন দিয়ে যেতে পারেন না?

তোমার ইচ্ছার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি কন্যা। একটি তরুণী হরিণীকে অরণ্য মধ্যে দেখতে পেয়ে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাকে শরাঘাত করতে পারিনি। অশ্ব ছুটিয়ে তাকে ধরে বন্দি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে এতদূর পথ আমাকে আকর্ষণ করে এনেছে।

দেবযানী সকৌতুকে বলল, এমনও তো হতে পারে মহারাজ সে হরিণী আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি। তাকে তাড়না না করে হৃদয়ের আমন্ত্রণ জানালে হয়তো সে নির্ভয়ে এসে ধরা দেবে।

রাজা যযাতি কৌতুকের অর্থ বুঝলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় সেই পলাতকা হরিণীটি মায়াবী। সে আমার প্রাণে তৃষ্ণা জাগিয়ে এই সরোবর তীরে আকর্ষণ করে এনেছে। তারপর ক্‌খন তার রূপ বদলে এক পরমা সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ধরা পড়ে গিয়ে রক্তারুণ হয়ে উঠল দেবযানীর মুখমণ্ডল। সে কথান্তরে যাবার চেষ্টা করে বলল, এই নিন মহারাজ আপনার মুক্তামালা। এটি সূত্র দিয়ে জড়ানো ছিল আপনার উষ্ণীষে।

মালাটি হাতে নিয়ে যযাতি বললেন, এটি উষ্ণীষেরই মালা। এখন উষ্ণীষ যার অধিকারে এ মালাও তার। অনুমতি হলে এ মালাটি তার হাতেই ফিরিয়ে দিই।

দেবযানী মস্তক নত করল। রাজা যযাতি দেবযানীর হৃদয়ের ভাষা পাঠ করে পুলকিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরলেন দেবযানীর আনত মুখ। কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন মুক্তার মালা।

দেবযানীর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল। দুটি নিটোল মুক্তা বিন্দু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

তুমি কাঁদছ দেবযানী?

আনন্দের ভার বইতে পারছি না বলে।

তুমি সম্মতি দিলে রাজা যযাতি তার পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেবে দেবযানী।

আমি কুমারী মহারাজ। পিতার অধীন। আমার ইচ্ছা থাকলেও স্বেচ্ছাচারী হবার অধিকার নেই। তাই এ সপ্তাহের অন্ত দিনটিতে আপনাকে এই বনপ্রান্তে আসার অনুরোধ জানিয়েছি।

অন্তরে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন মহারাজ যযাতি।

দেবযানী আশ্রম কুটিরে ফিরে এলে উদ্বিগ্ন শুক্রাচার্য বললেন, এত বিলম্ব কেন মা? প্রভাতে স্নান সমাপন করে তুমি সত্বর তরুআলবালে জলসিঞ্চন করো, আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ধেনুগুলি এখনও অভুক্ত, তারা তোমার হাতে ছাড়া আহার্য গ্রহণ করে না। নিশ্চিত কোনও বিপর্যয়ে পড়েছিলে, না হলে এত বিলম্ব তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রয়েছি মা।

পিতার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল দেবযানী।

বিস্মিত শুক্রাচার্য কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, কী হয়েছে মা?

আমি আর এ রাজ্যে থাকতে চাই না বাবা।

আমাকে পরিষ্কার করে সকল কথা খুলে বলো।

রাজা বৃষপর্বা যদি আমার পিতার চেয়ে সম্মানে বড় হন, আর তাঁর প্রদত্ত অন্ন বস্ত্র ছাড়া যদি আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, তা হলে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তুমি এসব কী বলছ?

আমি ঠিক বলছি বাবা। আজ স্নানের ঘাটে শর্মিষ্ঠা আমাকে এসব কথা বলেছে। তুমি নাকি রাজার কাছে সব কিছু প্রার্থনা করে নাও।

ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য বললেন, আমি কারু দয়ার দান গ্রহণ করি না। যুদ্ধে মৃত দানবদের সঞ্জীবনী সুধার প্রভাবে বাঁচিয়ে দিই তাই রাজা আমাকে কিছু দিতে পেরে কৃতার্থ হয়।

দেবযানী বলল, আমাকে শর্মিষ্ঠা জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ মৃত্যুর ফাঁদে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়, এক দয়ালু রাজা সেই মহা বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেন।

আশ্চর্য! এ সকল ঘটনার কিছুমাত্র আমার গোচরে ছিল না।

দেবযানী বলল, আমি অপরাধীর শাস্তি চাই বাবা। আর পুরস্কৃত করতে চাই আমার প্রাণদাতাকে। না হলে এ দেশ আমি ত্যাগ করব।

শুক্রাচার্য দেবযানীকে সঙ্গে নিয়ে চললেন রাজ-সন্নিধানে। গুরু শুক্রাচার্যকে দেখে সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজা বৃষপর্বা পাদ্যার্ঘ দান করলেন। অতঃপর উপযুক্ত আসনে পিতা-পুত্রীকে বসিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে বললেন, কী করণীয় আমায় আদেশ করুন প্রভু।

শুক্রাচার্য বললেন, তোমার কাছে বিচারের প্রত্যাশায় এসেছি।

কীসের বিচার প্রভু? কে সেই অপরাধী যে রাজগুরুকে অসম্মান করতে সাহস পায়?

তোমার কন্যা।

শর্মিষ্ঠা!

হ্যাঁ; তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করি। আজ স্নানের ঘাটে তোমার কন্যা দেবযানীকে এসব কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, সে আমার কন্যাকে জলের মধ্যে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল। দেবযানী আর একটি দিনও এ রাজ্যে থাকতে চায় না। আমিও মনে মনে চিন্তা করেছি, যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে অবস্থান করা কোনও মতেই শ্রেয় নয়।

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে গুরুর কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পরিত্যাগ করবেন না প্রভু। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে যে শাস্তি দেবে তা শর্মিষ্ঠা পালন করতে বাধ্য থাকবে।

এরপর রাজা বৃষপর্বা দেবযানীকে লক্ষ করে বললেন, বলো দেবযানী, তুমি তোমার সখী শর্মিষ্ঠাকে কীরূপ শাস্তি দিতে চাও?

স্পষ্ট কণ্ঠে দেবযানী বলল, ওর অহংকার চূর্ণ হোক আমি চাই। ও সারাক্ষণ অনুগত দাসীর মতো থাকবে আমার সঙ্গে সঙ্গে।

রাজা বৃষপর্বা বললেন, অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পালিত হবে দেবযানী।

রাজা বৃষপর্বা ডেকে পাঠালেন শর্মিষ্ঠাকে। শর্মিষ্ঠা নতমুখে এসে দাঁড়াল সভার সামনে। রাজা সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন, তুমি অপরাধী, সুতরাং দেবযানীর দেওয়া শাস্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমার দানবকুলের মঙ্গলের জন্য এ শাস্তি আমি মাথা পেতে নিলাম।

আশ্রম কুটিরে ফিরে এসে দেবযানী শুক্রাচার্যকে বলল, বাবা আমি আমার প্রাণদাতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কীসের প্রতিশ্রুতি মা?

যে প্রাণ উনি দয়া করে রক্ষা করেছেন সেই প্রাণ ওঁকে উৎসর্গ করতে চাই।

আমার কোনও অসম্মতি নেই দেবযানী। যে তোমার প্রিয় সে আমার স্নেহের ভাগী। তা ছাড়া যযাতি রাজচক্রবর্তী।

নির্দিষ্ট দিনে যযাতি এলেন রাজা বৃষপর্বার সেই কাননে। তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে ছিল দেবযানী। রাজা যযাতি এলে তাঁকে পিতার কাছে নিয়ে এল সে। যযাতি আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন অসুরগুরু শুক্রাচার্যকে।

আসন গ্রহণ করো পুত্র।

যযাতি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উপবেশন করো মহারাজ যযাতি।

প্রভু, আপনি আসন গ্রহণ না করলে আমি তো উপবেশন করতে পারি না।

শুক্রাচার্য বললেন, আমি তোমার শিষ্টাচার পরীক্ষা করছিলাম যযাতি। যথার্থই মহৎ বংশে জন্ম তোমার।

নিজে শুক্রাচার্য আসন গ্রহণ করে রাজা যযাতিকে পাশে বসালেন।

রাজ্যের কুশল তো?

দেব-দ্বিজ আর প্রজাকুলের শুভেচ্ছায় রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রভু।

তুমি যে প্রজাকুলকে তোমার রাজ্যের কুশলের সঙ্গে জড়িত করলে সেজন্যে তোমার রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হলাম।

দেবযানী পিতাকে অভ্যন্তরে আহ্বান জানিয়ে বলল, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে।

শুক্রাচার্য যযাতির কর ধারণ করে অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ফলাহারের আয়োজন ছিল। আচমনের জল নিয়ে রাজা যযাতি হস্তমুখ প্রক্ষালন করলেন। তারপর শুক্রাচার্য উপবেশন করলে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

যৎকিঞ্চিৎ ফলাহারের পর শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে নিয়ে গেলেন আশ্রমবেদিকায়। সেখানে হরীতকী আস্বাদন করতে করতে শুক্রাচার্য বললেন, দেবযানী আমার প্রাণাধিক কন্যা। সে উপযুক্ত কারণেই তোমাতে আসক্ত হয়েছে। এখন তুমি তোমার অন্তরে কোনও দ্বিধা না রেখে দেবযানীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা বলো?

আপনি আদেশ করলে আমি শুচিশুদ্ধা দেবযানীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে রাজগৃহে নিয়ে যাই।

শুক্রাচার্য বললেন, যখন তোমরা পরস্পরকে উপযুক্ত কারণে হৃদয় দান করেছ তখন আমার আন্তরিক সম্মতি অবশ্যই পাবে। কিন্তু উভয়ের মিলনের পূর্বে আমার কয়েকটি কথা আছে।

উৎসুক শ্রোতার ভূমিকায় উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলেন রাজা যযাতি।

একটু চিন্তামগ্ন থেকে শুক্রাচার্য বললেন, বড় আদরের কন্যা আমার দেবযানী। বড় অভিমানী সে। তুমি উচ্চ কুলোদ্ভব সত্য কিন্তু দেবযানী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করেছে। সে যখন স্বেচ্ছায় তোমাকে বরণ করেছে তখন আমার দিক থেকে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। শুধু একটি বাক্য তোমাকে দান করতে হবে যযাতি।

বলুন প্রভু।

আমার কন্যা অদ্বিতীয়া হয়ে থাকবে তোমার অন্তঃপুরে, কেবল এই প্রতিশ্রুতি আমি তোমার কাছে চাই।

আমি এ বিষয়ে আপনাকে বাক্যদান করছি প্রভু। দেবযানী ছাড়া আমার অন্তঃপুরে দ্বিতীয় কোনও মহিষী থাকবে না।

তোমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে অন্তরে বড় শান্তি লাভ করলাম যযাতি। আমি এখন মুক্তচিত্তে তোমাকে কন্যা সম্প্রদানে প্রস্তুত।

দানবরাজ বৃষপর্বা দেবযানীর বিবাহের উপযুক্ত আয়োজন করে দিলেন। তিনি ও তাঁর মহিষী সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে দেবযানীর বিবাহ সুসম্পন্ন করলেন।

পতিগৃহে যাত্রাকালে সুসজ্জিত চতুর্দোলায় আরোহণ করল দেবযানী, আর দাসী শর্মিষ্ঠা আরোহণ করল সাধারণ এক শিবিকায়।

রাজকন্যা আজ ভাগ্যদোষে দাসী। শর্মিষ্ঠা পরিধান করল না কোনও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার। সে অতি সাধারণ পরিচারিকার বেশে মহারানি দেবযানীর চতুর্দোলার পাশে পাশে শিবিকা আরোহণে রাজপুরীর উদ্দেশে যাত্রা করল। পিতামাতা নীরবে অশ্রু মোচন করলেন। কিন্তু আশ্চর্য শর্মিষ্ঠা! পিতৃরাজ্য ছেড়ে চলে যাবার সময় তার চোখে একবিন্দু অশ্রু কেউ দেখল না। একটি বাক্যও উচ্চারিত হল না তার মুখ দিয়ে। শর্মিষ্ঠার সখীরা রাজকন্যার এই পরিণতিতে অঝোরে ঝরাল চোখের জল।

রাজগৃহে সপ্তদিবস উৎসব অবসানে যখন সকলেই ক্লান্ত অবসন্ন তখন শয়নগৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে রাজা যযাতি থমকে দাঁড়ালেন। সুসজ্জিত শয্যায় দেবযানী তন্দ্রাচ্ছন্ন, তার চরণ সংবাহন করছে একটি কান্তিময়ী কন্যা। গৃহকোণে রক্ষিত মণি দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। আলো আঁধারের রহস্যময় লীলায় কন্যাটিকে বড় রহস্যময়ী বলে মনে হল। রাজা গৃহে প্রবেশ না করে অলিন্দে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেখলেন কন্যাটিকে। যদিও সে পরিচারিকার কাজ করছিল তবু রাজা যযাতির অভিজ্ঞ চোখ তাকে পরিচারিকা বলে মেনে নিতে পারল না।

কতক্ষণ এমনি পদসংবাহনের পর যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন দেবযানী পার্শ্ব পরিবর্তন করল তখন চরণতলে রক্ষিত গাত্রবস্ত্রখানি বক্ষ পর্যন্ত টেনে দিয়ে উঠে এল কন্যাটি।

অলিন্দের এক পার্শ্বে রক্ষিত দীপটি তখন বায়ুতাড়িত হয়ে নিভে গেছে। অন্ধকারে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন রাজা যযাতি।

পরিচারিকাটি রহস্যময় আলোকে উদ্ভাসিত গৃহ থেকে অন্ধকার অলিন্দে প্রবেশ করলে রাজা যযাতি তার পথরোধ করে মৃদু কণ্ঠে বললেন, কে তুমি কন্যা?

প্রভু আমি মহারানির পরিচারিকা।

মহারাজ বললেন, তোমার কাজ থেকে তা প্রমাণিত হলেও তোমার সারা অবয়বের কোথাও সে প্রমাণ নেই।

মহারাজ, সামান্য পরিচারিকা ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আজ আর আমার নেই।

তুমি কি মহারানির পিত্রালয় থেকে এসেছ?

মহারাজের অনুমান যথার্থ।

কী নাম তোমার পিতার?

মহারাজ, প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত না করলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

কিন্তু কন্যা, পিতার নাম জিজ্ঞাসার পর নিরুত্তর থাকার একটি মাত্রই কেবল অর্থ হয়। আর সে অর্থ তোমার মতো বুদ্ধিমতী কন্যার অজানা থাকার কথা নয়।

অন্ধকারে রাজা যযাতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন।

তিনি কোমল সহৃদয় স্বরে বললেন, আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি কন্যা। তুমি

পরিচারিকা, এ সত্যটুকু স্বীকার করে নিতে আমার মন চাইছে না। ঠিক আছে, পরিচয়দানে বাধা থাকলে তোমাকে পীড়িত করব না।

কন্যা বলল, আপনার সহৃদয় বাক্য আমার মনের ক্ষতে শান্তির প্রলেপ বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনাকে পরিচয় দিতে পারি কিন্তু সামান্য একটি প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।

বলো কীসের প্রতিশ্রুতি, নিশ্চয়ই তা রক্ষিত হবে।

আমি যে মহারাজকে আমার পরিচয় দিয়েছি একথা যেন আমাদের মহামান্যা মহারানির কাছে প্রকাশ না পায়।

কথা দিচ্ছি, কোনও রকমেই তা মহিষীর কর্ণগোচর হবে না।

আমি দানবরাজ বৃষপর্বার একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠা।

তুমি সেই দানবকন্যা যে দেবযানীকে পুষ্করিণীতে মৃত্যুর মাঝে ফেলে দিয়েছিল?

একটি বচসার পরিণতিতে আমি তাকে সরোবরে ঠেলে ফেলে দিই সত্য, কিন্তু তার মৃত্যু হোক, এ আমি অন্তর থেকে চাইনি। আমি জানতাম না মহারাজ যে সরোবরের ওই অংশে কঠিন মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে। আমি সহজ বিশ্বাসেই জানতাম, সন্তরণ পটু দেবযানী সহজেই জল থেকে উঠে আসবে।

আমি তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি শর্মিষ্ঠা। আমি ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। পত্রান্তরাল থেকে সবই আমি দেখেছি। আমিই তোমরা চলে যাবার পর জলাশয় থেকে দেবযানীকে উদ্ধার করি।

শর্মিষ্ঠা বলল, ঘটনা যাই হোক, আমি যখন ওকে জলে ফেলেছি তখন আমিই অপরাধী মহারাজ। আর আমার সে অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন আমার পিতা দেবযানীর ইচ্ছা অনুযায়ী। আমি নতমস্তকে দেবযানীর দাসীত্ববরণ করেছি।

মহারাজ যযাতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস। মহাশক্তিধর দানবরাজকন্যার এ কী পরিণতি!

মহারানি হয়তো আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন মহারাজ, আপনি গৃহে প্রবেশ করুন।

তুমি বিলক্ষণ জানো শর্মিষ্ঠা, দেবযানী নিদ্রাগতা।

শর্মিষ্ঠা বলল, সুপ্তি যে-কোনও মুহূর্তে জাগরণে রূপান্তরিত হতে পারে।

তোমার সেবা মহারানির সুপ্তিকে গাঢ় করেছে শর্মিষ্ঠা।

তবু বলি মহারাজ, আপনার সঙ্গে এই অন্ধকার অলিন্দে এক দাসীর বাক্যালাপ শোভনও নয়, সমীচীনও নয়।

মহারাজ যযাতি বললেন, আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম শর্মিষ্ঠা, কিন্তু রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দাসী, এ কথা আমার অন্তর থেকে কোনওদিন মুছে যাবে না।

প্রভু, দাসীকে মনে রেখে কী লাভ আপনার?

এখানে লাভালাভের প্রশ্ন নয় শর্মিষ্ঠা। একটা অসত্য অবিচারকে নীরবে মেনে নেবার ভেতর মনের একটা গ্লানি থেকে যায়। তোমাকে যে মুহূর্তে দেখব সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে বিরাট এক অবিচারের কথা, যার প্রতিকারের কোনও পথ নেই। রাজা হয়ে এই অক্ষমতার কথা অন্তর থেকে মুছে ফেলি কী করে বলো। তাই একটি অবিচার আর একটি নারী চিরদিন গাঁথা হয়ে থাকবে আমার অন্তরে।

একটু থেমে রাজা যযাতি বললেন, শর্মিষ্ঠা, বিধাতার ইচ্ছা হলে আমাদের দেখা হবে পুনর্বার। এখন রাত্রি গভীর হল। তোমার আমার উভয়েই বিশ্রামের প্রয়োজন।

অন্ধকারে একটি প্রণাম নিবেদিত হল রাজা যযাতির চরণে। যযাতিও কম্পিত একটি দেহ দুই বলিষ্ঠ বাহুতে ধারণ করে ভূতল থেকে তুলে ধরলেন।

এক নিশীথে দেবযানী রাজা যযাতিকে বলল, মহারাজ, আমার একটি অনুরোধ আছে।

যযাতি বললেন, মহারানির যে-কোনও অনুরোধই মহারাজের কাছে আদেশ।

পরিহাস নয় মহারাজ। আমার সমস্ত কথা শুনে কর্তব্য স্থির করুন।

বলো দেবযানী।

আমার পিত্রালয় থেকে একটি দাসী এসেছে। সে উচ্চবংশের কন্যা, কিন্তু একটি গর্হিত কাজের জন্য তার এই দাসীত্ব। তার সৌন্দর্য, আচার ব্যবহার রাজগৃহের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার সম্বন্ধে রাজপুরীর সকলেই কৌতূহলী। তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু জানতে না পেরে পুরস্ত্রীরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। আমি চাই না পিতৃগৃহের কোনও ঘটনা এখানে প্রকাশ পাক, আর তাই নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরচারিণীরা অলস আলোচনায় মেতে উঠুক।

একটু থামল দেবযানী। মহারাজ যযাতি বললেন, এত ভাবনার কী আছে। দাসীটিকে মুক্তি দিয়ে তার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দাও, তা হলেই দেখবে দু'দিনে সব প্রশ্ন, সব কৌতূহলের অবসান হয়েছে।

না, তা হয় না মহারাজ। ও চিরজীবন আমার দাসীত্বের অঙ্গীকার নিয়েই এখানে এসেছে। যদি আপনি ওর জন্যে আপনার রাজ্যের কোনও নিভৃত উদ্যানে কুটির নির্মাণ করে দেন তা হলে সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে দাসীটি থাকতে পারে।

সে আর এমন কী অসাধ্য ব্যাপার দেবযানী। আমি অচিরেই তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটি প্রশ্ন, স্থানটি কি রাজগৃহের সন্নিকটে হবে না দূরে?

আমি দাসীটিকে রাজগৃহের কোনও সংশ্রবের ভেতরেই জড়াতে চাই না, তাই এ রাজ্যের মধ্যে যতটা দূরে সম্ভব তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

মহারানি, তোমার প্রস্তাব শিরোধার্য। পক্ষকালের ভেতর তোমার দাসী তার নতুন আবাসে যাত্রা করতে পারবে।

মহারাজ যযাতির আদেশে রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত কাননভূমিতে নির্মিত হল দাসী শর্মিষ্ঠার নতুন বাসস্থান। সুপক্ক ফলভারে অবনত বৃক্ষ, কাননের শোভা ও সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছিল। নির্জন কাননটি অহিংস শশক ও হরিণের নির্ভয় বিচরণক্ষেত্র। প্রভাত ও সন্ধ্যায় পাখিদের আনন্দ কূজনে সমস্ত বনস্থলী মুখরিত। একটি ক্ষুদ্র জলাশয় তার অতি স্বচ্ছ হৃদয়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্র, মেঘপুঞ্জকে ধরে রেখে সুখতৃপ্ত গৃহবধূর মতো অবস্থান করে। কাননের এক প্রান্তে এক মালীর কুটির। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে সেই কুটিরে আর কাননের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকে।

শর্মিষ্ঠা সেই নির্জন কাননভূমিতে এসে সুখী হয়ে উঠল। রাজা যযাতির আদেশে প্রভুভক্ত উদ্যানরক্ষক শর্মিষ্ঠার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখল।

এদিকে রাজপুরীতে দেবযানী আশ্বস্ত হল, শর্মিষ্ঠাকে নির্জন-নির্বাসনে পাঠিয়ে বারে বারে অকারণ কৌতূহলী প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল না তাকে।

সুখে দিন কাটে দেবযানীর। রাজা যযাতির শুধু প্রিয়তমা পত্নীই সে নয়, অদ্বিতীয়াও বটে। ধীরে ধীরে দেবযানীর নারীজীবনের পূর্ণবিকাশ ঘটল মাতৃত্বে। রাজা যযাতি লাভ করলেন প্রথম সন্তান। রাজগৃহে সে কী সমারোহপূর্ণ উৎসবের ঘটা। শুক্রাচার্যকে তৃপ্ত করতে দানবরাজ বৃষপর্বা পাঠালেন মহামূল্য উপহার নবজাতকের জন্য। কিন্তু বুকখানা বিদীর্ণ হয়ে গেলেও একবার খোঁজ নিতে পাঠালেন না কন্যা শর্মিষ্ঠার।

নবজাতকের আগমন উপলক্ষে রাজ্যের নানাস্থান থেকে এলেন সামন্ত নৃপতিরা। আত্মীয়স্বজনে রাজপুরী পূর্ণ, কিন্তু এই মহাব্যস্ততার মধ্যে একবারও দেবযানীর মনে পড়ল না দাসী শর্মিষ্ঠার কথা। এ আনন্দযজ্ঞের কোথাও স্থান হল না শর্মিষ্ঠার। কেবল একজন সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে লাগল নির্জন বনবাসিনী শর্মিষ্ঠার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা।

উৎসব-দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, আবার তা নির্বাপিত হল। আত্মীয় বন্ধুজন ফিরে গেল যে যার আবাসে। রাজা যযাতি অবসর বুঝে একদিন একাকী অশ্বারোহণে চললেন কাননভূমির দিকে।

একাকী দিন কাটে শর্মিষ্ঠার। রাজগৃহ থেকে ভোগ্যবস্তু এনে দেয় উদ্যানরক্ষক। তার স্ত্রী প্রয়োজনে এসে দাঁড়ায় শর্মিষ্ঠার পাশে। কিন্তু পার্থিব সকল অভাব মিটে গেলেও কী এক অপূরণীয় অভাব শর্মিষ্ঠার শূন্য হৃদয় জুড়ে হাহাকার করতে থাকে।

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল অরণ্যশিরে। জলের দর্পণে আশ্চর্য প্রতিবিম্ব পড়ল তার। সরোবর সোপানে বসে অন্যমনে শর্মিষ্ঠা চেয়ে চেয়ে দেখছিল জল-দর্পণে চাঁদের উজ্জ্বল ছবি, আর ভাবছিল নিজের ব্যর্থ জীবনের কথা। হঠাৎ তারই সম্মুখের জলতলে পড়ল একটি ছায়া। সে মুহূর্তে চমকিত হয়ে ফিরে তাকাতেই দেখল, মহারাজ যযাতি সহাস্যে তার দিকে চেয়ে আছেন।

মহারাজ!

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল শর্মিষ্ঠা, রাজা যযাতি তাকে বাধা দিয়ে বসালেন। নিজে বসলেন তার পাশটিতে।

শর্মিষ্ঠা সংকোচে সরে যেতে গিয়ে আবার বাধা পেল।

তুমি তো দাসী নও শর্মিষ্ঠা, তুমি রাজকন্যা। রাজরক্ত বইছে তোমার দেহে।

আমাকে মান দিয়ে অপরাধী করবেন না মহারাজ। আমি মহারানি দেবযানীর ক্রীতদাসী।

যযাতি শর্মিষ্ঠার একখানি হাত ধরে বললেন, তুমি দেবযানীর দাসী হতে পারো কিন্তু আমার নও। আমার দৃষ্টিতে তুমি আজও সম্মানীয়া রাজকন্যা। যে-কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রার্থিত রমণীরত্ন তুমি।

পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রেখে সেদিন যযাতি আপন প্রসারিত বক্ষে টেনে নিলেন দানবকন্যা

শর্মিষ্ঠাকে। বললেন, আজ থেকে দেবযানীর মতো তোমারও রইবে এ বক্ষের ওপর পূর্ণ অধিকার।

দাসী হয়ে এতবড় অধিকার প্রভু!

না শর্মিষ্ঠা, এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে দিলাম পত্নীর সমস্ত মর্যাদা।

দুটি হাতে আঁখি আবৃত করে কাঁদল শর্মিষ্ঠা। একটু শান্ত হয়ে বলল, কত মহৎ আপনি। কিন্তু মহারাজ, একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে।

নিশ্চয়ই রাখব শর্মিষ্ঠা।

এবারও তা হলে আপনাকে গোপন রাখতে হবে আমাদের সত্যিকারের পরিচয়।

কেন শর্মিষ্ঠা?

দুটি কারণে মহারাজ। দেবযানীর কাছে রয়েছে আমার দাসীত্বের অঙ্গীকার। আর অন্য কারণটি হল, দেবযানীর ক্রোধ থেকে মহারাজের পরিত্রাণ।

মহারাজ যযাতি কিছু সময় ভেবে বললেন, কিন্তু তোমাকে রাজপুরীতে না নিয়ে গেলে রানির পূর্ণ মর্যাদা তুমি পাবে কী করে?

রাজপুরী আমার আকাঙ্ক্ষিত স্থান নয় মহারাজ। আপনার ভালবাসা পেয়েছি আমি। আজ আমার চোখে এই অরণ্য রাজগৃহের চেয়েও রমণীয়। সেখানে আমার রাজার ওপর সহস্র মানুষের অধিকার। রাজসভায় সভাসদ আর প্রজাকুল আপনাকে অধিকার করে থাকে, অন্তঃপুরে দেবযানী। এখানে নির্জনে যেদিন আপনি চরণধূলি দেবেন, সেদিনটি আর কারও নয়, একান্ত আমার। এ অরণ্য, দিনরাত্রি, এর চন্দ্রসূর্য, পশুপক্ষী, ঋতু সবই আমাদের দু'জনের ভালবাসার সঙ্গে জড়িয়ে রইল। দেবযানী থাক কোলাহল আর সম্পদ নিয়ে, আমাকে দিন অরণ্যের এই শান্তি। প্রথম প্রভাত, প্রথম ফুটে ওঠা কুসুম কলি, প্রথম পাখির কাকলি হোক আমাদের ভালবাসার রং, রূপ আর মন্ত্র। আমার প্রতীক্ষার পথ বেয়ে আপনি আসবেন, এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার কী আছে মহারাজ।

তাই হবে শর্মিষ্ঠা। তুমি আজ থেকে হবে এ অরণ্যভূমির অধিশ্বরী। আমাদের এই গোপন মিলনের কথা জানবে শুধুমাত্র কাননরক্ষক। তার ওপরেই থাকবে তোমার পরিচর্যার ভার। আমি তার সততা, সেবা, প্রভুভক্তি লক্ষ করেছি, সে তোমার উপযুক্ত সেবক হতে পারবে।

মহারাজ, আপনার উদ্যানরক্ষক দেবলের স্ত্রী সরযূ প্রতিদিন আমার খোঁজ নিয়ে যায়। সাধারণ কুলে তার জন্ম, কিন্তু মহারাজ, হৃদয় তার অনেক উচ্চ।

রাজা যযাতি বললেন, কতদিন তোমার কথা ভেবেছি শর্মিষ্ঠা কিন্তু পথ খুঁজে পাইনি। আজ তোমাকে নিজের করে নিতে পেরে আমার সকল খোঁজার শেষ হল।

আমি আজ আমার সব হারিয়ে যা পেলাম তা আমার জীবনের সবসেরা ধন, মহারাজ।

পঞ্চবর্ষের শিশু পুরু বনের আলোছায়ায় খেলা করে। নিরীহ হরিণ শিশু, চঞ্চল শশক, ক্ষিপ্রগতি কাঠবেড়ালি তার খেলার সঙ্গী। জন্মলগ্ন থেকে উদার প্রকৃতির সঙ্গে পুরুর পরিচয়ের শুরু। সে পরিচয় বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। শর্মিষ্ঠা তার এই দুরন্ত শিশুটিকে সামলাতে পারে না। এই আছে দৃষ্টির ভিতর, এই অন্তরালে। অরণ্যের আড়াল রচনা করে সে মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। মাকে ভয় দেখিয়ে কাতর করে দিতে পারলে তার খেলার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

বাবা মানুষটি তার কাছে সম্পূর্ণ চেনা নয়, তাই এক রহস্য, কৌতূহল তাঁকে ঘিরে বিরাজ করে পুরুর শিশু-মনে।

রাজা যযাতি এসে পুত্র পুরুকে বুকে তুলে নেন। পুরু প্রথমে অপরিচয়ের দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর সন্দেহের অবসানে ভাব হয় বাবার সঙ্গে।

পুরুর সবচেয়ে পছন্দ বাবার অশ্বটি। পিতার সঙ্গে ওই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে সে যখন কানন পথে ঘুরে বেড়ায় তখন যে তার আনন্দের শেষ থাকে না। এতে তার ক্লান্তি নেই। অশ্ব হতে বরং তার মা যখন তাকে নামিয়ে আনে তখন সে কান্নায় শব্দিত করে তোলে সমস্ত কাননভূমি।

কোনও কোনও দিন রাজা যযাতি পুত্রের মাথায় পরিয়ে দেন তাঁর মাথার মুকুট। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটি ক্ষেত্রে পুরুর প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজমুকুট মাথা থেকে নামিয়ে ফেলে দেয়।

শর্মিষ্ঠা রাজার দিকে তাকিয়ে বলে, ও যে কোনওদিন রাজমুকুট পরবে না, এটা তারই প্রমাণ।

যযাতি বলেন, আমার ধারণা তোমার ঠিক উলটোটি শর্মিষ্ঠা। যে স্বেচ্ছায় মুকুট চায় না, মুকুট আপনিই তখন তার শিরে শোভা পায়।

এখন খেলার নতুন সাথী জুটেছে পুরুর। দেবল আর সরযূর একটি ফুলের মতো ছোট্ট মেয়ে হয়েছে। সারাদিন সেই মেয়েটির সঙ্গে খেলা করে ক্লান্ত হয় না পুরু। মেয়েটি পুরুর আকস্মিক অত্যাচারে ভয় পায় না। পুরু তাকে জোরালো শব্দ তুলে শাসন করতে গেলে সে তার সাদা কচি কচি দাঁতগুলি দেখিয়ে দেয়। তাই পুরুর কঠোর শাসনে কোনও সুফল দেখা দেয় না।

দু'জনে প্রকৃতির নিয়মে আর মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। তাদের সহজ দৃষ্টি কেমন যেন জিজ্ঞাসু আর গভীর হতে থাকে। এতদিনের চেনা তারা তবু আজকাল দু'জনের মাঝে কেমন এক অচেনা অজানার পরদা দুলতে থাকে।

সরযূর কন্যা শ্রুতি শর্মিষ্ঠার নয়নের মণি। শ্রুতির স্বভাবে, আচরণে এমন এক শান্ত, বিনম্র ভাব আছে যা শর্মিষ্ঠার অন্তরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। শ্রুতিকে দেখলে মনে হয় সে যেন ভোরের আকাশ। তার চোখের দ্যুতি যেন পুব আকাশের প্রভাতি তারার থেকে নেওয়া। তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনই উজ্জ্বল।

এক সন্ধ্যায় চাঁদ উঠেছে আকাশে। বনের পথে আলো আঁধারের রহস্যময় আলপনা। কে যেন বনান্ত জুড়ে পরিচালনা করছে শ্রুতিমধুর এক সংগীতের আসর।

শর্মিষ্ঠার কুটিরে কথায় কথায় সন্ধ্যা নামলে ঘরে ফেরার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল শ্রুতি। যদিও পথ বিঘ্নসংকুল নয় তবু শ্রুতিকে একা গৃহে পাঠাল না শর্মিষ্ঠা। পুরু চলল শ্রুতির সঙ্গী হয়ে।

এই প্রথম কথা বলল পুরু, যে কথা আগে কোনওদিনই তার মুখে উচ্চারিত হয়নি। তুমি কত সুন্দর শ্রুতি।

এই আলোছায়ার আলপনা আঁকা পথের চেয়েও?

সে সুন্দর এই আলপনার ভেতর নেই।

খুঁজে দেখো, বনের গাছে গাছে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে আরও কত সুন্দর রয়েছে। সে সুন্দর সত্যিই চোখকে তৃপ্তিতে ভরে দেয় কিন্তু শ্রুতির সৌন্দর্য একেবারে আলাদা।

কী রকম?

শ্রুতির সৌন্দর্য যে-কোনও একটি মনকে সুধায় ভরে দেয়।

হঠাৎ শ্রুতি বলল, আমার মন কেমন করে উঠছে। তোমার কথা শুনে দু'চোখ কেন ভরে উঠল জলে। মনে হচ্ছে একটা ব্যথার ঝড় আমার সারা বুক জুড়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে।

জানো শ্রুতি, একে বুঝি ভালবাসা বলে।

শ্রুতি পুরুর একখানা হাত ধরে তার নিবিড় সান্নিধ্যে যেতে যেতে বলল, এর নাম যদি ভালবাসা হয় তা হলে ভালবাসার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

এরপর বদলে গেল অরণ্যের রূপ। নতুন অর্থ নতুন ভাবনা নিয়ে এল ষড় ঋতু। অরণ্যে ফুল ফুটল শ্রুতির জন্য। সে ফুল নিজের হাতে তুলে শ্রুতির খোঁপায় পরিয়ে দিল রাজকুমার পুরু। সেই মুহূর্তে ফুল আর ফুল রইল না, শ্রুতির কাছে সেই ফুলের আর এক নাম হল ভালবাসা।

দ্বিপ্রহরে প্রখর তপন তাপে যখন চরাচর স্তব্ধ তখন তরু শাখে ঘুঘু ডাকে। সে ক্লান্ত করুণ সুরে একটানা ডেকে যায়। শ্রুতির মনে হয় তারই অন্তরের কান্না যেন ঘুঘুর করুণ সুরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বর্ষার মেঘ বনস্থলীতে নেমে আসে এক বুক কান্না নিয়ে। দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে শুরু হয় অঝোরে বর্ষণ। শ্রুতি কুটিরের নিভৃত বাতায়নে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার দুটি আঁখি নিরন্তর করে চলে অশ্রুপাত।

বসন্তের বনে রঙিন উত্তরীয় ওড়ে। নিজের কুটির থেকে জননী শর্মিষ্ঠার কুটিরে যাবার পথে বারে বারে থমকে দাঁড়ায় শ্রুতি। অরণ্যের আড়ালে থেকে পুরু কি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে তাকে কাছে ডাকছে। সহসা কোকিলের ডাকে এ কার আকুল করা আহ্বান।

জ্যোৎস্না রাতে নিজের শয্যায় শুয়ে ঘুম আসে না পুরুর। অরণ্যের কীটপতঙ্গ শুরু করে দেয় ঐকতান বাদন। মনে হয় কোনও নর্তকী সুরলোক থেকে নেমে এসে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির বনবাসরে।

কাকে দেখে চমকে শয্যায় উঠে বসে পুরু। ওই তো কিংশুক বনে দাঁড়িয়ে আছে সে নর্তকী। জ্যোৎস্নার শুভ্র অঙ্গবাসে তনুদেহটি ঢাকা। কে ওই নর্তকী, নীরবে দাঁড়িয়ে কার কাছে পাঠাচ্ছে তার বাণীহারা ব্যাকুল আহ্বান?

সহসা শয্যা ত্যাগ করে নিশীথে অরণ্যে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো ঘুরে ফেরে পুরু। তার মনে হয় ওই নর্তকী আর কেউ নয়, তারই মানসী শ্রুতি।

দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা পুরুর জননী। রাজগৃহে শৈশবকাল থেকেই তাঁকে শিক্ষা করতে হয়েছে নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা। এই অরণ্যনিবাসে সে বিদ্যা ব্যর্থ হয়ে যেত যদি না শ্রুতিকে শিক্ষার্থিনীরূপে পেতেন জননী শর্মিষ্ঠা। শ্রুতি আজ তাঁরই কৃপায় নৃত্য-পটীয়সী।

একদিন অরণ্যের গভীরে চলে গিয়েছিল শ্রুতি আর পুরু। সেখানে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছিল আশ্চর্য এক লতাবিতান। মাঝে প্রস্তরের মসৃণ এক বেদি। চতুর্দিকে সপ্তপর্ণীর সবুজ

সমারোহ। তাদের প্রসারিত ডাল থেকে শূন্যে দোল খাচ্ছিল মালতীলতার পুষ্পস্তবক। সেই নিভৃত নৃত্য-মণ্ডপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিন নাচের পরীক্ষা দিয়েছিল শ্রুতি পুরুর সামনে।

পুরুর মনে হয়েছিল, যে শ্রুতিকে সে এতকাল ধরে চিনে এসেছে এ সে নয়। ইন্দ্রসভার কোনও সুর-নর্তকী শ্রুতির রূপ ধরে নেচে চলেছে। কী অপূর্ব শিক্ষা শ্রুতির। কে বলবে সামান্য এক উদ্যানরক্ষকের কন্যা সে!

একদিন রানি শর্মিষ্ঠার পূজাগৃহের দেবতার জন্য ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যাচ্ছিল শ্রুতি, পথে দেখা হল পুরুর সঙ্গে।

পুরু বলল, আজ রাজনর্তকীকে দেখছি মালিনীর বেশে। কার কণ্ঠের মালা নিয়ে চলেছ সংগোপনে।

দেবতার।

ভাগ্যবান তোমার দেবতা।

ভগবান কি ভাগ্যবান হন, যে তাঁর সেবা করার সুযোগ পায় সেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে!

দেখি তোমার মালা, কী নিখুঁত গ্রন্থনা তোমার। সাদা লাল হলুদ ফুলগুলি চলেছে যেন শোভাযাত্রায়। বাঃ সবুজ পাতাগুলিকে কেটেছে ঠিক ফুলের মতো করে। তোমার হাতের ছোঁয়ায় ধন্য হল গাছের ফুল।

শ্রুতি বলল, আমরা উদ্যানরক্ষক, মালাকার। গাছের ফুলেই আমাদের সকল কাজ। তাই বৃক্ষ আমাদের চোখে দেবতা। ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি কাননের অভ্যন্তরে। চিনেছি ফুল, লতা, পাতা, অজস্র গাছপালা। আবার যখন তাঁরা ফুল তুলতে গেছেন তখন সাজি নিয়ে ঘুরে ফিরেছি সারা উদ্যানে।

যেদিন নিজে ফুল তুলতে বেরিয়েছি সেদিন প্রথমেই শুদ্ধ হয়েছি স্নান করে। তারপর বৃক্ষের কাছে বাবার শেখানো প্রার্থনা উচ্চারণ করেছি।

হে বৃক্ষদেবতা, তুমি আমার অপরাধ নিয়ো না। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করবার জন্য আমি তোমার শাখার ওই ফুলগুলি প্রার্থনা করছি।

বাবা বলেন, অতি প্রত্যুষে ফুল তুলতে বৃক্ষের কাছে যেতে হয়। সে সময় ভোরের বাতাস বয়ে আসে। শাখা, পত্র, পুষ্প সে বাতাসের স্পর্শে জেগে ওঠে। সে সময় বৃক্ষদেবতার দিকে চেয়ে প্রার্থনা করলে, তার স্পষ্ট সম্মতির ছবিটি দেখা যায়। কখনও ডালগুলি নড়ে ওঠে, কখনও ফুলগুলি ঝরে পড়ে।

পুরু বলল, কেবল তো দেবপূজা নয়, সংসার জীবনে আরও বহু অনুষ্ঠান আছে, সে সকল অনুষ্ঠানের জন্য ফুল সংগ্রহ করতে গিয়ে কি তোমরা একই প্রার্থনা জানাও? না, প্রতি অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা। যেমন বিবাহের অনুষ্ঠানে আমরা বলি আজ ভিন্ন দুটি হৃদয় একত্রিত হচ্ছে। তারা প্রার্থনা করছে তোমার পুষ্পের পবিত্রতা, সৌরভ আর সৌন্দর্য। তারা দুটি হৃদয়ের অক্ষয় বন্ধনের জন্য চাইছে তোমার পুষ্পে গ্রথিত একটি মালিকা। আবার যখন মনুষ্যগণ দেবযান পিতৃযানে গমন করেন তখন প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

হে বৃক্ষদেবতা, ইহলোকে যে দেহধারী তোমার নিত্য কৃপা লাভ করে ধন্য হত, যাকে তুমি

অশেষ করুণায় কাষ্ঠ, পুষ্প, ফলদান করতে, সে আজ পার্থিব সকল বন্ধন ছিন্ন করে ঊর্ধ্বলোকে চলেছে। আজ সেই গতাসুকে তোমার শেষ পার্থিব দানটুকু অর্পণ করো।

শ্রুতি থামল। পুরুর মনে হচ্ছিল, শ্রুতির কণ্ঠ নিঃসৃত কথাগুলি স্তবের মতো উচ্চারিত হচ্ছে।

পুরু কতক্ষণ নীরবে থেকে বলল, তোমার হাতের তৈরি মালা পাবার জন্য দেবতা উৎসুক হয়ে আছেন। তোমার পথ আগলে আর দাঁড়াব না শ্রুতি।

হঠাৎ শ্রুতি আর একটি মালা পত্রপুট থেকে বের করে বলল, তুমি আমার এ মালাটি গ্রহণ করলে আমার আজকের মালা গাঁথা সার্থক হবে কুমার।

কিন্তু শ্রুতি, তুমি তো মালা নিয়ে চলেছ মায়ের মন্দিরে দেবতাকে দেবে বলে।

এক দেবতার মালা আমি রেখে দিয়েছি আমার পত্রপুটে আর এক দেবতা আমার সামনে। পথের দেবতাকে তুষ্ট করেই তো পথ চলতে হয়।

শ্রুতি মালাটা এগিয়ে দিতেই পুরু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কী হল, আমার গাঁথা মালা তোমার পছন্দ হল না?

পুরু হেসে বলল, দেবতা কি নিজে ভক্তের হাত থেকে মালা নিয়ে নিজের গলায় পরে শ্রুতি?

শ্রুতি সংকুচিত হয়ে বলল, কিন্তু রাজকুমারের গলায় মালা পরাই এমন সাহস আমার কই।

আচ্ছা শ্রুতি, দেবতা রাজকুমার না ভেবে আমাকে কি তুমি কেবল তোমার আজন্মের খেলার সঙ্গী ভাবতে পারো না?

সে তো আমার নিত্যদিনের ভাবনা কুমার।

তা হলে সেই সঙ্গীর গলায় কি পরিয়ে দিতে পারো না তোমার মালা?

শ্রুতি এগিয়ে এসে তার কম্পিত হাতে পুরুর গলায় মালাখানা পরিয়ে দিয়ে ত্রস্ত পায়ে পালাতে গিয়ে বাঁধা পড়ল পুরুর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে।

পুরু বলল, একটু আগে দুটি হৃদয়কে মালার বাঁধনে বাঁধার কথা বলছিলে না? তবে মালা পরিয়ে পালাচ্ছ কোথায়?

শ্রুতির চোখে জল ঝরছিল। সে বলল, আমি যখন অবুঝ কিশোরী ছিলাম তখন তোমার সঙ্গে সারা কাননে ঘুরে ঘুরে খেলা করেছি। তখন বুঝিনি তোমার আমার পার্থক্য কোথায়। কিন্তু আজ তরুণী শ্রুতি জানে তার সীমার বাঁধন। তুমি রাজার সন্তান আর আমি অতি সাধারণ এক মালাকারের মেয়ে।

পুরু তেমনই শ্রুতিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে বলল, আমার পিতা মহারাজ যযাতি একথা সত্য হলে আমি যে রাজপুত্র একথা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু শ্রুতি তুমি বলতে পারো, আমার জীবনধারণে, আচরণে কোথাও কি রাজকুমারের পরিচয় আছে?

শ্রুতি পুরুর দিকে অপলকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার আকৃতি, তোমার প্রকৃতি, তোমার ঔদার্য তোমাকে রাজকুমার বলে চিনিয়ে দিয়েছে। আমি একটুও ভুল করিনি কুমার। হীরক থাকে খনির অন্ধকার গর্ভে, তাকে চিনে নিতে রত্নসন্ধানীর কিন্তু কোনও ভুলই হয় না।

তুমি কি তা হলে আমাকে মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখবে শ্রুতি?

কাছে টানি এমন সাহস কই। আবার দূরে সরাই এমন শক্তি নেই।

তুমি মালিনী আর আমি রাজকুমার এমন বিভেদের ছবি কি কোনওদিন ফুটে উঠতে দেখেছ আমার মুখে?

তাই তো আজকাল আমি আরও সংকুচিত হয়ে থাকি কুমার। তুমি যদি পার্থক্যটুকু স্পষ্ট করে তুলতে তোমার আচরণে তা হলে আমার কোনও সংকোচ, কোনও ভাবনাই থাকত না। আমি আমার সোজা পথটা দেখতে পেতাম। কিন্তু তুমি এমন উদার হৃদয় মেলে দাঁড়িয়ে আছ বলেই আমি আমার পথ দেখতে পাচ্ছি না। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

পুরু বলল, আজ থেকে শ্রুতি স্পষ্ট হোক তোমার ধারণা, আমি তোমাদেরই একজন। এর চেয়ে বড় পরিচয় আর আমার কিছু নেই। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার না করো তা হলে পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে। আমার জীবন আমার যৌবন এই মুহূর্ত থেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম শ্রুতি।

আয়ত অপলক দুটি চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। শ্রুতি প্রায় অবরুদ্ধ গলায় বলল, যদি কোনওদিন তুমি এ বনবাসের খেলা ফেলে রাজপুরীতে ফিরে যাও তা হলে কথা দাও এ কাননভূমিতে তোমার শ্রুতিকে রেখে যাবে। শ্রুতি প্রতীক্ষা করে থাকবে তার ভালবাসার ধনের জন্য। সে আসবে অশ্ব ছুটিয়ে কোনও এক সন্ধ্যালগ্নে। তখন একদিকে চলবে সূর্যাস্তের সমারোহ অন্যদিকে সন্ধ্যার আয়োজন। শ্রুতি তার প্রিয়কে সেই লগ্নে বরণ করবে সন্ধ্যাদীপের আরাত্রিকে! অরণ্যের আড়ালে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হবে, পুরু আর তার শ্রুতির পূর্ণ মিলন দেখবে বলে।

তাই হবে শ্রুতি। ভাগ্যচক্রে যদি কোনওদিন রাজপুরীতে যেতে হয় তা হলে তুমি থাকবে এই অরণ্যনিবাসে পুরুর অদ্বিতীয়া হয়ে। আমি আসব আমার শ্রুতির প্রতীক্ষার পথ ধরে। এই নির্জন বনভূমিতে সেদিন হবে আমাদের সর্বোত্তম মিলন।

কে তুমি যুবক?

আমি এই অরণ্যবাসী। আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারানি।

তুমি কী করে আমার পরিচয় পেলে যুবক?

আপনার চতুর্দোলে রাজগৃহের সূর্যলাঞ্ছিত কেতন উড়ছে। মহারানি ছাড়া কার থাকবে ওই চতুর্দোলে আরোহণের অধিকার!

যুবক, তুমি সাধারণ অরণ্যবাসী নও। তোমার তীক্ষ্ণ ধারণাশক্তি আমাকে বিস্মিত করেছে।

আমি অতি সাধারণ মহারানি। যে-কোনও মানুষের পক্ষেই এ ধারণা সম্ভব।

কী নাম তোমার?

পুরু নামেই আমি পরিচিত। কিন্তু মহারানি, কেবল একটি কৌতূহল।

কী সে কৌতূহল?

এ বন প্রদেশে মহারানির কোনওদিনই পদার্পণ হয়নি, আজ তাঁর শুভ আগমনের কারণটুকু জানার কৌতূহল।

মহারাজ গেছেন বন্ধু রাজ্যে মৃগয়ায়, তাই অবসর পেয়ে বহু বর্ষ পরে বাইরে বেরিয়েছি এই বনভূমি দর্শন করতে। এখানে আমার এক দাসী আছে বলে জানি। বহু বহু যুগ পরে তার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চাই।

আপনার দাসী?

হ্যাঁ আমারই দাসী, রাজপুরীতে তাকে না রেখে এই অরণ্যভূমিতেই রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কী নাম তাঁর মহারানি?

শর্মিষ্ঠা। তুমি কি এ অরণ্যলোকে এ নামের কোন রমণীকে চেনো?

অস্ফুটে বলল পুরু, প্রথম আঁখি মেলে তাঁকেই চিনেছিলাম এ জগতে, এখনও প্রতিদিন তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি তবু চেনা আমার শেষ হয়নি।

রানির দিকে চেয়ে সুস্পষ্ট স্বরে বলল, চিনি মহারানি। বহু পরিচিতা তিনি।

শর্মিষ্ঠার কুটিরখানা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারো যুবক? তার জন্যে তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলবে।

কতটুকু পারিশ্রমিক আপনি আমাকে দিতে পারবেন মহারানি?

তুমি কী চাও বলো। আমি 'তাই দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সত্যে বাঁধা পড়লেন কিন্তু মহারানি।

শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী কখনও সত্যভ্রষ্টা হয় না।

আপনাকে আগে পৌঁছে দিই আপনার দাসীগৃহে তারপর আমার পারিশ্রমিক আমি চেয়ে নেব।

বেশ, তাই চলো।

কিছু পথ অরণ্যছায়ে আসার পর পরিচ্ছন্ন কয়েকখানি পর্ণকুটির দেখা গেল। সামনে স্বচ্ছ সলিলা এক সরোবর, কুমুদ কহ্লারে পূর্ণ।

এই আপনার দাসী শর্মিষ্ঠার গৃহ। অনুগ্রহ করে এবার আমার প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক দিন।

বলো কী চাও? আচ্ছা এই নাও আমার বাম অনামিকার রত্ন অঙ্গুরীয়। তোমার প্রত্যাশা যে এতদূর যেতে পারেনি তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

না মহারানি, আমি অরণ্যের অধিবাসী, তাই রত্নের স্বপ্ন আমি দেখি না। আমার পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা একটু ভিন্ন।

বলো কী চাও? এবার তোমার প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করব।

সামনে তাকিয়ে দেখুন, এইমাত্র যিনি দেবালয় থেকে বেরিয়ে এসে আপনাকে সম্মুখে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন বিস্ময়ে, তিনি আমার জননী শর্মিষ্ঠা।

তোমার জননী? শর্মিষ্ঠা তো বিবাহিতা নয়। কী নাম তোমার পিতার?

মহারাজ যযাতি।

যযাতি তোমার পিতা। মহারাজ যযাতি? উচ্চ হাস্যে বিদীর্ণ হল বনভূমি। শর্মিষ্ঠা, আমার পরিচর্যার অঙ্গীকারে নিয়ে আসা হয়েছিল তোমাকে। কিন্তু আমার পরিবর্তে মহারাজই পেলেন তোমার সেবার অধিকার। তা ছাড়া এমনই কায়-মন-প্রাণে মহারাজের সেবা করলে যে তার চমৎকার পুরস্কারও তিনি তোমাকে দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, এখন বলো যুবক কী পারিশ্রমিক তুমি চাও?

দাসিত্ব থেকে আমার মায়ের মুক্তি।

আর কিছু?

না মহারানি।

কিন্তু শোনো যুবক, তোমার জননী দাসিত্ব থেকে মুক্তি পেলেও তোমার পিতার মুক্তি নেই।

শর্মিষ্ঠা আর্তস্বরে বলল, ক্ষমা করো দেবযানী। নিরপরাধ আমাদের মহারাজ যযাতি। নারী আমি, অগ্নিশিখার মতো আকর্ষণ করেছি পুরুষরূপী পতঙ্গকে। তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমি মুক্তি চাই না। তোমার কাছে আবার অঙ্গীকার করছি চির দাসিত্বের।

আবার দীর্ঘ হাসি হাসল দেবযানী। বলল, তোমার সন্তানকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমি আর ফিরিয়ে নিতে পারি না শর্মিষ্ঠা। ফেরালেই সত্যভ্রষ্ট হতে হবে। তবে মহারাজের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা ভুলব না কোনওদিন।

দেবযানী ত্রস্ত পায়ে ফিরে যাচ্ছিল তার চতুর্দোলের দিকে, সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল পুরু।

করজোড়ে বলল, জননী, গৃহে পদার্পণ না করেই কি ফিরে যাবেন?

কর্কশ কণ্ঠে বলল দেবযানী, আমাকে জননী বলে সম্ভাষণ কোরো না যুবক। একজন শঠ, কামাচারীর গোপন খেলা থেকে তোমার জন্ম। তুমি মহারানি বলেই আমাকে সম্ভাষণ করো।

তাই করছি মহারানি। সামান্য পর্ণকুটির থেকেও অতিথি এসে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ।

এ গৃহ তো তোমার নয় যুবক। এ অরণ্য, এ গৃহ রাজ পরিবারের অধিকারে। কেবল দাসী শর্মিষ্ঠাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মাত্র। কল্যাণ অকল্যাণের কোনও প্রশ্নই এখানে ওঠে না।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল পুরু। ক্ষিপ্ত দেবযানী ত্রস্ত পায়ে চলে গেল চতুর্দোলে আরোহণের জন্য।

শর্মিষ্ঠা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, এ তুই কী করলি পুরু। আমার বন্ধন মোচন করতে গিয়ে পিতাকে বাঘিনীর মুখে সমর্পণ করলি?

পুরু স্থিরভাবে বলল, সত্য প্রকাশিত হোক মা। অনন্তকাল মিথ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকার চেয়ে সত্যের উজ্জ্বল আলোকে মুহূর্তকাল থাকাও পরম শান্তির। আর কোনও ভয় নেই মা। সদা ত্রস্ত ভীত হয়ে আর আমাদের প্রতি পল-অনুপল কাটাতে হবে না। সত্যের মুখোমুখি হয়ে বাঁচার শক্তি আমরা অর্জন করেছি।

তোমার মতো সন্তান গর্ভে ধারণ করে আমি গর্বিত পুরু। কিন্তু বারবার আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে মহারাজের মুখ। দেবযানীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত অসহায় হয়ে পড়বেন তিনি। এই দৃশ্য কল্পনা করে আমি চোখের জল রোধ করতে পারছি না বাবা।

ধৈর্য ধরো মা। যিনি সত্যের অধিষ্ঠাতা তিনিই আমার পিতাকে মিথ্যার আবরণ ভেঙে ফেলার শক্তি দেবেন।

আশ্চর্য, রাজা যযাতি মৃগয়া শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে পুরী প্রবেশ না করে এলেন শর্মিষ্ঠার কুটিরে কয়েকটি দিন বিশ্রাম-সুখ ভোগ করতে। এসেই শুনলেন সকল সমাচার।

শর্মিষ্ঠা বলল, ক্ষমা করুন মহারাজ আপনার নির্বোধ পুত্র পুরুকে। জননীর বন্ধন মোচন করতে গিয়ে সে পিতার ভয়ংকর পরিণতির কথা ভাবেনি।

পুরুকে কাছে ডাকলেন মহারাজ যযাতি। মাথায় হাত রেখে বললেন, পুত্র, আজ তুমি আমাকে সকল ভয় থেকে মুক্ত করলে। আমি তোমার কাছ থেকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি লাভ করলাম।

রাজগৃহে ফিরে এলেন মহারাজ যযাতি। অন্তর ভরে আছে তাঁর সত্যের শক্তিতে। সারা দিনমান রাজকার্য সেরে নিশাকালে তিনি প্রবেশ করলেন বিশ্রাম নিকেতনে।

আজ দেবযানীর শয়নকক্ষ বহু দীপালোকে উদ্ভাসিত। পুষ্প দিয়ে সুসজ্জিত রাজশয্যা।

কক্ষদ্বারে এসে দাঁড়ালেন মহারাজ যযাতি।

এগিয়ে এল দেবযানী, আসুন মহারাজ, বীরকে বরণের জন্য সামান্য এ আয়োজন।

তোমার এ আচরণ অস্বাভাবিক দেবযানী।

কেন মহারাজ?

বীর পূজার এ ধরনের অনুষ্ঠান আগে কোনওদিন তোমাকে করতে দেখা যায়নি, তাই বলছি।

মহারাজ, আগে কি এ নির্বোধ দেবযানী জানতে পেরেছিল, মহারাজ যযাতি বহু কীর্তির অধীশ্বর? শুধু পশু নিয়ে মৃগয়াতেই তাঁর কৃতিত্ব নয়, নারীও তাঁর মৃগয়ার অন্যতম লক্ষ।

আমাকে আহত কোরো না দেবযানী।

মহারাজ, মৃগয়ায় যখন ব্যাঘ্র আহত হয় তখন সে কি তার আঘাতকারীকে কাছে পেলে প্রত্যাঘাতের চেষ্টা করে না?

বলো দেবযানী, এমন কোনও মুহূর্তের কথা তুমি স্মরণ করতে পারো যেদিন বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে তোমাকে প্লাবিত করিনি ভালবাসায়? এমন কোনও অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারো যে অনুষ্ঠানে তোমাকে মহারানির মর্যাদায় একান্ত পাশটিতে রাখেনি যযাতি?

স্বীকার করছি মহারাজ।

তবে কেন এই পরিহাস? আরও শোনো, দেশদেশান্তর থেকে শ্রেষ্ঠ রত্ন ব্যবসায়ী এলে সর্বাধিক মূল্যে যে রত্ন আমি ক্রয় করেছি, তা কার জন্য? ওই যে তোমার কণ্ঠে, বাহুতে, কর্ণে আর শিরে মহার্ঘ্য রত্নদীপ্তি, তা কি যযাতির ভালবাসার দান নয়?

সবই সত্য মহারাজ। কিন্তু নারীর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন, পুরুষের হৃদয়। সেই অখণ্ড হৃদয়ের অধিকারী যে নারী, তার কাছে পৃথিবীর সঞ্চিত রত্নের ভাণ্ডারও অতি তুচ্ছ। সে নারী শুধুমাত্র পুরুষের অচঞ্চল হৃদয়টিকে সম্বল করে পথে প্রান্তরে ঝড়ঝঞ্ঝা, দারিদ্র্য মাথায় নিয়ে হাসি মুখে কাটিয়ে দিতে পারে মহারাজ।

তোমার যুক্তি স্বীকার করি দেবযানী। তবুও একবার ভেবে দেখো শর্মিষ্ঠার কথা। সে রাজকন্যা হয়েও সামান্য অপরাধে কী অসামান্য শাস্তি ভোগ করেছে।

মহারাজ দেখছি আগেই সকল সংবাদ অবগত হয়েছেন।

মহারানি, শুধু একটি প্রশ্ন তোমাকে আমি করতে চাই, সত্যিই কি জলাশয়ে নিক্ষেপ করে শর্মিষ্ঠা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?

আপনিই তো আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, একথা কি আজ বিস্মৃত হয়েছেন?

কোনও কথাই আমি ভুলিনি দেবযানী। তোমাদের সেদিনের স্নানলীলা থেকে সব কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তুমি একটা বিবাদের পরিণতিতে আঘাত পেলে এবং মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে পড়লে। এটা আকস্মিক ঘটনামাত্র, কারও ইচ্ছাকৃত বলে আমার মনে হয়নি।

মহারাজ, শর্মিষ্ঠার দোষগুণ বিচারের ভার কি আপনার ওপর ছিল, না সে ঘটনা আপনার রাজ্যে ঘটেছিল?

কোনওটাই নয়, তবে আমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম বলে বিচারের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অধিকার জন্মেছে।

মহারাজ, আমি শর্মিষ্ঠার বিচার নিয়ে নতুন করে কোনও কথাই তুলতে চাই না। শুধু একটি প্রশ্ন, আমার পিতৃগৃহ থেকে আগত দাসী শর্মিষ্ঠার ওপর আমার একান্ত অধিকার আছে কি না?

তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না দেবযানী।

তা হলে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনার অধিকারভুক্ত রাজ্যের কোনও অংশ যদি কেউ কৌশলে আত্মসাৎ করে তা হলে আপনি কি নীরবে তা সহ্য করবেন না শাস্তিবিধান করবেন?

শাস্তিই তার প্রাপ্য।

শর্মিষ্ঠা আমার দাসী, তাকে আপনি সংগোপনে অধিকার ও ভোগ করেছেন, সুতরাং বিচারে শাস্তিই আপনার প্রাপ্য।

অন্তরধর্মে আমি দোষী কি না জানি না.তবে রাজ-ধর্মানুযায়ী আমি অপরাধী। আমি নতমস্তকে মেনে নেব দেবযানী।

না মহারাজ, আমি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামীর বিচার স্ত্রী হয়ে নিজের হাতে আমি করতে চাই না। আপনি চলুন আমার পিতার কাছে। সব কিছু বিচার করে তিনি যা স্থির করবেন তাই আপনাকে মাথা পেতে নিতে হবে। আর বিবাহের সময় পিতার কাছেই তো আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অন্য নারীতে আসক্ত হবেন না বলে।

বেশ, কালই যাত্রা করব তোমার পিতৃগৃহে। সত্যকে আবৃত রেখে যে অন্যায় করেছি তার শাস্তি পাবার জন্য আমি প্রস্তুত দেবযানী।

শুক্রাচার্য বললেন, যদু কোথায়? তাকে তো দেখছি না মা। পিতার মতো বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহুর অধিকারী হয়েছে নিশ্চয়। স্নেহ নিম্নগামী মা। একদিন কন্যাকে আশ্রয় করে যে স্নেহ স্ফুরিত হত তা এখন দৌহিত্রের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। একী মা, তুই কাঁদছিস?

বাবা।

হাহাকার করে কেঁদে উঠল দেবযানী।

কী হয়েছে মা, সত্বর বল? যযাতির কুশল তো?

আবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে উঠল দেবযানী।

কী অঘটন ঘটেছে তার, আমার চিত্ত এই মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠেছে যযাতির জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব খুরধ্বনি শোনা গেল। আশ্রম প্রাঙ্গণে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন রাজা যযাতি।

এই তো যযাতি এসে পড়েছে। এত বিলম্ব তোমার? অবশ্য দ্রুতগামী অশ্ববাহিত রথে দেবযানী পূর্বাহ্ণেই এসে গেছে আশ্রমে।

মহারাজ যযাতি ঋষি শুক্রাচার্যকে প্রণাম নিবেদন করে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অঙ্গনে দাঁড়ালে কেন বৎস, কুটির অভ্যন্তরে এসো। আজ মার্তণ্ডের তাপ বড়ই প্রবল।

আমি অপরাধী মহাত্মন, আপনার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

কী সে অপরাধ যযাতি?

আপনার কন্যা দেবযানীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করুন।

শুক্রাচার্য কন্যার দিকে ফিরে বললেন, রহস্যের আবরণ আমার আঁখির সম্মুখে না রেখে সত্য যা তাকে প্রকাশ করো।

দেবযানী আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে বলল, বাবা, শর্মিষ্ঠা আজ আমার সপত্নী। শুধু তাই নয়, সে পুরু নামে এক পরম সুন্দর পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে।

যযাতি—

শুক্রাচার্যের ক্রুদ্ধ গর্জনে আশ্রমের বায়ুমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বাক্যহীন রাজা যযাতি দাঁড়িয়ে রইলেন নতমস্তকে।

উঃ, আমার বুকের অস্তিগুলো যেন চূর্ণ হয়ে গেল মা।

বাবা, মহারাজ অন্যায় আচরণ করেও অনুতপ্ত নন। তাঁর অভিমত, শর্মিষ্ঠার প্রতি আমরা সুবিচার করিনি। তার জীবনকে আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি।

শুক্রাচার্য বললেন, সে ব্যর্থ জীবনকে তুমি পূর্ণ করে দিয়েছ, তাই না কামমোহিত রাজা। যৌবনকে যে নরাধম সংযত করতে জানে না, যৌবনের আঘাতেই তাকে একদিন ধ্বংস পেতে হয়। তুমি শুধু সত্য গোপন করে গর্হিত কাজই করোনি, তুমি বিবাহের কালে যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছিলে তাকেও ভঙ্গ করেছ। তুমি শুক্রাচার্যের প্রসন্ন মূর্তি দেখেছ, তার রুদ্ররূপ দেখোনি। মিথ্যাচারী, কামার্তের বিরুদ্ধে সে যে কত নির্মম হতে পারে আজ তার পরিচয় তুমি পাবে পাপিষ্ঠ।

মস্তক আরও নত হল রাজা যযাতির।

শুক্রাচার্যের আঁখিতে অগ্নি জ্বলে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, যে অগ্নির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি দেবযানীকে একমাত্র পত্নী বলে অঙ্গীকার করেও যৌবনের তাড়নায় সত্যভ্রষ্ট হয়েছ, সেই অগ্নি তোমার যৌবনকে ধ্বংস করুক। শিথিল জরা গ্রাস করুক তোমার সর্বাঙ্গ।

দেখতে দেখতে সূর্যগ্রাসের মতো জরারূপ রাহু গ্রাস করতে লাগল রাজা যযাতির যৌবন-দীপ্তি। বিরল হয়ে শুভ্রবর্ণ ধারণ করল কেশগুচ্ছ। স্খলিত হল দন্তপংক্তি। বিবর্ণ আর লোল হয়ে গেল গাত্রচর্ম। ক্ষীণ হয়ে গেল দৃষ্টি। কম্পিত হতে লাগল যযাতির কলেবর।

আর্ত হাহাকার বেরিয়ে এল যযাতির কণ্ঠ থেকে, প্রভু, রাজ্যতৃষ্ণা, দেহতৃষ্ণা, সম্পদতৃষ্ণা এখনও আমার অন্তরকে অধিকার করে আছে, আপনি আমাকে জরা থেকে মুক্তি দিন। না হলে মৃত্যু দিন প্রভু, আমি সানন্দে বরণ করব।

শুক্রাচার্যের নয়নের দীপ্ত-অগ্নি সহসা স্তিমিত হতে হতে নির্বাপিত হল। প্রশমিত হল ক্রোধ। ধীর কণ্ঠে বললেন, তপস্যাসিদ্ধ পুরুষের বাক্য ব্যর্থ হবার নয়। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার জরা গ্রহণ করে তার যৌবন দান করে তবে তুমি পুনরায় পূর্বাবস্থা ফিরে পাবে। আবার ইচ্ছা করলে তুমি তোমার যৌবন জরা-গ্রহণকারীকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

দেবযানী দুই করে আঁখি আবৃত করে অস্ফুটে উচ্চারণ করতে লাগল, উঃ কী পরিণতি।

৩

দানবরাজ বৃষপর্বার কাননভূমি থেকে জলপানের পর বেরিয়ে এলেন জরাগ্রস্ত রাজা যযাতি। অতি কষ্টে অশ্বারোহণ করে ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে।

যযাতির পরিণতি দেখে স্তম্ভিত হল প্রজাকুল। কিন্তু মহাশক্তিধর শুক্রাচার্যের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করার সাহস পেল না কেউ।

প্রতিদিন জরাগ্রস্ত রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিক্রমা করতে লাগলেন। কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে যৌবন।

একদিন বৃক্ষতলে এক অন্ধ যুবককে ভিক্ষা করতে দেখে রাজা এগিয়ে গেলেন তার পাশে। বললেন, তোমার প্রাণ-ধারণের উপায় কী যুবক?

ভিক্ষাবৃত্তি।

ভিক্ষাবৃত্তিতে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়?

অতি কষ্টে।

তুমি কি জন্মান্ধ?

হ্যাঁ মহাশয়।

রাজা ভাবলেন, যেহেতু জন্মান্ধ সেই হেতু দেহের যৌবন সৌন্দর্য ও দীপ্তি সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। রাজা তাই বললেন, তোমার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যবস্থাই রাজবাড়ি থেকে হতে পারবে, এমনকী প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠও তোমার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, শুধু একটি শর্তে।

কী শর্ত প্রভু?

তুমি তোমার এই যৌবন দান করবে এক জরাগ্রস্তকে আর গ্রহণ করবে তার জরা।

জরা গ্রহণের অর্থ কী প্রভু?

তুমি বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলে অন্ধ ধীরে ধীরে বলল, মহাশয়, অপরাধ নেবেন না। প্রায় একযুগ আগে এই বৃক্ষতলে এসে দাঁড়িয়েছিল দুটি তরুণী। তাদের কথার স্বরে আমি তাদের বয়স অনুমান করেছিলাম। তারা পরস্পরের ভেতর অনুচ্চে কথার আদান প্রদান করছিল। আমি অন্ধ হলে কী হবে শ্রবণশক্তি আমার অতিশয় তীক্ষ্ণ। তাদের কথা থেকে জানতে পারলাম তারা আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। আমার অন্ধত্বের জন্য তারা আক্ষেপ করছিল। চলে যাবার সময় তারা আমার ভিক্ষাপাত্রে দুটি মুদ্রা ফেলে দিয়ে যায়। মহাশয়, আমি দারিদ্র্যের শত নির্যাতনেও সে দুটি মুদ্রা ব্যয় করিনি। যারা আমাকে সুন্দর বলেছিল তারা যদি আবার

কোনওদিন এ পথে আসে তাই এই পথের ধারের বৃক্ষতল পরিত্যাগ করে আমি ভিক্ষাবৃত্তির জন্য আর কোথাও যাই না। মহাশয়, বৃদ্ধ করুণা পেতে পারে, ভালবাসা নয়।

অন্ধ তার শতছিন্ন পোশাকের ভিতর থেকে দুটি মুদ্রা বের করে রাজা যযাতির চোখের সামনে মেলে ধরল।

অন্যদিন পথের মাঝে কোলাহল শুনে ছদ্মবেশী রাজা যযাতি থমকে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, একটি যুবা পুরুষকে শৌণ্ডিকালয়ের সামনে ক'টি লোক ধরে নির্মমভাবে প্রহার করে অশ্লীল গালাগাল করছে। মহারাজ যযাতি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, যুবকটি পানাসক্ত। পতিতালয়ে যাবার অভ্যাসও তার প্রবল। সে যখন সুরাপান আরম্ভ করে তখন তার অবস্থা ছিল সচ্ছল। এখন কপর্দকহীন, বহু ঋণগ্রস্ত। শুঁড়িখানায় তার ঋণ সবচেয়ে বেশি, তাই তাকে বাগে পেয়ে প্রহার করা হচ্ছে।

মহারাজ যযাতি ভাবলেন, এই সুযোগ। তিনি প্রহার বন্ধ করতে বলে যুবকটির সমস্ত ঋণ শোধ করে দিলেন। যুবকটি পদতলে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, যযাতি তার হাত ধরে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত রাজা যুবকের হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন এক নির্জন স্থানে। বললেন, আমি যা জিজ্ঞেস করব তার সত্য উত্তর দিতে হবে।

বলুন মহাত্মন। আপনি আমার প্রাণদাতা, আপনার কাছে যথার্থ উত্তরই দেব।

তোমার গৃহে কে আছেন?

আমার স্ত্রী আর শ্বশ্রূমাতা।

তাঁদের কাছে তোমার কীরূপ সমাদর?

পানাসক্ত বলে আমাকে প্রথমে ধিক্কার দিত, এখন আর বহুকাল যাবৎ গৃহে প্রবেশ করতে দেয় না।

মহারাজ বললেন, তোমার পানভোজনের সকল ব্যবস্থাই আমি করে দিতে পারি।

যুবক এবার কোনও বাধা না শুনে মহারাজ যযাতির পদধূলি গ্রহণ করল।

যযাতি বললেন, এর জন্য তোমাকে একটি শর্ত পালন করতে হবে।

কী শর্ত মহাশয়?

তোমার ওই যৌবন একটি মানুষকে দান করতে হবে।

তা হলে আমি বেঁচে থাকব কী করে?

বেঁচে থাকবে, তবে জরা গ্রহণ করে।

যুবকটি হেসে উঠল। শেষে বলল, আশ্চর্য কথা শোনালেন মহাশয়। যদি দেহখানা জরাতেই পঙ্গু হল, তা হলে সুরাপান করব কী করে। তা ছাড়া লোলাঙ্গী রয়েছে, সে তো শিউরে উঠবে আমাকে দেখে।

লোলাঙ্গী কে?

সে আমার নাগরী। বড় ভালবাসে আমাকে।

কিন্তু সে তো লোলাঙ্গী। তার অঙ্গের চর্মও তো লোল হয়ে পড়েছে।

না, না মহাশয়, নগরে সে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা যুবতি বারাঙ্গনা। নামেই শুধু লোলাঙ্গী।

তোমাকে বিত্তহীন জেনেও সে ভালবাসে?

ভালবাসে মানে, সে ভালবাসার তুলনা হয় না। নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে কখনও পাইনি এত ভালবাসা। স্ত্রী তো স্বামীর সঙ্গে স্বার্থে বাঁধা। এই দেখুন না বিত্ত নেই বলে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু লোলাঙ্গী কখনও আমাকে ভর্ৎসনা করে না, বিতাড়ন তো দূরের কথা। সে আমাকে বিনামূল্যে এখনও উৎকৃষ্ট সুরা পরিবেশন করে।

কিন্তু যুবক, শুনেছি বারাঙ্গনারা বিত্তের বিনিময়েই কেবল আপ্যায়ন আর দেহদান করে, তোমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটতে দেখছি। এর কারণ কী?

মহাশয়, সত্য বলি, আমাকে দেখে ও আনন্দ পায়। ও বলে, আমার দেহ নাকি নবীন মেঘের মতো নব যৌবনের সুধারসে ভরা। নিশা তৃতীয় প্রহরের আগে সমস্ত অতিথিকে তার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে হয়। তারপর সে স্নান করে নববস্ত্র পরিধান করে। আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করলে লোলাঙ্গী প্রদীপ হস্তে আমাকে প্রদক্ষিণ করে। এরপর আসন পেতে আমার পানভোজনের ব্যবস্থাদি করে দেয়। শয্যায় আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রেখে বলে, তুমি আমার সত্যিকারের প্রার্থিত পুরুষ। তুমি অনন্ত যৌবনের অধিপতি।

রাজা শেষবারের মতো বহির্গত হলেন যৌবনের অন্বেষণে। বহুক্ষণ নগরে পরিভ্রমণ করে এমন কোনও যুবকের সন্ধান পেলেন না যার কাছে যৌবন প্রার্থনা করা যায়।

তিনি লোকালয়ে অতিকষ্টে পদব্রজে হেঁটে চললেন। এখন তাঁর চোখে পড়তে লাগল বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তীব্র তাপ প্রবাহের পর ক'দিন ধরে শুরু হয়েছে বর্ষণ। দীর্ণ দগ্ধ খেতের দীর্ঘশ্বাস ঘুচে গিয়ে এখন শান্তিরস পানে স্নিগ্ধ হয়েছে কৃষিভূমি। স্থানে স্থানে কৃষকের হলকর্ষণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হওয়ায় সম্ভবত কৃষকেরা কর্ম পরিত্যাগ করে স্নানাহারের জন্য চলে গেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর অতিক্রম করে এসে মহারাজ যযাতি দেখতে পেলেন, কয়েকটি আম্রবৃক্ষ কুঞ্জ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষগুলি রৌদ্রতপ্ত ধরিত্রীর বুকে বিছিয়ে রেখেছে ছায়ার আঁচল।

ক্লান্ত শ্রান্ত যযাতি উপস্থিত হলেন সেখানে। মনে মনে অভিপ্রায়, কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন আম্রকুঞ্জ ছায়ায়।

পাশে এসে চমকিত হলেন। বিলুপ্তপ্রায় আশাটি তাঁর আবার বলবতী হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন, বৃক্ষের ছায়ায় এক যুবক বসে প্রান্তরের শেষ সীমার দিকে তাকিয়ে আছে।

রাজা যযাতি তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহ পথশ্রমে ক্লান্ত ও ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল।

একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে কৃষক যুবকটি উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে বলল, কী উদ্দেশ্যে আপনার এখানে আগমন? ইচ্ছা হলে এই তৃণভূমিতে বসে আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন।

রাজা যযাতির সত্যিই বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তিনি অতি ভদ্র কৃষক যুবকটির হাত ধরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে বসে পড়লেন।

কিছু সময় পরে শ্রান্তি দূর হলে মহারাজ বললেন, অদূরেই হল-বলীবর্দ দেখে অনুমান করতে পারছি, তুমি কৃষক।

হ্যাঁ, প্রভু।

এ অঞ্চলের সীরপতি কে?

প্রভু অংশুমান।

তোমার প্রাপ্য শস্য থেকে সংসারযাত্রা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়?

প্রভু, আমরা চিরদিনই অভাবগ্রস্ত। খাদ্যের সংস্থান হলে বস্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়, আবার পরিধেয় সংগ্রহ করতে গেলে খাদ্যে টান পড়ে।

আচ্ছা, যুবক, তোমাকে কেউ যদি বহু অর্থ একসঙ্গে দান করে তা হলে তুমি কী করবে?

গরিবকে পরিহাস করছেন প্রভু?

না বৎস, যথার্থই বলছি। এখন বলো, তুমি কী করবে?

অভাবে পড়ে কিছুকাল আগে একটি বলীবর্দকে সামান্য বিত্তের বিনিময়ে প্রতিবেশীর কাছে বন্ধক রেখেছি। বিত্ত সংগ্রহ করতে পারলেই বলীবর্দটিকে আমি মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারি।

ওই বলীবর্দটি না থাকায় তোমার কৃষিকার্যে মনে হয় খুবই অসুবিধা হচ্ছে?

না প্রভু, কথাটি ঠিক তা নয়। ওই বলীবর্দটি একসময় কৃষিকর্মে খুবই পরিশ্রম করেছে কিন্তু ইদানিং সে বিশেষ কাজ করতে পারছিল না। বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় তার কর্মশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছিল। আমি বুঝেসুঝে তাকে লঘু কাজে নিযুক্ত করতাম। কিন্তু আমার প্রতিবেশীটি ওই বৃদ্ধ বলীবর্দটিকে দিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সে এখন মৃতপ্রায়। আমার সঙ্গে পথে দেখা হলে সেই বলীবর্দটির চোখ বেয়ে জল পড়ে। আমি তার কষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারি না প্রভু। আমার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, কী কুকর্মই না আমি করেছি। অভাবের দায়ে এ যে পিতামাতাকে বিক্রয় করে দেওয়ার মতো হল।

বৃদ্ধ জীবের প্রতি তোমার দয়া দেখে মনে হয় তুমি বৃদ্ধ মানুষকেও ভালবাসো?

আমার বহু বৃদ্ধ পিতামহ সম্প্রতি গতায়ু হয়েছেন। আমার পিতৃদেব আগেই কালগ্রাসে পড়েছিলেন। তাই আমারই ওপর ভার পড়েছিল আমার পিতামহের সেবার।

তোমার সেবায় তোমার বৃদ্ধ পিতামহ নিশ্চয়ই সুখে ছিলেন।

তিনি আমাকে প্রায়ই আশীর্বাদ করতেন। তবে প্রভু, বৃদ্ধ অবস্থায় কেউ সুখী নয়।

কেন এ কথা বলছ যুবক? যদি বৃদ্ধ তোমার মতো ভক্তিভাজনের কাছ থেকে সেবা পায়? যদি তার বিত্তের অভাব না থাকে? তবেও কি সে ব্যক্তি অসুখী?

প্রভু, আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে কী বোঝাব! বিত্তের বিনিময়ে কি সত্যিকারের সুখ কেনা যায়।/আপনার মনের মধ্যেই সুখের জন্ম, আবার অসুখেরও উৎপত্তি মন থেকে। যে কথা বলছিলাম, বৃদ্ধ মানুষের সুখ কই? সংসারে সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে। যে সেবা সে পায়, সেটা ভালবাসার টানে যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি কর্তব্যের টানে। বড় মানুষের অনেক বিত্ত থাকে। তিনি বৃদ্ধ হলে অনেকেই তাঁর সেবা করতে এগিয়ে আসে। সেখানে ভক্তি ভালবাসার টানে খুব কম লোকই আসে, বিত্তের দিকেই তাদের নজর থাকে বেশি। আর তা ছাড়া বৃদ্ধের কত দুঃখ। সকলেই তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়। বৃদ্ধ অবস্থায় বেশি কথা বলার কিংবা উপদেশ দেবার ইচ্ছা প্রবল হয়। অবশ্য তার একটা কারণও থাকে। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। তাই বৃদ্ধেরা বয়ঃকনিষ্ঠদের সংসারজীবনে চলার উপদেশ দিতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য, খুব কম লোকই বৃদ্ধের কাছে বসে তার উপদেশ গ্রহণ করে।

একটুখানি থেমে বহুদর্শী কৃষক যুবকটি আবার তার কথা শুরু করে। দেখুন বার্ধক্যে

মানুষের লোভ প্রবল হয় কিন্তু সে তুলনায় তার পরিপাক ক্ষমতা থাকে না, তাই দেহের অশান্তি ঘটে। বিত্ত থাকলে ভোজ্যবস্তুর প্রাচুর্য থাকতে পারে কিন্তু অধিক আহার গ্রহণে অপারগ বলে সে প্রাচুর্যের কোনও মূল্য থাকে না। বৃদ্ধ ছয়টি ঋতু উপভোগ করতে পারে না। মনে উপভোগের বাসনা থাকলেও দেহ অশক্ত হয়। প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরা প্রায়শই কাতর হয়ে পড়ে, তারা বায়ু পিত্ত কফের অধীন হয়।

বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন মহারাজ যযাতি। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, এ যুবক কখনও যৌবনে জরা গ্রহণ করবে না। তিনি উত্থানের আগে বললেন, বৃদ্ধের সম্বন্ধে তুমি এত কথা জানলে কী করে যুবক?

প্রভু, আমার জ্ঞানী পিতামহ এসকল কথা আমাকে বলে গেছেন। আমি নিষ্ঠাবান শ্রোতার মতো তাঁর প্রতিটি কথা শুনেছি।

আচ্ছা যুবক আর একটি প্রশ্ন জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। তুমি যৌবনকে কী দৃষ্টিতে দেখো?

যৌবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার প্রভাব অসীম। যৌবন দেহে এলে মানুষের মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনও কাজ নেই যা সে করতে পারবে না। আর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আসে ভালবাসা। সেই ভালবাসা যদি আর একটি হৃদয়ে তার আশ্রয় পায় তা হলে দীন দরিদ্রও মনে করে সে সম্রাট যযাতি।

বিস্ময়ে চমকে উঠে দাঁড়ালেন যযাতি। যুবক কি তাঁকে চিনতে পেরেছে নাকি। না, যুবকের ভাবে তা মনে হল না। তিনি উঠে দাঁড়াতেই যুবকটি তাঁকে নত হয়ে নমস্কার করল।

মহারাজ যযাতি যুবকের হাতে ছোট্ট একটি রত্নের থলি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, প্রথমে তুমি তোমার ওই বৃদ্ধ বলীবর্দটিকে উদ্ধার করবে। সে যতকাল জীবিত থাকবে ততকাল তাকে তোমার সেই জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহের মতো যত্নে প্রতিপালন করবে। তারপর বাকি অর্থ ব্যবহার করবে তোমার ও তোমার ভালবাসার পাত্রীর অভিরুচি অনুযায়ী।

কিন্তু প্রভু, আমার একটি প্রার্থনা আছে।

বলো কী প্রার্থনা?

প্রভু, আমি বিত্তহীন। বিত্তহীনকে বিত্ত দিলে তার চরিত্রের স্থিতি থাকে না। আপনি অযাচিতভাবে আমাকে যে দান দিতে চাইছেন তা ফিরিয়ে দিয়ে আপনার অসম্মান করতে চাই না। তবে আপনি এ ধনের সবটুকু না দিয়ে ওই বলীবর্দটির মুক্তি ও প্রতিপালন বাবদ যা প্রয়োজন তাই দিলে কৃতার্থ হই।

রাজা যযাতি নির্লোভ যুবকের কথা রক্ষা করে তাঁর বিবেচনা মতো ধন দান করলেন।

মহারাজ যযাতি সেই থেকে প্রাসাদে নিজেকে বন্দি করে রাখলেন, যৌবন ক্রয়ের জন্য প্রাসাদের বাইরে আর বেরোলেন না।

একদিন প্রাসাদের শীর্ষে আরোহণ করে চতুর্দিকের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন রাজা যযাতি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল, তাঁরই প্রিয় অশ্বটির ওপর আরোহণ করে দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র যদু রাজ উদ্যানে ভল্ল নিক্ষেপের কৌশল অভ্যেস করছে।

রাজা যযাতি নিম্নে অবতরণ করে উদ্যানে যদুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

যদু পিতাকে দেখে অশ্ব থেকে অবতরণ না করে অশ্বারোহণেই এগিয়ে এল।

মহারাজ যযাতি ইঙ্গিতে যদুকে অশ্ব থেকে অবতরণ করতে বললেন। যদু অবতরণ করলে মহারাজ তাকে সপ্তপর্ণী বৃক্ষের তলায় বাঁধানো বেদিতে এনে বসালেন। নিজে তার পাশে বসে বললেন, যদু, তুমি আমার প্রথম সন্তান, তোমার ওপর দাবি আমার সবচেয়ে বেশি। একটি অনুরোধ তোমাকে আমি জানাতে চাই পুত্র।

কী এমন অনুরোধ পিতা?

তোমার জননীর অভিযোগ শুনে তোমার মাতামহ ঋষি শুক্রাচার্য আমাকে অভিশাপ দেন, যার ফলে আমি আজ অকালে জরাগ্রস্ত। কেউ যদি আমার এ জরা গ্রহণ করে তার যৌবন আমাকে দান করে তা হলে আমি পুনঃযৌবন লাভ করতে পারি। তুমি কি পুত্র তোমার ওই যৌবন আমাকে দান করতে পারো?

অসম্ভব একটি কথা আপনি উচ্চারণ করলেন পিতা। কেউ কি কোনও কিছুর বিনিময়েও তার যৌবনকে ত্যাগ করতে পারে?

যদু, আমি কিছুকাল জরাগ্রস্ত হয়ে রাজ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলাম, যার ফলে রাজ্যের কোনও কোনও অংশে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ায় সেই সব বিশৃঙ্খলা দমন করতে পারছি না। তাই তোমার কাছে যৌবন দানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলাম।

পিতা, আপনার আর উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ নেই। মাতামহ আমার কাছে গোপন সংবাদ পাঠিয়ে বলেছেন, রাজ্য শাসনের জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হও।

মহারাজ যযাতি অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তাই বুঝি আমার অশ্বে আরোহণ করার সময় আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধ করোনি?

যদু মাথা উঁচু করেই বলল, আমি ভাবতে পারিনি পিতা যে মহারাজের অশ্ব ব্যবহার করতে হলে অনুমতি নিতে হয়।

মহারাজ যযাতি বললেন, উত্তম, এখন তুমি এখান থেকে চলে গিয়ে আমাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও।

যদু পিতার আদেশ অমান্য করার সাহস পেল না, কিন্তু যাবার সময় দৃপ্ত পদক্ষেপে উদ্যান পরিত্যাগ করল।

রাজপ্রাসাদের এক প্রান্তে শর্মিষ্ঠা এবং তার সন্তান পুরুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘটনাটি সবার গোচরে আসার পর দূর বনপ্রদেশে মাতাপুত্রকে নির্বাসিত রাখার আর কোনও সার্থকতা ছিল না। তাই স্বয়ং রাজা যযাতি তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন রাজপুরীতেই।

যদুর কাছে যৌবন প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হবার পর রাজ্য চললেন কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর কাছে।

পিতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে পুরুর সামনে এসে দাঁড়াতেই পুরু তাঁকে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল। জরাগ্রস্ত যযাতি এইমাত্র যদুর কাছে আহত হয়ে এসেছিলেন, তিনি পুরুর আচরণে অভিভূত হয়ে তাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন।

রাজা উপবেশন করলে পুরু তাঁর চরণতলে আসন গ্রহণ করল।

রাজা যযাতির দিকে তাকিয়ে পুরু একসময় বলল, পিতা আমার অপরাধ নেবেন না, আজ আপনাকে বড় বেশি চিন্তাক্লিষ্ট আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

আমি যথার্থই ক্লান্ত পুত্র।

জরাগ্রস্ত হবার পর আপনি কি দেহে অসুস্থতা অনুভব করছেন?

দেহে যত নয় পুত্র, মনে। স্বাভাবিক নিয়মে যাদের জরা আসে, ধীরে ধীরে তাদের মন ও দেহ সমতা রক্ষা করে চলে, কিন্তু অকালে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লে দেহের সঙ্গে মনের মিলন ঘটে না। আর তখনই শুরু হয় মানসিক যন্ত্রণা।

পুরু শান্ত কণ্ঠে বলল, পিতা, আপনার জরাক্রান্ত দেহের কথা ভেবে জননী প্রায় প্রতি মুহূর্তে অশ্রু বিসর্জন করেন।

আমি জানি পুরু। শর্মিষ্ঠার অন্তর আমার দুঃখে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় তোমার জননী? ডাকো তাঁকে। আজ আমার এ শোকের তিনিই একমাত্র সান্ত্বনা।

জননী মাতুলালয়ে গেছেন পিতা। এ সংবাদ একান্ত গোপনীয় থাক, এই ছিল তাঁর অভিলাষ।

কিন্তু পুত্র, আমি তাঁর জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এদিকে শুক্রাচার্যের আশ্রমে গেছেন দেবযানী। বহুবর্ষ পরে বৃষপর্বার রাজ্যে দু'জনে মুখোমুখি হলে কোনও সংঘর্ষ আবার না বেধে যায়।

আপনি চিন্তিত হবেন না পিতা। অন্যায় কোনও সংঘটনে লিপ্ত হয়ে পড়বেন না আমার জননী।

শর্মিষ্ঠার চরিত্র আমার অজানা নয় পুত্র। তবে শর্মিষ্ঠা স্পষ্টবাদিনী, এখানেই আমার সংঘর্ষের আশঙ্কা।

পুরু এবার প্রশ্নান্তরে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কি অনন্তকাল এই ধরাধামে জরাগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে পিতা?

জানি না, বিধাতাপুরুষের কী অভিপ্রায়। যদি আমার দেহের অবসান হত তা হলে আমি মুক্তি পেতাম পুরু। কিন্তু দেহ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, শক্তি নেই, এ যে অসহনীয় পুত্র।

আমি মাতৃমুখে শুনেছি, কেউ যদি আপনার জরা গ্রহণ করে তা হলে আপনি ফিরে পাবেন আপনার যৌবন-শক্তি।

হাসলেন রাজা যযাতি। বড় করুণ, বড় বেদনার্ত সে হাসি। বললেন, শুক্রাচার্য অতি বিচক্ষণ। তিনি অভিশাপ দিয়ে অভিশাপ মুক্তির যে পথটি বলেছেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনই অসম্ভব। যদি কেউ তার যৌবন দান করে জরা গ্রহণ করে তবেই কেবল আমি আমার স্বরূপ ফিরে পেতে পারব। কিন্তু পুরু, পৃথিবীতে এমন কাঙাল কি কেউ আছে যে সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনিময়েও তার যৌবন বিক্রয় করতে পারে? নেই, কেউ নেই। আমি সামান্য ভিক্ষাজীবী থেকে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষের কাছে নানাভাবে আমার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন ভাগ্যকে মেনে নিয়ে শেষ পরিণতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই পুরু।

রাজা যযাতির শেষ বাক্যটি বহির্গত হল একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। আর সেই দীর্ঘশ্বাস গিয়ে বাজল তরুণ যুবা পুরুর কোমল বুকে।

পিতা, একটি প্রার্থনা আছে।

কী প্রার্থনা পুত্র?

আমার এই সামান্য যৌবন আমি আমার জন্মদাতা পিতাকে অর্পণ করে ধন্য হতে চাই।

পুরু! আমি কাঙালের মতো পথে প্রান্তরে যৌবন ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর দরিদ্রতম ভিখারি হলেও আমি তোমার কাছ থেকে যৌবন ভিক্ষা করতে পারব না পুত্র।

পিতা, আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য হতে দিন। যে দেহ একদিন আপনার কাছ থেকে আমি পেয়েছি সেই দেহ আপনার সেবায় সমর্পিত হোক। জ্ঞানীরা বলেন, পুত্রের মধ্যে পিতা নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন, নিজেকে রক্ষা করেন। আমি বিশ্বকে বলে যেতে চাই, পুত্র আপন স্বরূপকে যথার্থ করে দেখতে পায় পিতার লীলার মধ্য দিয়ে। আপনি আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না পিতা।

পুরু, আমার পুত্র, তোমার এই ত্যাগ সারা বিশ্বে অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে। দাতা জগতে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু আপন যৌবন দান করে স্বেচ্ছায় জরা গ্রহণ করার মতো দাতা বিশ্বে সুলভ নয়।

কেবল একটি মিনতি পিতা, আমাকে সামান্য কিছু সময় বাইরে যেতে দিন। ফিরে এসে সানন্দে যৌবন দান করে আমি আপনার জরা গ্রহণ করব।

সেই পরিত্যক্ত কাননভূমিতে পুরু দ্রুতগামী অশ্বারোহণে উপস্থিত হল। উদ্যানরক্ষক দেবলের কুটির সম্মুখে তখন অপরাহ্নের ছায়া। অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল পুরু। কুটির-দ্বার বাইরে থেকে রুদ্ধ। কোথায় গেল বনবাসীরা!

অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিল পুরু রাজপুরীর দিকে। পিতা প্রাসাদে অপেক্ষা করে আছেন তার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে।

পুরু একবার তাদের পরিত্যক্ত কুটিরটি দেখার জন্য অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করল। আম্র, পলাশ, শিমুল বৃক্ষগুলি তখন শেষ সূর্যের সোনায় স্নান করছিল। প্রথম বসন্তের মঞ্জরী থেকে মধু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল মধুকরের দল।

ওই তো তাদের কুটির। অশ্ব থেকে অবতরণ করে পুরু ধীরে ধীরে অগ্রসর হল। কুটির প্রাঙ্গণে পা দিয়েই তার মনে হল, এ যেন পরিত্যক্ত কোনও গৃহের অঙ্গন নয়। কুটিরবাসীরা সযত্নে পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের পরিবেশ।

গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল। পুরুর মনে হল, গৃহবাসীরা গৃহত্যাগ করে চলে গেলে দ্বার উন্মুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। পুরু শৈশব, কৈশোর, যৌবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করল।

আশ্চর্য, অগ্নিগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছে শ্রুতি, হাতে তার জননী শর্মিষ্ঠার ব্যবহৃত পঞ্চ প্রদীপখানি। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ নিয়ে পুরুর সামনে বিস্মিত শ্রুতি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। ক্ষণকাল মাত্র। পর মুহূর্তে হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে শ্রুতি বেরিয়ে গেল দেবগৃহের দিকে।

বেশ কিছু সময় পরে যখন ফিরে এল পূজা সাঙ্গ করে তখন পুরু নেমে এসে দাঁড়িয়েছে গৃহ প্রাঙ্গণে। অস্তসূর্যের রক্ত আভা তার ললাট আর মুখমণ্ডল প্লাবিত করে গড়িয়ে পড়ছে।

শ্রুতি করজোড়ে নমস্কার করে বলল, কী মনে করে রাজকুমার?

তোমার কাছে এসেছি শ্রুতি। কিন্তু এই পরিত্যক্ত গৃহে কেন? তোমাদের উদ্যান-গৃহ দেখলাম বাইরে থেকে অর্গলবদ্ধ।

মা-বাবা গেছেন মাতুলগৃহে। গঙ্গাদর্শন ও স্নান করে ফিরবেন পক্ষকাল পরে। তাই দু'খানি গৃহই সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়েছে আমার ওপর।

এ তো পরিত্যক্ত গৃহ শ্রুতি। এর পরিমার্জনের প্রয়োজন কী?

এখানে আমি দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছি কুমার। ও গৃহটি আমার আবাসভূমি, এ কুটির আমার দেবমন্দির।

তুমি তোমার সখা পুরুকে আজও মনে রেখেছ শ্রুতি?

কোনও কথা না বলে শ্রুতি আনত করল তার মুখখানি।

পুরু শ্রুতির মুখ দুই করে তুলে ধরতেই শ্রুতির আয়ত চোখ থেকে অজস্র অশ্রুর ফুল ঝরে পড়তে লাগল পুরুর অঞ্জলিপুটে।

পুরু বলল, বিরহের অশ্রুতে স্নান করে প্রেম পবিত্র হয় শ্রুতি। আমাদের দীর্ঘ অদর্শন তোমার আমার ব্যথার প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছে।

শ্রুতি অশ্রু বস্ত্রাঞ্চলে মুছে নিয়ে বলল, আমি জানি, রাজকুমার পুরু আমার স্বপ্নের ধন। তাই তাকে স্বপ্নের ঠাকুর করে রেখেছি আমার মন্দিরে। বিরহে যত অশ্রু ঝরে, স্মৃতির আনন্দ তাকে মুছে দিয়ে যায় বারবার। আমার ঠাকুর নিয়ে এই কান্নাহাসির খেলা চলেছে নিত্যদিন।

পুরু বলল, আজ আমি আমার জীবনের এক পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছি শ্রুতি, আর তাই সে বিষয়ে তোমার অনুমতি নিতে এসেছি।

আমার অনুমতি! সামান্য মালিনীর কাছে রাজার কুমার নেবে অনুমতি।

এখনও তোমার অভিমান গেল না শ্রুতি?

বিশ্বাস করো কুমার, এ আমার অন্তরের কথা। শাল্মলী তরুর শিরে যে চাঁদ ওঠে আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। সে আমার ভালবাসার তন্ত্রীগুলোতে আঘাত হেনে আশ্চর্য সব রাগিনী তোলে। কিন্তু আমি জানি, সে আমার স্পর্শের অতীত। ভালবাসলেই কি ভালবাসার ধনকে পাওয়া যায় কুমার? তোমার আমার অনেক ব্যবধান, তাই বলছিলাম, আমার অনুমতির কিছু কি প্রয়োজন হবে তোমার?

আচ্ছা শ্রুতি, অনুমতির কথা থাক, আমি শুভকাজে তোমার প্রসন্ন মনের শুভেচ্ছা চাই।

আমার শুভ প্রার্থনা তোমার সকল কাজে নিত্যদিন রয়েছে কুমার। তবু বলো, আজ তুমি কী শুভ কাজের অনুষ্ঠান করতে চলেছ?

আজ আমি এক পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চলেছি শ্রুতি, যেখানে আমি হোতার আসনে দাঁড়িয়ে আহুতি দেব আমার এ চোখের দৃষ্টি, মনের কামনা, দেহের বীর্য। আর সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্ম নেবে আর এক যুবা পুরুষ, যে পাবে আমার প্রদত্ত আহুতির সকল বৈভব।

আমাকে সহজ করে বলো কুমার, আমি এ প্রহেলিকা ভেদ করতে পারছি না।

মহারাজ যযাতিকে এ অরণ্যে তুমি বহুবার অশ্বারোহণে আসতে দেখেছ শ্রুতি।

হাঁ কুমার। আমি আশৈশব সেই অপূর্ব কান্তিমান পুরুষসিংহকে এই অরণ্যে তোমাদের গৃহে আসতে দেখেছি।

তাঁর সেই প্রদীপ্ত বীর্যবান দেহের কোনও পরিণতির কথা কি তুমি শুনতে পেয়েছ।

পিতা লোকমুখ থেকে আমাদের মহারাজের ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে এসেছিলেন।

শুক্রাচার্য তাঁকে 'জরাগ্রস্ত হও' বলে অভিশাপ দিয়েছেন, আবার সেই অভিশাপ থেকে মুক্তির পথও বলে দিয়েছেন।

আমরা শুধু মহারাজের জরাগ্রস্ত হবার কথাই শুনেছি, তার থেকে মুক্তির যে পথ আছে সে কথা তো শুনিনি।

সে এক অদ্ভুত পথ শ্রুতি। যদি কেউ তার যৌবন দান করে মহারাজের জরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তা হলেই কেবল মহারাজ পূর্বাবস্থা ফিরে পেতে পারেন।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য এই শ্রুতি, একজন ভিক্ষাজীবীও পৃথিবীর সম্রাটের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তার যৌবন দিয়ে জরা গ্রহণ করতে চায় না।

কেন কুমার?

সম্পদ নিয়ে সে হতভাগ্য কী করবে, যদি সম্পদ ভোগের ক্ষমতা না থাকে। জরাগ্রস্ত মানুষের কোনও কিছু ভোগের ক্ষমতাই থাকে না।

কুমার, সে যদি ত্যাগের পথে যায়? তার প্রাপ্ত ধন যদি সে ধনহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তা হলে কি তার ভোগের বাসনা তৃপ্ত হয় না?

ত্যাগের ভেতর যে সবচেয়ে বড় ভোগ লুকিয়ে রয়েছে তার খবর তোমার মতো ক'জন জানে শ্রুতি। সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারলে দাতা পায় সমবেত হৃদয়ের আনন্দের ভোগ। সেখানেই তার চরম তৃপ্তি।

একটুখানি থেমে আবার বলল পুরু, আমি সেই ত্যাগের ব্রতই সাধন করতে চলেছি শ্রুতি। তোমার সঙ্গে আশ্চর্য মিল হয়ে গেল আমার মনের। আমি আমার যৌবন উৎসর্গ করছি পিতার ভোগের জন্য। শুধু পিতার ভোগ নয়, আমারও ভোগ ত্যাগের তৃপ্তি আর আনন্দ-ভোগ।

শ্রুতি বলল, কুমার, সার্থক তোমার জীবন। আমিও গর্বিত এ জন্যে যে, পৃথিবীর অদ্বিতীয় এক পুরুষ আমার মতো সামান্যকে তার ভালবাসা দান করেছে।

শ্রুতিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে পুরু বলল, তুমি কী পেলে আমি জানি না তবে আমি তোমার কাছে যা পেলাম তার তুলনা নেই। তোমাকে ভালবেসে আজ আমি সত্যিই ধন্য হলাম। আমার ব্রত উদযাপনে আর কোনও বাধা নেই শ্রুতি।

অপার আনন্দ আর পরিতৃপ্তির ছবি ফুটে উঠল শ্রুতির চোখে মুখে। সে আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে বলল, কুমার, শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দাও, এ জরা থেকে কোনওদিন কি তোমার মুক্তি নেই?

আমি তো সর্বত্যাগী হতে চেয়েছি শ্রুতি, মুক্তি পেতে চাইনি। তবু তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছি। যদি পিতা কোনওদিন জরা গ্রহণ করে আমাকে তাঁর যৌবন দান করেন তা হলেই কেবল আমি আবার যৌবনের অধিকারী হতে পারি।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল বনস্থলীতে, কিন্তু সে ছায়া ঘনাল না শ্রুতি আর পুরুর বিদায় মুহূর্তে। শ্রুতি দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, পার্থিব চাওয়া পাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই তাঁর অবয়বে। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, দিব্য পুরুষ উচ্চারণ করছেন,

আমি অনন্ত যৌবনের অধীশ্বর। এ যৌবনকে জরা বিকৃত করতে পারে না, ভোগ নিঃশেষ করতে পারে না, আর মহাকাল হরণ করতে পারে না। যে ত্যাগী অন্তরে চির আনন্দময় সেই কেবল পায় এই অনন্ত যৌবনের অধিকার।

শ্রুতি লুণ্ঠিত হয়ে সেই পুরুষোত্তমের চরণে তার প্রণাম নিবেদন করল।

রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের নিভৃত এক প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জরাগ্রস্ত যযাতি। তাঁর পদতলে ধ্যানমগ্ন পুরু। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। এখন ধ্যানে পুরু পিতৃপুরুষকে স্মরণ করছে।

স্বর্গ থেকে মর্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত এক আলোর সোপান। সেই সোপানের সর্বোচ্চ আসনে দাঁড়িয়ে আছেন মানব-পিতা মনু। জ্ঞান ও কর্মের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত অবয়ব। তাঁর নিম্ন সোপানে দণ্ডায়মান অত্যাশ্চর্য এক মূর্তি। মনুর পুত্র ইলা। একদিকে তাঁর পুরুষের শৌর্য, অন্যদিকে নারীর কমনীয়তা। তাঁর নিম্নের আসনে ইলার পুত্র পুরুরবা। ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর, বিপ্র-বিদ্বেষী, উর্বশীর প্রণয়ভিক্ষু। পুরুরবার মূর্তিতে অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট এক চিহ্ন। পুরুরবার পদনিম্নে দণ্ডায়মান ছয় পুত্রের অন্যতম আয়ু। তাঁর পদতলে ধর্মপরায়ণ মহাবিক্রমী নহুষ।

আলোর সোপানের নিম্নে প্রসারিত মৃন্ময়ভূমি। সেখানে দণ্ডায়মান জরাগ্রস্ত ম্লানবর্ণ যযাতি।

পুরু প্রার্থনা করে চলেছে, হে আমার পূর্বপুরুষগণ, তোমাদের দেহ থেকে প্রবাহিত যে আলোকধারা অধস্তন পুরুষকে স্পর্শ করে চলেছে, তার থেকে বঞ্চিত কোরো না আমার জন্মদাতা পিতা যযাতিকে। আলোকিত হোক তাঁর সর্বতনু। জরা থেকে হোক তাঁর মুক্তি। আমি স্বেচ্ছায় সমর্পণ করছি আমার যৌবন। সম্পূর্ণ কামনামুক্ত হয়ে আমি আমার যৌবন তাঁকে উৎসর্গ করে গ্রহণ করছি তাঁর জরা। হে পূর্বদেবগণ, জরামুক্ত হয়ে তোমাদের সন্তান যযাতি সকল অভিশাপের উর্ধ্বে তাঁর স্বাভাবিক জীবন ধারণ করুন।

সহসা পুরুর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হল প্রসন্ন প্রভাতের কোমল এক দ্যুতি। মুছে গেছে পূর্বের সে ছবি। সেখানে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটি মূর্তি। যযাতি! যৌবনের দীপ্তিতে দীপ্তিমান বিক্রম কেশরী যযাতি।

প্রাসাদ প্রকোষ্ঠের বাতায়ন পথে ততক্ষণে এসে পড়েছে উর্ধ্বলোকের আলো। প্রস্রবণের মতো ছড়িয়ে পড়েছে তা পাষাণনির্মিত গৃহতলে। পলিত কেশ, জরাজীর্ণ, ক্ষীণ দৃষ্টি এক বৃদ্ধ বসে রয়েছে পাষাণ ভিত্তির ওপর যুক্ত করে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে ভাস্বর মূর্তি পরম তেজস্বী এক যুবাপুরুষ।

৪

শর্মিষ্ঠা তুমি!

হ্যাঁ দেবযানী, মহর্ষির এই পবিত্র আশ্রমে মনে হল তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

এসো, এই পাষাণ বেদিকায় উপবেশন করা যাক।

মহর্ষি কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না।

তিনি প্রভাতে ঋষিকুলের এক বিচারসভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়েছেন। দিনাবসানের আগে ফিরে আসার সম্ভাবনা কম।

আচ্ছা দেবযানী, তুমি কি ক্লান্ত?

এ কথা কেন শর্মিষ্ঠা? পিতৃগৃহে আমি বিশ্রামেই রয়েছি। ক্লান্তির কোনও কারণ নেই।

তা হলে দেবযানী এই পাষাণ বেদিকায় উপবেশন না করে আমরা কি আশ্রম তরুর ছায়ায় ছায়ায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারি না?

তোমার যা অভিরুচি তাই হবে। তুমি এখন এ আশ্রমের অতিথি। তা ছাড়া আমিও আর তোমার প্রভু নই।

সে কথা এখন থাক। আমি অবাক হয়ে দেখছি দেবযানী, মহর্ষির তপোবন অবিকল সেই পূর্বের অবস্থাতেই রয়েছে।

বাবা সারাক্ষণই প্রায় আশ্রমের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন।

ওই দেখো দেবযানী, সপ্তপর্ণীর তলদেশ ঘিরে সেই নিবিড় মাধবীলতায় আচ্ছাদিত কুঞ্জভূমি। একদিন ওই তরুতলে তুমি আর বৃহস্পতি সুত কচ বসে ছিলে। খুব মগ্ন হয়েই আলাপন চলছিল তোমাদের। সহসা কুহু-কুহু-কুহু ধ্বনি শুনে তুমি আর কচ চমকিত হয়ে তাকিয়েছিলে চতুর্দিকে। তারপর আমার কলহাস্যে তুমি আবিষ্কার করেছিলে সেই পাখিটিকে।

সত্যি শর্মিষ্ঠা, সেদিন তুমি অবিকল পাখির ডাক ডেকেছিলে। কচ পর্যন্ত তোমার কীর্তি বলে অনুমান করতে পারেনি।

সেই কবেকার কথা, তোমার তো দেখছি স্পষ্ট মনে আছে দেবযানী।

মনে হয় কালই ঘটনাটা ঘটেছে শর্মিষ্ঠা।

আচ্ছা দেবযানী, অশোক তরুবীথিতে বাঁধা তোমার সেই প্রিয় দোলনাটি নিশ্চয় এখন আর নেই?

আমার এখানে আসার পরে বাবাই সেটিকে কুটির থেকে নিয়ে গিয়ে অশোক শাখায় বেঁধে দিয়েছেন।

মনে পড়ে তোমার, এই দোলনা নিয়ে কী লুকোচুরি খেলা খেলতে হয়েছিল আমাদের। মহর্ষিকে সেদিন দূর থেকে আসতে দেখে আমি করতালি দিতেই তোমরা দু'জন দোলনা থেকে ত্রস্তে নেমে পড়েছিলে। পাশের শাল্মলী বৃক্ষের সুউচ্চ আলবালের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল কচ। তুমি আমাকে হাতছানি দিয়ে পাশে ডেকে নিয়েছিলে। তারপর কচের পরিবর্তে আমরা দু'জনই সেদিন দুলেছিলাম দোলনায়। মহর্ষি আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেছিলেন...। কী বলেছিলেন স্মরণ করতে পারো দেবযানী?

বাবা বলেছিলেন, দোলনাটি কাষ্ঠখণ্ড আর তন্তু রজ্জু দিয়ে তৈরি। ওটি ভেঙে অথবা ছিঁড়ে গেলে আবার তৈরি সম্ভব। কিন্তু দুই কন্যার অস্থি চূর্ণ হয়ে গেলে তা আর জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তোমার দেবযানী।

আমি সহজে কোনও কিছু ভুলি না শর্মিষ্ঠা।

কচের কথা এখনও তোমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে?

তুমি যেমন আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছ শর্মিষ্ঠা, ঠিক কচও আমার স্মৃতিতে তেমনই স্পষ্ট।

শঙ্খিনী নদীতে একদিন তুমি ছল করে জল আনতে গেলে আর আমি আশ্রম কুটিরে মহর্ষিকে নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় অন্যমনস্ক করে রাখলাম।

মনে আছে শর্মিষ্ঠা, সেদিন আকাশের ঈশান কোণে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল। আর একটা বাতাস হু হু করে বয়ে এসে আশ্রম তরুর ডালপাতা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আমার মনটাও অমনি হু-হু করে উঠল। কচ গেছে শঙ্খিনী নদীর ওপারে গোধন নিয়ে, তাকে দেখার জন্যে সেই মুহূর্তে আকুল হয়ে উঠল মন।

আমি তোমাকে পরামর্শ দিলাম কলস নিয়ে নদীতে জল আনতে যাবার।

সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরামর্শ মেনে নিয়ে আমি চলে গেলাম নদীতে।

অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও যখন তোমাদের দেখা মিলল না, আর বড় বড় দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টিও নামল তখন হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন মহর্ষি। তোমাদের খোঁজ করতে লাগলেন। আমি বললাম, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি এখুনি ওকে ডেকে আনি।

আমরা তখন নদীর ধারে শিংশপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গভীর আলাপে মত্ত ছিলাম, তুমি ছুটে গেলে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের দিকে দ্রুত পা চালালাম। আমি কচকে বারণ করলাম সঙ্গ নিতে। বনের মাঝখানে আচ্ছাদিত সাধন বেদিকায় ঝড়বৃষ্টি না থেমে যাওয়া পর্যন্ত ধেনু নিয়ে অপেক্ষা করতে বললাম। ও সুবোধ বালকের মতো সেদিন তোমার নির্দেশ মেনে নিয়েছিল শর্মিষ্ঠা।

মনে আছে দেবযানী, দানবেরা যখন শত্রুপক্ষের লোক আর সঞ্জীবনী বিদ্যার শিক্ষার্থী বলে কচকে কয়েকবার হত্যা করল, তখন আমিই তোমাকে তার মৃতদেহের সন্ধান বলে দিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তুমি মহর্ষিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে তার দেহে প্রাণসঞ্চারের ব্যবস্থা করেছিলে।

সে কথা আমি ভুলিনি শর্মিষ্ঠা। আরও ভুলতে পারিনি সেদিনের কথা, যেদিন কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করে চলে গেল দেবলোকে। প্রত্যাখ্যান করল আমার এতদিনের ভালবাসা। সেদিন কচকে হারিয়ে বুকখানা ভেঙে গিয়েছিল আমার। তুমি সেই বিষাদ লগ্নে বুকে বেঁধে রেখেছিলে আমাকে।

দেবযানী, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বসো এই শিলা-বেদিকায়।

শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী পাশাপাশি উপবেশন করল। কিছুক্ষণ কাটল নীরবতায়।

সহসা শর্মিষ্ঠা প্রশ্ন করল, দেবযানী, মহারাজ বৃষপর্বার কন্যা কোনওদিন কোনও উপকার করেনি তোমার?

একথা কেন শর্মিষ্ঠা, আমি কি কোনওদিন তা অস্বীকার করেছি।

তবে কেন তুমি মহারাজ যযাতির ওপর প্রতিশোধ নিতে গেলে? আমাকে তুমি সামান্য কারণে দাসিত্বে নিযুক্ত করলে, আমি কোনও প্রতিবাদ সেদিন করিনি, কিন্তু মহারাজ যযাতি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছিলেন দেবযানী?

মহারাজ আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে গোপনে তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আমার ওপর তাঁর গভীর প্রেম-প্রদর্শন একটা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। তিনি তোমার প্রতি তাঁর প্রেমের কথা তিলমাত্র আমাকে জানতে দেননি। স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে তার সব কথা এমন করে গোপন করে রাখে তা হলে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর পবিত্র কোনও বন্ধনই থাকে না।

সত্য দেবযানী, তোমার এ কথাগুলি প্রতিটি দম্পতির ক্ষেত্রে মিলনের প্রথম শর্ত হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। স্বামী-স্ত্রী, যারা বিধাতার নিয়মে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, দেহে মনে যারা সর্বোত্তম মিলনের অধিকারী, তাদের ভেতর পারস্পরিক প্রতারণা থাকবে কেন?

আমি সেই কথাই বলতে চাই শর্মিষ্ঠা।

কিন্তু দেবযানী, আমরা সকলেই সম্মুখের মানুষটির সমালোচনা করি নিজের মনের দ্বারটি বন্ধ রেখে। তখন আমরা প্রতিপক্ষের সমালোচনায় এতই অন্ধ যে নিজের দিকে তাকাবার অবসরই পাই না। সত্য নয় দেবযানী?

এ কথা কেন?

মহারাজের সমালোচনা করতে গিয়ে কোনওদিন তাকিয়েছ নিজের অন্তরের দিকে, নিজের অতীতের দিকে? কোনওদিন তুমি মহারাজের কাছে প্রকাশ করেছ, কচ নামে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্রের কথা? তোমার পিতার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা করতে এসেছিল মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা?

একথা মহারাজকে আমি বিশ্রম্ভালাপের সময় জানিয়েছি শর্মিষ্ঠা।

কিন্তু তুমি ঋষিকন্যা, আজ অগ্নির মতো পবিত্র সত্যকে আশ্রয় করে বলো, কচের সঙ্গে তোমার গোপনে প্রণয় সম্পর্কের কথা রাজার কাছে ব্যক্ত করেছ?

বলো, বলো দেবযানী, নীরবে মাথা নত করে বসে রইলে কেন? এ তোমার ব্যভিচার নয়? রাজা যদি তাঁর গোপন প্রণয় ব্যক্ত না করে স্ত্রীর কাছে প্রতারক হন, তা হলে সেই একই প্রতারণার দায়ে কি তোমাকে অভিযুক্ত করা যায় না দেবযানী?

পিতার কাছে বিবাহকালে মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করেছিলেন, তাই পিতাই তাঁর প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের শাস্তি দিয়েছেন।

অপরাধ নিয়ো না দেবযানী, একটি প্রশ্ন আজ আমি তোমাকে করতে চাই। যদি কোনও ব্যক্তি তার আপন জনের জীবন-মরণের চাবিকাঠিটি প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেয় তা হলে কী শাস্তি তার প্রাপ্য?

মহারাজ বৃষপর্বাই সে কথা বলতে পারবেন।

তোমার সহজ বুদ্ধি আর বিবেচনায় কী বলে দেবযানী? শাস্তি তার প্রাপ্য কিনা?

হ্যাঁ। স্বজনের অমঙ্গলকারী মানুষ শাস্তিরই যোগ্য।

তা হলে বিচার করো তোমার পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্যের। তিনি দানবের গুরু দানবের স্বজন। দেব দানবের যুদ্ধে তিনি মৃত দানবদের সঞ্জীবিত করে দানবকুলের পরম শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সেই গুপ্ত সঞ্জীবনী বিদ্যা বিলিয়ে দিলেন শত্রুপক্ষের প্রেরিত এক শিক্ষার্থীকে।

কিন্তু তিনি এমন প্রতিশ্রুতি কাউকেই দেননি যে, দানব ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে বরণ করবেন না।

এ প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে কাউকে দিতে হয় না দেবযানী। এ প্রতিশ্রুতি অলিখিতই থাকে। যে কাজ তিনি করেছেন তা তাঁর অজ্ঞাতসারে হলেও স্বজন পরাভবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার পিতা তো বলেননি যে তিনি দানবকুলকে আর যুদ্ধে সঞ্জীবিত করবেন না। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয় জয় পরাজয়ে। দেব দানবের যুদ্ধ চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। কখনও দানবের জয়, কখনও দেবতার।

কিন্তু সঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী তোমার পিতা মহর্ষিদেব দানবপক্ষ অবলম্বন করার পরে দানবরা সৈন্যক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অনেক বেশি বলশালী হয়ে ওঠে। আজ তোমার পিতাই শত্রুপক্ষকে সে বিদ্যা দান করে দানবকুলের পরাভবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

সে তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি শর্মিষ্ঠা। তিনি সবার পূজনীয়, সবার গুরু। তাঁর সমালোচনার অধিকার অন্য কারু নেই।

আছে বই কী দেবযানী। তিনি নিঃস্বার্থভাবে দানবদের উপকার যদি করতেন তা হলে তিনি থাকতেন সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু তিনি যে আশ্রমে রয়েছেন তা দানবরাজ বৃষপর্বারই অধিকারভুক্ত। তা ছাড়া তাঁর ভরণপোষণ যাগযজ্ঞের সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে রাজকোষ থেকে। তাই বলছিলাম, এখানে পারস্পরিক দান প্রতিদানের প্রশ্ন থেকে যায়।

ক্রুদ্ধ দেবযানী বলল, একবার আমার পিতার ভরণপোষণের প্রশ্ন তুলে তুমি শাস্তি পেয়েছিলে, মনে নেই শর্মিষ্ঠা?

আজ সে অতীতকে ভুলে যাও দেবযানী। সে আর ফিরে আসবে না। আমি পিতার অধীন নই, তোমার তো নয়ই। সুতরাং অনাবৃত করে দেখাবার অধিকার আমার কাছে আছে। আর তোমার পিতার অভিশাপের ভয় দেখিয়ো না আমাকে। আমি যেখানে নিজের বিবেকের কাছে মুক্ত, যেখানে সত্যই আমার আশ্রয়, সেখানে সব অভিশাপই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে। দেব দ্বিজ ঋষি কারুরই কাছ থেকে কোনও শঙ্কা আমার নেই।

তুমি দানবের ঘরে জন্মেছ তাই ঔদ্ধত্য তোমার ভূষণ। ব্রাহ্মণ, আর ঋষিকুলের প্রতি কীরূপ আচরণ করতে হয় তা শেখোনি! কেবল যুদ্ধ করলে শক্তিমান হওয়া যায় কিন্তু উচ্চ চিন্তা, উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী হতে হলে ঋষির মতো সাধনা করাই চাই শর্মিষ্ঠা। তুমি দানবকন্যা, তোমার কাছে এ সকল কথা বলা নিরর্থক।

শোনো দেবযানী, ঋষিত্বের বড়াই আর কোরো না। তোমার পিতা অন্ধ, তাই সত্যাসত্যের বিচার না করে, কেবলমাত্র তোমার কথার ওপর নির্ভর করে আমার গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার পিতা দানব হয়েও আপন কন্যার শাস্তি বিধানে ইতস্তত করেননি। তোমার বিবাহের পর আমার পিতা তোমাকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজ যযাতির রাজ্যে। সঙ্গে সাধারণ এক শিবিকায় দাসী করে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর প্রাণের কন্যা শর্মিষ্ঠাকে। বুকখানা পাষাণ হয়ে গেলেও একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয়নি তাঁর চোখ থেকে। আর অন্যদিকে ঋষি শুক্রাচার্য কন্যাকে পাঠালেন পতিগৃহে। তাঁর কি একবারও মনে হল না, আর একটি কন্যা সমস্ত আনন্দের আয়োজনের মাঝখানে একবুক বেদনা নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজগৃহের অন্ধকার কোণে নির্বাসিতার জীবনযাপন করতে চলেছে! ধরে নাও আমি তোমাকে মৃত্যুর ফাঁদেই ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবযানী, তখন আমাদের বয়সই বা কত! অপরিণত বুদ্ধির দুটি কন্যা যদি পরস্পর বিবাদ করতে গিয়ে কোনও অঘটনই ঘটিয়ে থাকে, তাহলে বিচক্ষণ ঋষি কী করে সেই ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ করলেন! আমার পিতার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও যদি তাঁর থাকত তা হলে তিনি তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার ওপর এত অবিচার করতেন না। ব্রাহ্মণের ঔদার্যের আর মিথ্যা বড়াই কোরো না দেবযানী। আমার পিতা বৃষপর্বাকে দেখে যেন তোমার মহর্ষি পিতা লোক ব্যবহার শিক্ষা করেন।

একটু থেমে শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এসকল কথা মহর্ষিকেই শোনাতে এসেছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তাঁর পরিবর্তে তোমাকেই শোনাতে হল।

দেবযানী ক্রুদ্ধ, স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। দৃপ্ত পদবিক্ষেপে আশ্রম পরিত্যাগ করে চলে গেল শর্মিষ্ঠা।

শর্মিষ্ঠা রথ থামাতে বলল সারথীকে।

কীসের কোলাহল রাজপথে? অনুসন্ধান করো।

সারথী নেমে গিয়ে সন্ধান নিয়ে এসে জানাল, আশ্চর্য খবর মহারানি। মহারাজ নাকি জরামুক্ত হয়ে অশ্বারোহণে কিছু পূর্বে এই পথ অতিক্রম করে গেছেন। প্রজারা তাই উল্লাসধ্বনি করে চলেছে?

সঙ্গে সঙ্গে শর্মিষ্ঠা কণ্ঠের হার খুলে সারথীকে দিয়ে বলল, এ শুভসংবাদের পুরস্কার তোমার প্রিয়তমা পত্নীর হাতে তুলে দিয়ো। দ্রুত রথ চালিয়ে চলো প্রাসাদে।

প্রাসাদরক্ষীর কাছে শুভসংবাদটি দ্বিতীয়বার শ্রবণ করে আনন্দে আবেগে চোখে জল এসে গেল শর্মিষ্ঠার। মহারাজকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠল প্রাণ। কিন্তু জানা গেল মহারাজ সুস্থ দেহে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। এখনও প্রাসাদে ফিরে আসেননি।

সূর্যাস্তের সমারোহ পশ্চিম দিগন্তে। রানি শর্মিষ্ঠা প্রবেশ করল প্রাসাদ অভ্যন্তরে আপন নিকেতনে। প্রাসাদ প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যাদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অদূরে দেবাদিবের মন্দিরে শুরু হয়েছে আরত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি।

শর্মিষ্ঠা নিজের প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে প্রবেশ করল পুত্র পুরুর কক্ষে। সে কক্ষে তখনও সন্ধ্যাদীপ জ্বলেনি। অন্ধকারের ভেতর থেকে শর্মিষ্ঠা শুনতে পেল, কে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে।

কে ওখানে? পুরু?

মা।

এমন বিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে কথা বলছ কেন পুরু? গৃহে দীপ জ্বালাবার আদেশ দাওনি কেন এতক্ষণ?

আজ থেকে এই প্রকোষ্ঠে পুরু থাকবে অন্ধকারের জীব হয়ে। সমস্ত জগৎ থেকে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাপন করবে নির্বাসিতের জীবন।

আকুল হয়ে অন্ধকারে পুরুকে অন্বেষণ করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল শর্মিষ্ঠা, পুত্র কী হয়েছে তোমার, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।

আমি পিতাকে যৌবন দান করে জরা গ্রহণ করেছি মা!

পুরু!

শর্মিষ্ঠার আর্ত চিৎকারে প্রাসাদ প্রকোষ্ঠ দীর্ণবিদীর্ণ হতে লাগল।

পুরু কাতর জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল, আমি পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছি মা। অন্তরে আমার কোনও আক্ষেপই নেই। অতৃপ্ত পিতাকে যদি আমার যৌবন দান করে কিছুমাত্র তৃপ্তি দিতে পারি তা হলে ইহলোক পরলোক আমার আলোকিত হবে মা।

দু'চোখ ভাসিয়ে প্লাবনের ধারা নামছে তখন রানি শর্মিষ্ঠার। ভগ্ন কণ্ঠে শর্মিষ্ঠা বলল, তোমার ওই জরাগ্রস্ত মুখ আমি কেমন করে দেখব পুরু। প্রভাত সূর্যের মতো যে মুখের দীপ্তি, সেই মুখ আজ রাহুগ্রস্ত। জননী হয়ে, আমি কী করে আর ওই মুখের দিকে তাকাব পুত্র।

মা, তাই তো আমি রয়েছি অন্ধকারে চতুর্দিক রুদ্ধ করে। পৃথিবীর মানুষের অকারণ ঔৎসুক্যের মুখোমুখি আমি হতে চাই না। পিতাকে অনুরোধ জানিয়েছি, তিনি যেন আমার কাছ থেকে তাঁর যৌবনপ্রাপ্তির কথা সর্বসাধারণে না প্রকাশ করেন। পুত্রের কাছ থেকে পিতা নিয়েছে যৌবন, এ যে মা প্রতিটি মানুষের মুখে সমালোচনার বস্তু হয়ে উঠবে। প্রথমে গুঞ্জন, তারপর তা রূপ নেবে প্রকাশ্য সমালোচনার। কেউ বিশ্বাস করবে না মা পিতৃঋণের সামান্যতম অংশ শোধ করবার জন্য পুরু স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে তার পিতার জরা।

পুরু, আমি জননী হয়ে কী করে ভাবতে পারব যে আমার পুত্র তার দেহের পরিণতিতে পিতামাতাকে অতিক্রম করে গেছে। আর কী করেই বা আমি গ্রহণ করব রাজপ্রাসাদের ভোগ, যেখানে পুত্র আমার জরাগ্রস্ত হয়ে ভোগ সুখে বঞ্চিত!

দুঃখ কোরো না জননী। তোমার বেদনা, তোমার দীর্ঘশ্বাস যদি আমাকে স্পর্শ করে তা হলে বিচলিত হয়ে উঠবে আমার চিত্ত। তুমি স্থির হও মা। আশীর্বাদ করো, যেন তোমার পুত্র অবিচলিত চিত্তে তার ব্রত উদযাপন করতে পারে।

একটু নীরব থেকে পুরু বলল, জীবনের প্রসারিত শাখায় দুটি পাখির বাস। একটি দেহ অন্যটি আত্মা। দেহ ভোগ করে ফল আর নির্লোভ, নিস্পৃহ আত্মা তাই দর্শন করে। আমি ভোক্তা না হয়ে দ্রষ্টা হতে চাই মা।

পুত্র, তুমি আজ আমাকে শুধু কালের যাত্রাতেই অতিক্রম করে যাওনি, জ্ঞানেও অতিক্রম করে গেছ।

হেসে উঠল পুরু। বড় প্রসন্ন সে হাসি। বলল, জননীকে কি মহাকাল সীমা দিতে পারে মা। জননী মূর্তিতে নারী কালের অতীত। প্রতিটি পুরুষ জননীর দৃষ্টিতে শিশু। আর সন্তান কি কখনও জ্ঞানের বিচারে জননীকে অতিক্রম করতে পারে মা। সন্তানের সকল আচরণ, চরিত্র, প্রজ্ঞা যে আশৈশব জননীর নখদর্পণে। সন্তানের সকল ক্রিয়া, সকল মহিমার দ্রষ্টা তিনি।

অন্ধকারে জরা-পীড়িত পুত্রকে আদরে চুম্বনে পূর্ণ করে দিয়ে শর্মিষ্ঠা পুরুর প্রকোষ্ঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। পুরু একাকী বসে অন্ধকারের বুকে প্রার্থনা করতে লাগল। হে রাত্রি, আশ্চর্য তোমার মহিমা। সমস্ত দৃশ্যমান জগতের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে তুমি অবলুপ্ত করে দাও। তুমিই প্রমাণ করো সৃষ্টিতে যত বৈচিত্র্যই থাক, তার মূল উৎস এক। কে পিতা, কে জননী, কেই বা পুত্র। সবাই প্রবাহিত হয়ে এসেছে তোমার ওই অন্ধকারের উৎস মুখ থেকে। শৈশব, যৌবন, জরা সেখানে একাকার। কেবল স্রোতের বুকে তরঙ্গের উত্থানপতন মাত্র। শৈশব তরঙ্গটি স্রোতের আন্দোলনে সৃষ্টি হয়ে ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠল যৌবনের গরিমায়। তারপর জরাগ্রস্ত হয়ে বিলীন হয়ে গেল ওই স্রোতের বক্ষে। একই জলস্রোত, একই কালস্রোত। কেবল আলোকে বিভ্রান্তি। রূপের ভেতর পড়ে অরূপ রতন হয়ে যাচ্ছে অচেনা।

হে রাত্রি, তুমি তোমার অন্ধকারের স্পর্শে আমার উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে দাও।

কে, কে তুমি?

চিনতে পারছ না আমাকে মহারানি শর্মিষ্ঠা?

বিশ্বাস করো, আজ আমার সন্তানের সঙ্গে তুমি অভিন্ন হয়ে গেছ।

সে কী মহারানি, এ তো আমারই অবয়ব!

কিন্তু মহারাজ সমস্ত যৌবন-শক্তি আমার পুত্রের। তুমি একই শয্যায় শয়ন করে আর আমাকে স্পর্শ কোরো না। চেয়ো না আমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে। আজ থেকে এ প্রাসাদে আমি শুধু জননী। কামনা বাসনার সমস্ত বহ্নিশিখা আজ থেকে নির্বাপিত।

তুমি আমার অগ্নিসাক্ষী রেখে গ্রহণ করা বিবাহিতা পত্নী নও?

না মহারাজ, এই মুহূর্ত থেকে নয়। আবার যদি কোনওদিন কালযাত্রায় তুমি তোমার স্বাভাবিক দেহধর্মে ফিরে আসতে পারো সেদিন যে অবস্থাতেই থাকো, শর্মিষ্ঠা জীবিত থাকলে তোমাকে তার পতিরূপেই গ্রহণ করবে।

শর্মিষ্ঠার কাছে প্রত্যাখ্যাতা যযাতি বিষণ্ণ চিন্তাকে সঙ্গী করে কক্ষান্তরে প্রবেশ করলেন।

প্রভাতে রাজকার্যে বসে নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন মহারাজ যযাতি। সভাসদেরা অবাক হয়ে দেখল, মহারাজ যযাতি তাঁর শাসনকালের মধ্যে আজই সর্বাধিক প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছেন।

সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করে যযাতি বললেন, পক্ষকালের মধ্যে বাহিনী প্রস্তুত করুন। সীমান্তের দুর্বৃত্তদের আমি স্বয়ং গিয়ে শাস্তি বিধান করে আসব।

সৈন্যাধ্যক্ষ সবিনয়ে বললেন, মহাশয় আপনি যখন যুদ্ধযাত্রা মনস্থ করেছেন তখন কেবলমাত্র সীমান্তবাসীদের শাসন না করে উত্তরাভিমুখে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চলুন। এতে আপনি কয়েকটি বিষয়ে লাভবান হবেন। প্রথমত, বহুদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ফলে সৈন্যদের মধ্যে যে তেজোহীনতার আবির্ভাব ঘটে তা চলাচল ও যুদ্ধক্রিয়ার ফলে বিদূরিত হবে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি যুদ্ধ জয়ের ফলে চতুর্দিকস্থ নরপতি ও শত্রুকুলের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হবে। আর সর্বশেষ ফল, রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি।

মহারাজ যযাতি বললেন, এ পরামর্শ আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অতীব সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত। সভাসদগণ, আপনাদের এ বিষয়ে বিরুদ্ধ কোনও মন্তব্য থাকলে প্রকাশ করতে পারেন।

অশীতিপর বৃদ্ধ অমাত্য বললেন, যুদ্ধে যুদ্ধস্পৃহা বর্ধিত হবে মহারাজ। যে-কোনও নৃপতির যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই কাম্য হওয়া উচিত। যুদ্ধে শরীর নাশক উত্তেজনা, লোকক্ষয় জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তা থাকে। কিন্তু শান্তির মাঝে থাকে সংগঠনের স্পৃহা। কৃষিকর্ম, গোধন বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রজার মঙ্গল প্রদায়ক কর্মগুলি সম্পাদিত হয়।

মহারাজ যযাতি বললেন, আপনার পরামর্শ সর্বকালে সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি বিশ্বের সকল নৃপতি পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে নিজ নিজ দেশ শাসন করতেন তা হলে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের কোনও প্রশ্নই উঠত না। মনুষ্যচরিত্র বিচিত্র। এই মুহূর্তে যে বন্ধু

পরমুহূর্তে সে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, কিছুকাল আমার জরাগ্রস্ততার সুযোগ নিয়ে সীমান্তের কিরাত সম্প্রদায় উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে। তাই মনুষ্য সমাজের চরিত্র যতকাল না পরিবর্তিত হয়, যুদ্ধ ততকাল অনিবার্য। রাজাকে যদি চরাচরের থেকে শক্তিমান না ভাবে তা হলে তাঁকে চতুর্দিক থেকে নিত্য উত্ত্যক্ত করতে থাকবে, যার ফলে দেশের মঙ্গল কর্মে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

একটু থেমে রাজা বললেন, সৈন্যাধক্ষেরা যেমন আমার একদিকের শক্তি, অন্যদিকের আপনারা। আমি যুদ্ধযাত্রা করলেও জানি রাজ্যের উন্নতি বিধায়ক কর্মগুলি আপনারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবেন।

বৃদ্ধ অমাত্য বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধযাত্রা করুন মহারাজ, আমরা সমবেতভাবে সকল অমাত্য সাধ্যমতো প্রজাকুলের প্রিয়কর্ম সম্পাদন করব।

সুসজ্জিত তোরণ অতিক্রম করে চলল মহারাজ যযাতির চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী। অশ্ববাহিত রথশীর্ষে উড্ডীন সূর্য-লাঞ্ছিত পতাকা শ্রেণি বায়ুভরে আন্দোলিত হয়ে যেন পূর্বাহ্ণেই বিজয় ঘোষণা করছে। মহারাজের জয়ধ্বনিতে মুখরিত রাজপথ। হস্তীবাহিনীর বৃংহণ, অশ্ববাহিনীর হ্রেষা, রথচক্রের ঘর্ঘর, পদাতিকের কোলাহল, ভেরী পটহ মৃদঙ্গ শিঙা শঙ্খের সম্মিলিত নিনাদ যুদ্ধযাত্রাকে মহা সমারোহপূর্ণ করে তুলল। চতুরঙ্গ সেনার গমনে গগনমার্গে যে ধূলি উত্থিত হল তা অকাল মেঘের আকার ধারণ করল। বাদ্য ও অন্যান্য সম্মিলিত শব্দে সন্ত্রস্ত পক্ষীকুল পক্ষ বিস্তার করে দ্রুত গতিতে দিগন্তের অভিমুখে উড়ে চলল।

সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে চলেছেন মহারাজা যযাতি। সূর্যালোকে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে রত্নখচিত মুকুট। দক্ষিণ করে উত্তোলিত কোষমুক্ত অসি। মধ্যে মধ্যে আলোকপাতে সে অসিও বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিত হচ্ছে।

মহারাজ যযাতি প্রথমে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী ক্ষেত্র থেকে সৈন্য পরিচালনা করে নিয়ে গেলেন উত্তরাভিমুখে। তাঁর রাজ্য সীমার প্রান্তে অস্তগিরিতে অবস্থিত কিরাত রাজ্য। এই উপদ্রুত অঞ্চল শাসনই মহারাজ যযাতির প্রথম লক্ষ্য। কিরাতরা মহা ধনুর্ধর জাতি। তারা সহজে পরাভব স্বীকার করতে চাইল না। পর্বতের আড়াল আর বৃক্ষশীর্ষ থেকে নিক্ষেপ করতে লাগল শাণিত শায়ক।

রাজা যযাতি সৈন্যদের আদেশ দিলেন অরণ্যে অগ্নি সংযোগের। রাজাদেশ মুহূর্তে প্রতিপালিত হল। শীতের শেষে বৃক্ষতলে স্তূপীকৃত শুষ্ক পত্রে অগ্নিসংযোগমাত্র তা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল অরণ্যের অভ্যন্তরে। বৃক্ষে বৃক্ষে জ্বলে উঠল অনল। সহস্র সহস্র পক্ষী পাখার শব্দে বাতাস বিদীর্ণ করে আকাশপথে উড়ে চলল। সারারাত্রি রহস্যময় আলো অন্ধকারের চিত্র ফুটে উঠল অস্তগিরির অরণ্যে অরণ্যে। স্কন্ধাবারে বিশ্রামরত সৈন্যরা শুনতে পেল প্রাণভয়ে পলায়মান পশুকুলের আর্তচিৎকার ও খুরধ্বনি।

প্রভাতে রাজসমীপে কিরাতবাহিনী এসে ভূমিতে ধনুঃশর নিক্ষেপ করে আত্মসমর্পণ করল। কিরাতরাজ করজোড়ে বললেন, সম্রাট, আমি আপনার অনুগত দাস। এখন থেকে আপনার

আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকব। কৃপা করে আর অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করবেন না। আমরা ব্যাধ জাতি। মৃগ আর পক্ষীই আমাদের সম্পদ। অরণ্য দগ্ধ হলে আমাদের রাজ্য ছেড়ি পশুপক্ষীরা পলায়ন করবে। আমরা শবর জাতি সামান্য উপঢৌকন এনেছি, গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

শবররাজ মূল্যবান মৃগনাভি কস্তুরী, ময়ূর পক্ষের ব্যজনী, মহামূল্য পার্বত্য রত্ন ও নানাপ্রকার অরণ্যজাত লতাগুল্ম থেকে প্রস্তুত ঔষধাদি সম্রাট যযাতির হাতে তুলে দিলেন।

মহারাজ যযাতি শবর নায়ককে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করে অভয়দান করলেন।

শবররাজ দুর্গম পার্বত্য পথযাত্রায় সম্রাটকে পথপ্রদর্শকের জন্য দিলেন কয়েকজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত অনুচর।

মহারাজ যযাতি তাদের সহযোগিতায় বহির্গিরি ও উপগিরির অধিকাংশ স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করলেন। বিপুল উদ্যম ও বাহুবলে তিনি অরণ্য প্রদেশের অধিবাসীদের পরাভূত করে আপন শক্তির স্বাক্ষর রাখলেন।

ব্রহ্মপুরায় বহু ক্ষত্রিয় নৃপতি সমবেত হয়ে মহারাজ যযাতির সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করল। মহারাজ অকুতোভয়ে সমবেত রাজন্যবর্গের সম্মুখীন হয়ে তাঁর বিক্রম প্রকাশ করলেন। সিংহের ন্যায় গর্জনকারী বলদৃপ্ত মহারাজের হস্তে বিঘূর্ণিত তরবারি দর্শন করে তারা বিভ্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণের পথ গ্রহণ করল।

মহারাজ যযাতি তাদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করে বললেন, আপনারা আমার সমতল সাম্রাজ্যকে সীমান্ত দুর্গের মতো পার্বত্য লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে রক্ষা করুন। এইভাবে আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন হোক।

যৌবন শক্তিতে উজ্জীবিত মহাপরাক্রমশালী সম্রাট অতঃপর কিম্পুরুষবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সমতলভূমি থেকে পর্বতারোহণের সময়ে তিনি নিম্নে রেখে এসেছিলেন তাঁর গজবাহিনী। অশ্বারোহণে তিনি পর্বতসংকুল রাজ্যগুলি অতিক্রম করছিলেন। এখন কিম্পুরুষবর্ষে প্রবেশের মুখে তিনি সীমান্ত রাজ্যগুলির কাছ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ লাভ করলেন দুই শতাধিক তিত্তির, মণ্ডুক, কল্মাষ নামক অশ্বরত্ন। এই সকল অশ্বের পদক্ষেপ সুনিশ্চিত। অতি দুর্গম বিঘ্ন-সংকুল পথে আরোহীসহ এদের যাত্রা নির্বিঘ্ন।

দুর্জয় সাহস ও অদম্য মনোবল নিয়ে মহারাজ যযাতি অগ্রসর হতে লাগলেন। পার্বত্য ঝঞ্ঝা ও শৈত্য প্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত হল তাঁর স্কন্ধাবার। তিনি হিমানী সম্প্রপাতে কাতর সৈন্যদের পর্বত সমতলে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। স্বয়ং মহারাজ একদল অতি দক্ষ অশ্বরোহী নিয়ে কিম্পুরুষবর্ষের শৈলঘেরা রাজধানী আক্রমণ করলেন। আশ্চর্য, কিম্পুরুষবর্ষের অধিবাসীরা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল না। প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজপুরী থেকে প্রেরিত হল একদল অতি সুদর্শনা গায়িকা। তারা মহারাজ যযাতি ও তাঁর সঙ্গের অশ্বারোহীদের সুললিত সংগীতে আপ্যায়িত করে রাজপুরীর দিকে নিয়ে চলল।

পর্বত খোদিত করে নির্মিত হয়েছে আশ্চর্য প্রাসাদ। প্রাসাদের সোপানরাজি বিধৌত হচ্ছে পর্বতশীর্ষ থেকে নিরন্তর প্রবাহিত সুশীতল জলধারায়। প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া সূর্যালোকে ঝলমল করে উঠছে। ঠিক প্রাসাদের পশ্চাৎপটে নীলাকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ধৌলাধার পর্বতের তুষারশৃঙ্গ। প্রাসাদের দুই ধারে সবুজ নিবিড় অরণ্য পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে গেছে শতুদ্রী নদীর শীলাসমাকীর্ণ তীরভূমি পর্যন্ত।

প্রাসাদ-নিম্নে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন মহারাজ যযাতি। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী অনুচরবাহিনী। কিম্পুরুষবর্ষের রাজা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ও চমরীপুচ্ছের চামর দান করে মহারাজ যযাতিকে সমাদরে নিয়ে গেলেন প্রাসাদে। তাঁর প্রাসাদের লোকেরা মহারাজের অশ্বারোহীদের পরিচর্যায় নিযুক্ত রইল।

সপ্ত দিবস স্বপ্নের মতো কেটে গেল মহারাজ যযাতির। এমন সুধাকণ্ঠ কিন্নরীদের সংগীত তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের কোথাও কোনও গায়িকার কণ্ঠে শ্রবণ করেনি।

কিম্পুরুষবর্ষের রাজা সখা বলে সম্ভাষণ করেছেন মহারাজ যযাতিকে। প্রতিদিন সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য বসেছে নৃত্যগীতের আসর। তাঁর এবং তাঁর অনুচরদের তুষ্টির জন্য পরিবেশন করা হয়েছে নানা ধরনের ভোজ্যবস্তু।

অভিভূত রাজা যযাতি এক সন্ধ্যায় সংগীতের আসরে কিম্পুরুষবর্ষের রাজাকে বললেন, সখা, আপনার আতিথ্যে আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। আমাকে এবার স্বরাজ্যে ফেরার অনুমতি দিন।

রাজা বললেন, এই সাতটি দিন রাজপুরীতে আপনাকে আতিথ্য দিতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি। আপনি কিম্পুরুষ বিজয়ে এসেছিলেন, সে বিজয় আপনার সম্পূর্ণ হয়েছে, কারণ আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বরের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। আপনি আমার সখা। আপনাকে কেবল একটি শর্তে ফিরে যেতে দিতে পারি। সে শর্তটি হল, আপনার অন্তরের ক্ষুদ্র একটি কোণে যদি এই সুদূরের বন্ধুটিকে স্থান দেন।

মহারাজ যযাতি নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন কিম্পুরুষবর্ষের উদার হৃদয় রাজাকে।

যে প্রভাতে যাত্রার দিন স্থির হয়েছে তার পূর্বরাত্রে দুই সখা বসে বসে কিন্নরীদের সংগীত শ্রবণ করছিলেন, এমন সময় কিম্পুরুষবর্ষের রাজা বললেন, এ কী সংগীত শ্রবণ করছেন বন্ধু, এর চেয়ে সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট সংগীত এই কিম্পুরুষবর্ষেই শোনা যায়।

সে কী বন্ধু!

হ্যাঁ সখা! তবে সে সংগীত ভাগ্যবান ব্যতীত কেউ শুনতে পায় না।

মহারাজ যযাতি বললেন, আমার দুর্ভাগ্য বন্ধু যে সে সংগীত শোনার সৌভাগ্য আমার হল না।

অপরাধ না নিলে কৃতার্থ হব সখা, আমার প্রাসাদে সে সংগীত অনুষ্ঠানের যদি কোনও সুযোগ থাকত তা হলে নিশ্চয়ই আপনাকে তা শোনাতাম।

কৌতূহলী যযাতি বললেন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয় সে সংগীত?

কিম্পুরুষবর্ষের সীমায় সুউচ্চ পর্বতরাজির কোলে এক অতি সুদৃশ্য অরণ্যভূমি আছে। সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে এক সরোবর। দিবালোকে সেই স্বচ্ছ সুনীল সরোবরে প্রতিবিম্বিত তুষার শৃঙ্গগুলি। নিশীথে, পূর্ণ চন্দ্রের আলোকে সে সরসীর শোভা অবর্ণনীয়। নীলকান্ত মণির মতো নীল জলে তখন হীরক খণ্ডের মতো দ্যুতি ছড়িয়ে ভাসতে থাকে খণ্ড খণ্ড হিমানী। আর বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে কিম্পুরুষবর্ষের সংলগ্ন গন্ধর্বলোক পার হয়ে নেমে আসে অলৌকিক রূপলাবণ্য দ্যুতি সম্পন্না এক অপ্সরা। সেই অপ্সরা ওই সরোবরের জলে অঙ্গ ডুবিয়ে স্নান করে। সারারাত্রি পূর্ণিমার চন্দ্র প্রত্যক্ষ করে তার স্নানলীলা।

ওই অপ্সরা সরোবরে নেমেই শুরু করে তার সংগীত। পূর্বাকাশে শুকতারা উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার কণ্ঠের সেই অলৌকিক সংগীত শোনা যায়। তারপর সেই অপ্সরা সমস্ত নিশীথ প্রকৃতির বুকে বিরহ ছড়িয়ে দিয়ে প্রভাতের পূর্বে অন্তর্হিত হয়।

বিস্ময়ে আবিষ্ট যযাতি বললেন, আশ্চর্য! সেই সরোবরে পৌঁছোবার নিশ্চয়ই কোনও পথ আছে, আর সেই পথ ধরে কিম্পুরুষবর্ষের অধিবাসীরা বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে ওই অপ্সরার গান শুনতে যাত্রা করে?

পথ আছে সখা কিন্তু সে বড় দুর্গম পথ। একমাত্র মেষপালক ছাড়া সেই পথে কেউ যাত্রা করতে পারে না। আবার বসন্ত পূর্ণিমার ঠিক সন্ধ্যালগ্নে সেই সরোবর তীরের অরণ্যভূমিতে পৌঁছোনো চাই। এমন লগ্নে দুর্গম পথযাত্রীকে সেখানে পৌঁছোতে হবে যখন পূর্ণ চন্দ্রটি প্রকাশ পাবে পর্বতের আড়াল থেকে। এই সমস্ত যোগাযোগ একজন দৈবনির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কারও ভাগ্যে ঘটে না। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই দর্শন করবার অধিকার পায় স্নানলীলারত অপ্সরাকে। শ্রবণ করে ধন্য হয় তার সেই অলৌকিক সংগীত।

মহারাজ যযাতি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন, সে পথের নিশানা আপনার জানা আছে বন্ধু?

একমাত্র পথ চলে গেছে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে, বনবনান্ত বিদীর্ণ করে। যে পথ দিয়ে আপনি কিম্পুরুষবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পথে এগিয়ে আসার সময়ে উর্ধ্বলোক থেকে গর্জনশীল একটি জলধারাকে নেমে আসতে দেখেছিলেন। ওই জলধারার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে সেই পথ চলে গেছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরে মেষচারকেরা ওই পথ দিয়ে তাদের মেষপাল নিয়ে চলতে চলতে সুস্পষ্ট একটি পথরেখার সৃষ্টি করেছে। ওই পথ সেই সরোবরতীরস্থ অরণ্যভূমি ছুঁয়ে বেঁকে চলে গেছে পূর্বাচলের দিকে।

পরদিন কিম্পুরুষবর্ষের রাজা সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিলেন বন্ধু যযাতি ও তাঁর অনুচরদের। মহারাজ যযাতি অতি উৎকৃষ্ট মেষলোম ও পালক নির্মিত একখানি গরম পরিধেয় লাভ করলেন বন্ধুর কাছ থেকে। শৈত্য যত প্রবলই হোক তা প্রবেশ করতে পারে না এই পোশাকধারীর দেহের অভ্যন্তরে।

অশ্বারোহীদের নিয়ে রাজা যযাতি দুই দিবস অতিক্রম করার পর উপস্থিত হলেন সেই গর্জনশীল জলধারার পাশে। সেখানে অশ্বারোহীরা অশ্ব থেকে নেমে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল।

রাজা যযাতি একাকী বিচরণ করতে করতে সেই পথের সন্ধান পেলেন। তাঁর সহসা মনে হল কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে ওই পথের দিকে। অপ্রতিরোধ্য সেই আকর্ষণ। তিনি ওই গর্জনশীল জলধারার মধ্যে কী যে এক সংগীতের সুর শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হল, তিনিই সেই দৈব নির্দিষ্ট ব্যক্তি যাঁর ভাগ্যে ওই সরোবরের অলৌকিক ঘটনাবলী দর্শনের সুযোগ রয়েছে। কাল গণনা করে দেখলেন তিন দিবস পরেই রোমাঞ্চকর সেই বসন্ত পূর্ণিমা। অনুচর অশ্বারোহীদের নিকটে আহ্বান করলেন মহারাজ যযাতি। বললেন, এইখানে তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল। তোমরা রাজ্যে ফিরে যাও। অমাত্যদের বলো, আমি যতকাল না ফিরি

ততকাল যেন তাঁরা আমার রাজ্য আমারই নামে পরিচালনা করেন। কোনও কিছু গুরুতর পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁরা যেন পুরুর মতামত গ্রহণ করেন। কোনওক্রমেই যদুকে যেন তাঁরা রাজকার্যে প্রবেশের সুযোগ না দেন।

বিস্মিত অনুচরেরা মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করে একসময় স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করল।

ঠিক তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যালগ্নে রাজা যযাতি অশ্বারোহণে এসে পৌঁছোলেন সেই শৈলঘেরা অরণ্যভূমির সরোবর তীরে। সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন পর্বতের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে বসন্ত পূর্ণিমার চন্দ্র।

মহারাজ যযাতি অশ্ব থেকে অবতরণ করে অশ্বটিকে বেঁধে রাখলেন অরণ্য বৃক্ষের আড়ালে। সন্ধান করতে করতে পেয়ে গেলেন বৃক্ষের অন্তরালবর্তী এক ক্ষুদ্র শৈলগুহা। তিনি সেখানে আত্মগোপন করে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি নিমেষ অতিক্রান্ত হবার পর রাজা যযাতি দেখলেন নীলকান্ত মণির মতো নীল সরোবরের জল কাঁপিয়ে একটা বাতাস বয়ে গেল। জলের মধ্যে ভাসমান তুষারখণ্ডগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে আশ্চর্য সুন্দর এক ধ্বনির সৃষ্টি করল। অরণ্য বৃক্ষের পত্রে বীণার ধ্বনির মতো শ্রুতিসুখকর ধ্বনি বেজে বেজে ফিরতে লাগল। রাজা যযাতির মনে হল, তিনি যেন গন্ধর্বসভা প্রত্যক্ষ করছেন। সুরযন্ত্রীরা শুরু করেছে যন্ত্রবাদন। এইমাত্র গীতশিল্পী প্রবেশ করে আরম্ভ করবে তার অলৌকিক সংগীত।

রাজা যযাতির বক্ষস্পন্দনকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করে দিয়ে সরোবর তীরে আবির্ভূত হল সেই অপ্সরা। অবর্ণনীয় অঙ্গ সুষমা তার। জ্যোৎস্নার থেকে একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে জড়িয়েছে অলৌকিক তনুদেহটি।

নৃত্য ভঙ্গীমায় দুই হস্ত প্রসারিত করে বস্ত্রখানি বাতাসে উড়িয়ে অপরূপা অপ্সরা একবার প্রদক্ষিণ করে নিল সমস্ত সরোবর। তারপর পালকের মতো নরম পরিধেয়খানি মহারাজ যযাতির সম্মুখস্থ বৃক্ষশাখায় লীলাভরে পরিত্যাগ করে নগ্ন দেহবল্লরী আন্দোলিত করতে করতে নেমে গেল সেই স্বচ্ছ শীতল সলিলে।

অপ্সরার করস্পর্শে জল থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল অজস্র মুক্তা কণিকার মত জলবিন্দু। সেই বিন্দুগুলি জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরী নিক্কণের মতো শব্দিত হতে লাগল।

শুরু হল সংগীত। চরাচর স্তব্ধ। সে সংগীতের সুর পুষ্প পরাগের মতো বাতাসে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সান্ধ্য প্রকৃতির বুকে।

রাজা যযাতির মনে হল কোনও স্বর্গীয় বিহঙ্গ সেধে চলেছে তার সুমিষ্ট স্বর। অশ্রুতিপূর্ব সেই সংগীত একেবারে হৃদয়ের গভীরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। মোহাচ্ছন্ন রাজা সারারাত্রি ব্যাপী শুনলেন সেই অপ্সরার অলৌকিক সংগীত। দেখলেন অদৃষ্টপূর্ব দেহধারিণীর স্নানলীলা। যখন শুকতারা উদিত হল পূর্বাশায় তখন সহসা থেমে গেল সেই অবর্ণনীয় হৃদয় মথিত করা সংগীত।

জল থেকে উঠে দাঁড়াল সেই অপরূপা। একটা শুভ্র রাজহংসী যেন উঠে এল স্নান সাঙ্গ করে।

মহারাজ যযাতি মুহূর্তে গুহার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে অপ্সরার পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ডটি বৃক্ষশাখা থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে আবার গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

ললিত পদবিক্ষেপে বৃক্ষের কাছে এসে দাঁড়াল সেই অপ্সরা। বিস্ময়ে স্তম্ভিত। কোথায় গেল তার সেই বস্ত্রখণ্ড, যাকে স্পর্শ করলে তার দেহ পালকের মত হালকা হয়ে যায় আর সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে যেতে পারে দেবলোকে। ত্রস্ত পদক্ষেপে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে সে তার বস্ত্র অন্বেষণ করতে লাগল। কিন্তু হায়, কোথায় সেই মায়া নির্মিত বস্ত্র যা নইলে সে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে অনন্তকাল থেকে যাবে এই মর্তলোকে।

অপ্সরা সহসা আকাশের দিকে তাকাল। শুকতারাটি যেন সজল চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। সে যে আর থাকতে পারবে না আকাশে। দিগন্তে দেখা দিয়েছে সেই ব্যাধ যে এখুনি শুরু করবে সুবর্ণ শর হেনে তার প্রভাতি মৃগয়া।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিগত হয়ে যাবে অপ্সরার যথেচ্ছ ভ্রমণের মহিমা। দুই করে আঁখি আবৃত করে নতজানু হয়ে বসে পড়ল সেই অপ্সরা। রাজা যযাতি এগিয়ে গেলেন তার কাছে। বস্ত্রখানি জড়িয়ে দিলেন তার তনুদেহ ঘিরে। বললেন, ক্ষমা করো দেবী, আমিই সেই তস্কর যে তোমার বস্ত্রখানি অপহরণ করেছিল।

চমকে উঠে দাঁড়াল অপ্সরা। আকাশে তখন শুরু হয়ে গেছে আলোর প্লাবন। রাজা যযাতির দিকে ব্যথা ভরা চোখে চেয়ে সে বলল, তুমি জানো না মর্তলোকবাসী, কী বিপর্যয় ঘটে গেল আজ আমার জীবনে। একটি বছরের মতো রুদ্ধ হয়ে গেল আমার জন্যে স্বর্গের দ্বার। আবার যখন ফিরে আসবে বসন্ত পূর্ণিমার এই রাত্রি কেবল তখনই আমি পাব মুক্তি, তার আগে নয়।

হে দেবী, সেই একটি বছর এই মর্তলোকে হোক তোমার অবস্থান। আমি যযাতি, এই মর্তভূমির অধীশ্বর, তোমার সেবা করে কৃতার্থ হই।

মর্তরাজ যযাতির সঙ্গে স্বর্গনটী ঘৃতাচী সেই সরোবর তীরের অরণ্যে অতিবাহিত করল একটি বছর। যযাতি শোনাল অপ্সরা ঘৃতাচীকে তার পূর্বপুরুষ পুরুরবা আর স্বর্গনটী উর্বশীর মিলনের কাহিনী। কামমোহিত, প্রেমমোহিত যযাতি আর ঘৃতাচী। নৃত্যে, সংগীতে, কলহাস্যে সে অরণ্য যেন এক নব ইন্দ্রলোক। নির্জন নীল সরোবর-সলিলে উভয়ের স্নানলীলা; অশ্বারোহণে উভয়ের পরিভ্রমণ; পর্বতগুহায় নিবিড় আলিঙ্গনে নিশিযাপন; দুটি হৃদয়কে বেঁধে দিল অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে।

একটি বছর পরে ফিরে এল সেই বসন্ত পূর্ণিমা। সারা নিশি চলল স্নানলীলা আর অলৌকিক সংগীত। শেষে যখন শুকতারা উঠল আকাশে, অরণ্য জুড়ে বেজে উঠল বিদায়ের সুর, তখন ভগ্ন হৃদয় রাজা যযাতি আপন হাতে তুলে দিল অপ্সরা ঘৃতাচীর স্বর্গলোক যাত্রার অবলম্বন সেই বস্ত্রখানি। ঘৃতাচী স্থির দৃষ্টিতে তাকাল যযাতির দিকে। ইন্দ্রের মতো বীর্যবান দেহ, কিন্তু আঁখিতে স্থির হয়ে আছে ব্যথার সজল ঘন মেঘ। স্বর্গের দেবতা কি কোনদিন ঘৃতাচীকে দিতে পারবে এমনি এক ব্যথা ভরা হৃদয়ের উপহার?

সূর্য উঠল, শুকতারা অদৃশ্য হল, কিন্তু সে অরণ্যভূমি ছেড়ে, রাজা যযাতির আকর্ষণ ছিন্ন করে স্বর্গে ফেরা হল না আর অপ্সরা ঘৃতাচীর।

এমনি করে মহাকাল পরিক্রমায় যৌবনের লীলারঙ্গে প্রমত্ত প্রেমিক যুগলের কেটে গেল সংখ্যাহারা বিরহ ব্যাকুল বসন্ত।

কালযাত্রায় আবার এল এক বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি। সেদিন যযাতি অন্যমনা। যে-কোনও দূরের বিস্মৃত জীবন তাকে বারবার ব্যাকুল হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উভয়ের নিশীথ জলকেলিতে কোথায় যেন ক্ষণে ক্ষণে পড়ে যাচ্ছে ছেদ। সংগীত পরিবেশন করতে গিয়ে ঘৃতাচী অবাক হয়ে দেখল, মহারাজ যযাতির মনে কোথায় যেন হয়ে যাচ্ছে বারবার তালভঙ্গ।

গান থেমে গেল। মহারাজ সচকিত হয়ে উঠলেন।

থামলে যে?

মহারাজ আর এই মর্তলোকে ঘৃতাচীর সংগীত কোনদিনও শোনা যাবে না।

অপরাধ নিয়ো না ঘৃতাচী, আমি সত্যিই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

আমি বুঝেছি মহারাজ, পূর্ব কোনও স্মৃতির বেদনায় মথিত হচ্ছে তোমার হৃদয়।

তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ঘৃতাচী। আমার মন আজ বারে বারে স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তোমাকে জানাতে পারিনি এতকাল, আমি এক অভিশপ্ত মানুষ। ঋষি শুক্রাচার্য আমার পূর্ব যৌবনকালে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। অবশ্য বলেছিলেন, যদি কেউ তার যৌবন আমাকে দান করে আমার জরা গ্রহণ করে তা হলে আমি আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পাব। আমার তরুণ পুত্র পুরু আমাকে তার যৌবনদান করে ভয়ংকর জরা গ্রহণ করেছে ঘৃতাচী। তাকে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই তার যৌবন।

স্তব্ধ বিস্মিত ঘৃতাচী উঠে দাঁড়াল। কাতর কণ্ঠে বলল, মহারাজ, ফিরে যাও, ফিরে যাও নিজ রাজ্যে। যে সর্বত্যাগী তরুণ তাপস স্বেচ্ছায় তোমাকে তার যৌবন দান করে জরাগ্রস্ত হয়ে বসে আছে তাকে ফিরিয়ে দাও তার যৌবন। না হলে আমাদের এই সুদীর্ঘ যৌবন-বিহার ব্যর্থ হয়ে যাবে মহারাজ।

দুটি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস জলে, স্থলে, অরণ্যে, নভলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

পূর্বাশায় শুকতারা প্রতীক্ষাকাতর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। অরণ্যভূমির আড়ালে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে চন্দ্র। মহারাজ যযাতি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তাকিয়ে রইলেন নভলোকের দিকে। ফিরে চলেছে অনন্ত যৌবনা ঘৃতাচী। একটি শ্বেত হংসের মতো দুটি শ্বেতপক্ষ মেলে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সে গন্ধর্বলোক পার হয়ে চির আনন্দলোকের দিকে। দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বলোক থেকে রাজা যযাতির ললাটে ঝরে পড়ল মুক্তাবিন্দুর মতো দুটি নিটোল অশ্রুবিন্দু।

৫

পুত্র, পুত্র, আমি এসেছি।

কে? মহারাজ? জরাভারে আমি অন্ধ, পঙ্গু। লুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে প্রণাম নিবেদন করতে পারছি না পিতা।

তোমার যৌবন ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও পুত্র। প্রজ্বলিত হচ্ছে আমার দেহ যৌবনের প্রদীপ্ত অগ্নিতে। নিত্য কামনায় ঘৃতাহুতিতে সে অগ্নি অনির্বাণ। সম্পদ, রাজ্য, দেহ

সব কিছু আহুতি দিয়েছি এই অগ্নিতে। কিন্তু ক্ষুধা মেটেনি। আকাঙ্ক্ষা চির অতৃপ্ত থেকে গেছে। যৌবনে নিবৃত্তির শান্তি নেই পুত্র, আছে শুধু প্রবৃত্তির দাহ। জরা দাও, মৃত্যু দাও, দূর হোক যৌবনের অগ্নিদগ্ধ জ্বালা।

মহারাজ যযাতি ঋষি শুক্রাচার্যকে স্মরণ করে অন্ধকার গৃহমধ্যে উপবেশন করলেন। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন জরাগ্রস্ত পুত্রকে। সঙ্গে সঙ্গে এক অগ্নি থেকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল আর এক অগ্নি। মহারাজ যযাতির দেহ নির্বাপিত সমিধের মতো কৃষ্ণবর্ণ, গলিত ও জীর্ণ হয়ে গেল। পিতার চরণে প্রণাম নিবেদন করে উঠে দাঁড়াল তরুণ সূর্যের মতো প্রদীপ্ত কুমার পুরু।

তখন শেষ সূর্যের রক্ত রশ্মি বসন্তের পুষ্পিত বনভূমিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে কুমার পুরু প্রবেশ করল অরণ্যালোকে। কয়েকটি চিত্রিত হরিণ-হরিণী ব্যস্ত ছিল সরোবরে জলপানে, তারা অশ্ব-খুরধ্বনি শুনে মুখে তুলে চেয়ে রইল।

পুরু দ্রুত অশ্ব চালনা করে এসে দাঁড়াল উদ্যানরক্ষক দেবলের কুটিরের সম্মুখে। কেউ কোথাও নেই। কেবলমাত্র কয়েকটি মৃত্তিকার স্তূপের ওপর শুষ্ক পত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে।

রুদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল পুরুর। সে রাজপ্রাসাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে অন্তহীন কাল যার নাম জপমন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে গেছে, যার মুখচ্ছবি অন্ধকারের সরোবরে কমলের মতো ফুটে উঠতে দেখেছে, কোথায় তার সেই মানস প্রতিমা শ্রুতি। সুদীর্ঘ জরার বেদনায় সে যে একমাত্র তারই স্মৃতিকে অবলম্বন করে লাভ করেছে পরম শান্তি।

শ্রুতি—শ্রুতি...।

পুরুর আকুল আহ্বানের পথ বেয়ে কোনও উত্তরই ধ্বনিত হল না বনভূমির কোনও প্রান্ত থেকে।

একটা অবরুদ্ধ হাহাকার অন্তরের নিভৃত কোণে কোণে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল। পুরু অশ্বের মুখ রাজধানীর দিকে ফিরিয়ে নিল। ভগ্ন হৃদয়ে অতিক্রম করতে লাগল জনশূন্য কাননভূমি।

সহসা অশ্বের বলগা আকর্ষণ করল পুরু। ওই তো এক অথর্ব বৃদ্ধা বসে আছে পথের ধারে পুষ্পিত শাল্মলী বৃক্ষের তলায়। পাশে রক্ষিত জলের কলস।

পুরু অশ্ব থেকে অবতরণ করে বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হল। উচ্চকণ্ঠে বলল, আচ্ছা বলতে পারো, উদ্যানরক্ষক দেবল এখন কোথায়?

বিস্মিত বৃদ্ধাটি চোখের ওপর হাত রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করে আগন্তুককে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুস্পষ্ট কোনও ছবি ফুটে উঠল না তার চোখে।

সে জড়িত কণ্ঠে বলল, উদ্যানরক্ষক।—বলেই ঊর্ধ্বলোকের দিকে কম্পিত হাতখানি তুলে ধরল।

দেবল মৃত। আচ্ছা বৃদ্ধা, তুমি বলতে পারো দেবলের কন্যা শ্রুতি কোথায়?

হাতছানি দিয়ে পুরুকে আরও কাছে ডাকল বৃদ্ধা। তাকে দেখবার চেষ্টা করে এবারও ব্যর্থ হয়ে বলল, তুমি কে?

আমি রাজকুমার পুরু।

আশ্চর্য, সহসা যেন প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধার মুখখানা। পুরুর একখানা হাত তার কম্পিত হাতের মধ্যে ধরে বলল, এত যুগ পরে তুমি তোমার শ্রুতির কাছে এলে কুমার। দেখো তো দেখি এ বৃদ্ধার ভেতর সেই চঞ্চল তরুণী শ্রুতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পাও কিনা?

নতজানু হয়ে বৃদ্ধার কাছে বসল পুরু। আনন্দে উদ্ভাসিত, অশ্রুতে প্লাবিত শ্রুতির মুখখানা অঞ্জলি বদ্ধ হাতে তুলে ধরে বলল, এই তো আমার শ্রুতি। এ মুখ, এ চোখ কি কোনওদিন ভোলা যায়!

আশ্চর্য! মুহূর্তে বৃদ্ধা রূপান্তরিত হয়ে গেল চঞ্চলা তরুণী কান্তিময়ী শ্রুতিতে।

অনন্ত যৌবন তুলে ধরে আছে জরার মুখখানি। বলছে, আমার কাছে আছে সেই সঞ্জীবনী সুধা যার স্পর্শে জরা পূর্ণ হয়ে উঠে অমিত প্রাণের লাবণ্যে। আমিই তো শীতের রিক্ত শাখায় শাখায় যৌবন বসন্তের পুষ্পিত প্লাবন এনে দিই।

উর্বশী

উর্বশী

ত্বদ্‌গুণাকৃষ্টচিত্তাহমনঙ্গবশমাগতা।
চিরাভিলষিতো বীর মমাপ্যেষ মনোরথঃ।।
তৎ প্রসীদ ন মামার্তাং ন বিসর্জয়িতুর্মহসি।
হৃদয়েন চ সন্তপ্তাং ভক্তাঞ্চ ভজ মানদ।।

—মহাভারত

[হে চিরাকাঙ্ক্ষিত বীর, তোমার গুণপনায় আকৃষ্ট হয়ে আমি মদনদেবের বশীভূত হয়েছি। তোমার সঙ্গ আমার চির-অভিলষিত। অতএব হে মানদ কামসন্তপ্তকে পরিত্যাগ করা কোনওমতেই তোমার উচিত নয়। আমাকে তুমি পরিত্যাগ কোরো না।]

প্রসঙ্গ কথা

সুরপতি বাসবের সর্বশ্রেষ্ঠ সভা-নর্তকী উর্বশী। অনন্তযৌবনা নর্তকীর ভ্রূভঙ্গে 'ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল'। লাস্যলীলার মূর্তিমতী প্রতিমা উর্বশীর ওপর ভার পড়ল অর্জুনের চিত্তবিনোদনের। সুরলোকে অর্জুন তখন পরম সমাদরে গৃহীত অতিথি।

এক কামনাবিহ্বল নিশীথে পুরুষের চিত্তজয়ী সব কয়টি শরে আপনাকে সজ্জিত করে উর্বশী এসে দাঁড়ালেন পার্থের সম্মুখে। পার্থ সৌন্দর্যের কাছে হৃদয়ের উৎসারিত নমস্কার নিবেদন করলেন। কিন্তু যখন জানলেন, সুরপতি ইন্দ্রের লীলাবিলাসিনী উর্বশী তাঁকে আত্মনিবেদনে উদ্যত, তখন তাঁর সামাজিক সম্বন্ধে পরিবর্ধিত সম্ভ্রান্ত মন সংকুচিত হল। তিনি পিতা ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে আপন জননী বলে বরণ করতে চাইলেন।

উর্বশী প্রস্তুত ছিলেন না এরূপ আশাহত অভ্যর্থনায়। উর্বশী জনপদবধূ। লোকচিত্ত রঞ্জনই তাঁর একমাত্র অনুষ্ঠান। প্রতিজনে সমদৃষ্টিতে দর্শনই তাঁর জীবনবেদ।

সামাজিক অর্জুন আর সমাজ-বহির্ভূতা লোকললনা উর্বশীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান এবং সংঘাতমূলক উত্তর প্রত্যুত্তরই এই কাব্যনাট্যের বিষয়সীমা।

[বৈজয়ন্ত ধাম। বাসবের সুরম্য অতিথিনিবাসে বিশ্রামরত অর্জুন। চন্দ্রকরস্নাত নন্দন কানন। বিচিত্র পুষ্পের মধুস্রাবী সুবাসে মন্থর পবন।]

[দ্বারে মৃদু করাঘাত]

অর্জুন ঃ [স্বগত]

নন্দনের গন্ধবহ মনে হয় প্রমত্ত কৌতুকে
করাঘাত হানে দ্বারে; বসন্তের অজস্র যৌতুকে
সুসজ্জিত বনস্থলী; বুঝি তাই দক্ষিণ পবন
দিকে দিকে তোলে তার আনন্দের তরঙ্গ-কম্পন।

[পুনরায় করাঘাত]

অর্জুন ঃ [সোচ্চার]

শয্যায় জাগ্রত পার্থ, দ্বারে কার কঙ্কণের ধ্বনি?
অনিরুদ্ধ গৃহপথ, স্বাগতম্ শুভ আগমনী।

[দ্বার উন্মুক্ত হল। রত্নাবলীর দ্যুতিতে মুহূর্তে দীপ্ত হল বিশ্রামকক্ষ। শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পার্থ। মোহিনী মূর্তিতে উর্বশী দেহলী-সীমায় লীলাভরে করস্থাপন করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন পার্থের দিকে।]

অর্জুন ঃ [সবিস্ময়ে স্বগত]

আকুল বসন্ত বুঝি বধূবেশে আমার সম্মুখে
এইমাত্র আবির্ভূত, সর্বদেহ কী গভীর সুখে
পুষ্পিত লতার মতো রোমাঞ্চিত, দীপ্ত বর্ণময়ী,
কোকিল কণ্ঠটি স্তব্ধ, এইমাত্র ভুবন-বিজয়ী
সংগীতের সপ্তসুরে মত্ত হবে, শুধু অপেক্ষায়
কার যেন ইঙ্গিতের; ভ্রমর সে চোখের তারায়
প্রতীক্ষিত পক্ষ তুলে, শুরু হবে পুষ্প-মধুপান,
দক্ষিণ পবন ওই প্রশ্বাসের মধুর আঘ্রাণ
অঙ্গে মেখে মত্ততনু, প্রবাহের প্রতীক্ষায় জাগে;
অশোক কিংশুক পুষ্প চেলাঞ্চলে দীপ্ত অনুরাগে
চিত্রিত রয়েছে ওই; মূর্তিমতী বাসন্তিকা বধূ
অঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের উৎসারিত মধু।

[সোচ্চার]

বসন্তের বধূমূর্তি, কে আপনি, কিবা অভিলাষে
এসেছেন এ নিশীথে একাকিনী পার্থের সকাশে?

উর্বশী ঃ

আমি এক নির্ঝরিণী, চিরন্তন প্রবাহিত তনু,
শতমুখী কামনার-'শরে বিদ্ধ করেছে অতনু
আমার উদ্বেল বক্ষ, তাই আমি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে
প্লাবিত করিয়া তীর, প্রেমমুগ্ধ কলমন্দ্রভাষে
প্রীতির স্বাক্ষর আঁকি; তীরে তীরে আমার মিলন,
যাত্রাপথে উদ্বেলিত তরঙ্গিত আমার যৌবন।

অর্জুন ঃ

মধুস্থলী স্বর্গভূমি, দেবকুল তার মধুকর,
পারিজাত মধু দিয়ে পূর্ণ হয় চক্রের কুহর,
মধুমতী মন্দাকিনী, মধুবাহী মলয় সমীর,
মধুর মধুর সব, চিত্ত তাই পরম গভীর
এ মধু উৎসব যজ্ঞে; তুমি সেই মধুচক্রে লীন
মক্ষিরাণী সৌন্দর্যের, প্রার্থিত প্রাসাদে সমাসীন
স্বর্গের যৌবন-লক্ষ্মী; নাও আজ নত নমস্কার,
অতিথি পার্থের কণ্ঠে সৌন্দর্যের হোক মন্ত্রোচ্চার।

উর্বশী ঃ

রূপের পূজারী পার্থ, আমি নটী স্বর্গের রূপসী
তোমার সেবার লাগি দেখো চেয়ে প্রস্তুত উর্বশী।

অর্জুন ঃ

উর্বশী! স্বর্গের নটী! এ শ্রবণে কিবা শুনিলাম,
তুমি মাতা অর্জুনের, শ্রীচরণে রাখিনু প্রণাম।

উর্বশী ঃ [স্বগত]

কী অসহ দাহ অঙ্গে উর্বশী হতেছে হৃতবল
সহস্র বৃশ্চিক বুঝি হৃৎপিণ্ডে ঢালিছে গরল।

[সোচ্চার]

মাতা, মাতা, একী উক্তি! লোকজায়া আমি চিরন্তন,
আমি হবি, পুরুষের কামনার সুপ্ত হুতাশন
মুহূর্তে প্রদীপ্ত করি; চরণেতে চঞ্চল মঞ্জীর
ঝংকারে ত্রিলোকচিত্ত করে তুলি চকিত অস্থির;
প্রথম রমণী আমি, বিধাতার প্রেমের প্রতিমা
অনন্তযৌবনা নারী, প্রণয়ের স্বপ্ন মাধুরিমা;
হে পার্থ করেছ ভুল, মাতা নহি, আমি সহচরী
দেখ চেয়ে স্বর্গলোকে কী মধুর নেমেছে শর্বরী!
পারিজাত পরিমলে অন্তরের মধু-মাদকতা,
কলস্বনা মন্দাকিনী প্রণয়ের করে কথকতা;

স্বর্গ কোথা? দেখো চেয়ে তোমাতে আমাতে স্বর্গলোক,
কণ্ঠে হোক উচ্চারিত প্রণয়ের সুখশ্রুত শ্লোক;
নয়ন-দর্পণখানি তুলে ধরো পরম তৃষ্ণায়
দেখো চেয়ে উর্বশীর দেহভঙ্গে প্রণয়-মূর্চ্ছায়।
কত কামনার ঢেউ উঠে পড়ে, কত সমর্পণ,
ভাষাহীন আকুতির কত মধুমত্ত শিহরণ।

অর্জুন ঃ

স্বর্গ-বিলাসিনী তুমি, তবু জেনো আমার জননী
হৃদয়ে নিয়ত বাজে ওই নামে মাতৃমন্ত্র ধ্বনি,
বাসব মানস-পিতা, তুমি তাঁর নর্ম-সহচরী
প্রণাম রাখিনু পদে, জননীর অধিকার স্মরি।

উর্বশী ঃ

জনপদবধূ জেনো চিরদিন সমাজ বাহিরে
রাখে নিত্য আপনারে; তার এই দেহখানি ঘিরে
সামাজিক মানুষের কামনার ঢেউগুলি ভাঙে,
সমাজে বিশুদ্ধ রেখে, মানুষেরে পরম সোহাগে
নিত্য করে আমন্ত্রণ; স্বয়ং সে পরিচয়হীন,
আপন শাসিত রাজ্যে প্রণয়ের কেতন উড্ডীন
রেখেছে সে রাত্রিদিন; সামাজিক সম্বন্ধের ভার
নিঃশেষে বিলুপ্ত করে রেখেছে সে আপন সত্তার
অস্তিত্ব অটুট জেনো; উর্বশী জননী কারও নয়,
ত্যাগ করো বীর্যবান, সন্তানের মিথ্যা অভিনয়।

বারাঙ্গনা আমি, তাই সর্বজনে আত্মসমর্পণ,
এ দৃষ্টিতে প্রতি নরে আমি শুধু দেখি নারায়ণ;
পিতা পুত্র ভ্রাতা বন্ধু, সমাজের সকল সংযোগ
ছিন্ন হয় কাছে এলে, আমি সেই আদিম-সম্ভোগ
সৃষ্টির মন্থনজাত আমি সেই অমৃতকুমারী,
জননীর ভারমুক্ত, সর্বভোগ্যা শুধু রম্যা নারী।
স্বর্গভূমি সম্ভোগের, দেহমনে জ্বালাও অনল,
নিশীথে অনঙ্গদাহ, উর্বশীরে কোরো না বিফল।

অর্জুন ঃ

মানিলাম চিরবধূ, কিন্তু তুমি বাসব-সঙ্গিনী
কী করে তোমারে আমি মেনে নেব লীলা-বিলাসিনী?
পিতার আনন্দসঙ্গী, সেখানেতে সম্বন্ধ শ্রদ্ধার।

উর্বশী ঃ

অর্জুন, এ যুক্তি জেনো এই ক্ষেত্রে একান্ত অসার;
লোকবধূ চিরদিন বসন্তের পূর্ণ বনস্থলী,
সর্বলোকে সমভাবে দান করে মধুর অঞ্জলি।

একদিন মধুলগ্নে বসন্তের অশোক ছায়ায়
বসেছিল পিতা মাতা পরিতৃপ্ত মোহিনী মায়ায়
তাই বলে পুত্র তার কখনও কি বসন্তের দিনে
যাবে না অশোক কুঞ্জে বধূ নিয়ে পথ চিনে চিনে?
কোনওদিন এ আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রটিরে দেখে
তোমার প্রণম্য পিতা জননীরে নিয়েছিল ডেকে
একান্ত সান্নিধ্যে তার; চুপি চুপি বলেছিল বাণী,
আকাশের চন্দ্র তুমি কিন্তু এই হৃদয়ের রানি;
জননীর উপমান, তাই বলে বল কোন জন
পুত্র হয়ে সেই চন্দ্রে প্রেমনেত্রে করে না দর্শন?
লোকবধূ চিরদিন পুষ্প, চন্দ্র, দক্ষিণ সমীর,
সমভাবে উপভোগ্য, জেনো পার্থ এই প্রতীতির
কখনও হবে না ক্ষয়, ত্যাগ করো মিথ্যা সে সংস্কার

অর্জুন ঃ

সংস্কার হৃদয় ধর্ম, পরাভব সব বাসনার
সেই যুক্তিহীন রাজ্যে; আমি যে সমাজে বাস করি
সেখানে সম্বন্ধে বাঁধা নরনারী, পরস্পরে স্মরি
বিচিত্র জালেতে আছি বিজড়িত, সেই মহাসুখ-
অন্য কোনও সুখ নয় অভীপ্সিত, নহিক উৎসুক
এ প্রমত্ত লীলারঙ্গে; স্বর্গনটী লও নমস্কার।

উর্বশী ঃ

কী অসহ প্রত্যাখ্যান, কী নির্মম যন্ত্রণার ভার
আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে; ব্যর্থতার শিলা জগদ্দল
রবে বক্ষে চিরদিন, প্রণয়ের নিষ্ঠুর সম্বল।

———

সত্যবতী

সূত্রধার ঃ

পৌর্ণমাসী সুধাকর, অনাবৃত শ্বেতশুভ্র তনু
যমুনার তরঙ্গে ভাসায়।
সুনীলবসনা নারী সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে তুলে
প্রার্থিত পুরুষে দেয় আলিঙ্গন অবিরত।
আসঙ্গ লিপ্সায় মত্ত পুরুষ রমণী।
সমস্ত রজনী এই শিহরন-লীলা—
রজত নীলের দোলা, উপভোগরত এই ঋষি।
যমুনার কূলে কূলে সারারাত পথ পরিক্রমা,
সাধনায় লব্ধ শক্তি যত —
রাত্রিশেষে নিঃশেষিত প্রথম রিপুর তীব্র গরল উদ্‌গারে।
কী অমোঘ পুরুষ-প্রকৃতি আকর্ষণ।
সংযমের আবরণ উড়ে যায় উদ্দাম হাওয়ায়,
প্রকৃতির লজ্জাবস্ত্র টেনে খোলে পুরুষের হাত।
নিশি শেষ হয়ে আসে, শুকতারা হাসে পূর্বাশায়।
পারঘাটে এসে যান কামনা-কাতর পরাশর।

পরাশর ঃ

প্রার্থিত রমণ-ভূমি নির্জন–নিরালা—
অরণ্যের আবছায়া,
শ্যাম তৃণদলে কোমল মিলনশয্যা।
পুষ্প গন্ধবহ বায়ু, অরণ্য মাতায়।
কামনায় দিগ্ধ দুটি প্রাণ।
অলক্ষ্যে কোথায়, মধুর সন্ধানে —
গুঞ্জনে প্রমত্ত মধুকর।
পুষ্পে পুষ্পে পরাগ মাখায় প্রজাপতি।

সূত্রধার ঃ

মৎস্যগন্ধা, তোমার চৈতন্যে হোক সত্যের প্রকাশ,
নারী তুমি, সীমাহীন অভিধা তোমার, —
কন্যা আদরিণী,
হৃদয়বাসিনী জায়া,
জননী মমতাময়ী।
এতকাল কন্যা ছিলে তুমি —
আজকে পুরুষ-অঙ্কে তোমার নতুন জন্মলাভ।
সমুদ্র-মন্থনে তুমি আজ অঙ্কলক্ষ্মী নারী,

অমৃত ভাণ্ডের থেকে সুধা ঢালো তৃষিত হৃদয়ে।
এসো নারী প্রিয়তমা হয়ে,
পুরুষের বক্ষে হোক তোমার প্রথম অভিষেক।
তিল তিল কামনার মূর্তিমতী তুমি তিলোত্তমা।
দূরাগত সুর-মূর্ছনায় কাঁপে প্রভাতের লগ্ন,
কোন্ তরুণীর তনু ভিজে গেছে আঁখি-ধারাপাতে?
চাঁদের সুষমামাখা মুখ আনত বিরহ বেদনায়।
রাগ পটমঞ্জরীর সুরে
প্রিয়-বিরহের দীর্ঘশ্বাস।
তরুণ দেহের তটে এখনও তোলেনি ঢেউ প্রার্থিত পুরুষ।
পারঘাট লক্ষ্য করে বহিত্র চালিয়ে
আসে সেই কন্যা নিরুপমা।
কণ্ঠে তার কাঁপে সুর। বৈঠা সঞ্চালনে
যমুনার জ্যোৎস্নামাখা জলে ছড়ায় অভ্রের কুচি।
নৃত্যরতা নীলময়ূরীর –
কলাপে কাঁপছে শেষ চাঁদের ঝালর।

পরাশর ঃ [স্বগত]

কী আশ্চর্য! কামনা কি কায়ারূপ ধরে!
সারারাত বাসনার অগ্নিশিখা জ্বলছে অন্তরে।
অস্থি-মজ্জা-মেদ তাতে দিয়েছি আহুতি।
সেই যজ্ঞ-অগ্নি থেকে
জেগেছে কি, কন্যা নিরুপমা!
বৈঠার সঞ্চালনে আন্দোলিত দুটি নগ্ন বাহু।
একি কোনও উড়ন্ত অপ্সরা?

মৎসগন্ধা ঃ [পারঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে স্বগত]

কী পুণ্য আমার!
ঊষালগ্নে প্রথম পারার্থী আজ জটাজুটধারী ঋষিবর।
দিনের সূচনা শুভ।
[স্পষ্ট উচ্চারণে] দাস রাজকন্যা আমি, শূদ্রকুলে সংবর্ধিত,
তাই – দূর থেকে প্রণতি জানাই।

পরাশর ঃ [স্বগত]

খাদ্য নেই সুতীব্র ক্ষুধার,
তৃষ্ণা মেটাবার জল নেই,
শুধু প্রাপ্য প্রথাগত শুষ্ক নমস্কার!
সারা দেহ ধূ ধূ মরুভূমি।
ঋষি কি মানুষ নয়,

পঞ্চভূতে গড়া নয় ঋষির শরীর?
ইন্দ্রিয়তাড়িত নয় এই নরদেহ?

[স্পষ্ট উচ্চারণে] অস্পৃশ্য কখনও নয় নারী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে
ব্রাহ্মণেরও কাম্যধন রমণীরতন।

মৎসগন্ধা ঃ [ঋষি পরাশরের চরণস্পর্শ করে]
আজ ধন্য আমার জীবন।
প্রভুর কৃপায়
অস্পৃশ্যেরও হল স্পর্শলাভ।

পরাশর ঃ
তুমি মূর্তিমতী ঊষা।
আমার সমস্ত অঙ্গে ঢেলে দাও ও রূপমাধুরী।
পান করে ধন্য হই তৃষ্ণার্ত তাপস।

মৎসগন্ধা ঃ [স্বগত]
কী অর্থ নিহিত আছে ঋষির এ বাক্য-মালিকায়!

[মৃদু উচ্চারণে] মূর্খ আমি প্রভু,
আপনার সুধাবাক্য অনুভব করে ধন্য হই–
এমন ক্ষমতা নেই বুদ্ধিহীনা এ দাসকন্যার।

পরাশর ঃ [স্বগত]
সংযমের শেষ প্রান্তে রয়েছি দাঁড়ায়ে।
নিম্নে গিরিখাত সুগভীর।
তুষার জটার থেকে যেন নেমে এসে
নির্ঝরিণী ঝাঁপায় গহন-গিরিখাতে।
সেখানে অরণ্যালোকে সরীসৃপ-পরিক্রমা তার।
কস্তুরী মৃগেরা ছুটে নাভিগন্ধে অরণ্য মাতায়।
বৃন্তচ্যুত পুষ্পদল জলে ভেসে যায়।

[স্পষ্ট উচ্চারণে] এসো নারী কামনার ধন
আলিঙ্গনে তৃপ্ত করো তৃষাতপ্ত ঋষির হৃদয়।
দূরে থাক হোমের আঘ্রাণ
রক্ত মাংসে গড়া এই দেহ,
তার ঘ্রাণ বড় বেশি কাম্য মনে হয় এইক্ষণে
আরও কাছে এসো নিতম্বিনী।

মৎসগন্ধা ঃ [স্বগত]
ইন্দ্রিয়-নিরোধ যাঁর ধর্ম বলে জানি,
তাঁর বাক্যে এ কী স্ফূর্তি প্রথম রিপুর!

[মৃদু উচ্চারণে] অসহ্য মৎসের গন্ধ শরীরে আমার –
শুদ্ধাচারী ঋষিশ্রেষ্ঠ, সরে যান দূরে।

এখুনি প্রভাতবায়ু প্রবাহিত হবে,
আমার দেহের গন্ধ ছড়াবে চৌদিকে।
সে বাস আঘ্রাণে
জন্মাবে বিতৃষ্ণা মনে প্রাণে।

পরাশর ঃ

আমি যদি সে গন্ধ ঘুচাই চিরতরে,
তা হলে কি হবে পূর্ণ প্রার্থনা আমার?

মৎসগন্ধা ঃ

প্রার্থনা নয় ঋষি, অবশ্য পালিত হবে আদেশ প্রভুর।

পরাশর ঃ [স্বগত]

কথা দিলে না জেনেই কামার্ত ঋষিকে, সুমধ্যমা।

[উচ্চারণে] নিয়ে চলো যমুনার মাঝখানে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ওই দ্বীপে,
যেখানে চরের পলি ঢেকে আছে লতাগুল্ম তৃণ বিটপীতে

সূত্রধার ঃ

বিস্মিত বিমূঢ় কন্যা, মৎস্যগন্ধা তার
বহিত্র চালনা করে নিয়ে গেল ঋষিবরে
যমুনার সুনির্জন দ্বীপের আড়ালে,
যেখানে জলের দুই বাহু,
দ্বীপকে বেষ্টন করে উচ্ছলিত সারা দিন রাত।

পরাশর ঃ [স্বগত]

বনভূমি বন্ধু মানুষের সেই সৃষ্টিকাল থেকে
দেবতার ফলপত্র পুষ্পাঞ্জলি সে-ই ভরে দেয়।
পূজার অর্ঘ্যের সাজ, প্রেমের বন্ধনমাল্য যত
গড়ে ওঠে বিবিধ কুসুমে।
লতা গুল্ম, পত্রপুষ্প মূল ও বাকলে
সঞ্চিত রয়েছে শক্তি সর্বরোগহর।
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে অগ্নি উৎপাদন।
সুরভিত দশদিক চন্দন-ঘর্ষণে।
দেহান্তেও বিটপীর ভূমিকা অশেষ।

[সোচ্চারে] ওই সেই লতা গন্ধহারী!
জানি, এর নিষ্পেষিত নির্যাস সেবনে
অসহ্য গাত্রের গন্ধ বিদূরিত হয় চিরতরে।
শুধু তাই নয়,
যোজন দূরত্ব হতে দেহ-বাস অন্যকে মাতায়।

[অন্যমনা মৎস্যগন্ধার কাছে গিয়ে লতাখণ্ড দেখিয়ে]

সুস্বাদু, সুগন্ধি এই লতা তৃপ্তিভরে করো চর্বণ,

সিদ্ধ হবে তোমার বাসনা।
তার আগে পূর্ণস্নান সেরে এসো যমুনার শীতল সলিলে।

সূত্রধার ঃ

দ্রুত চলে গেল কন্যা অরণ্য আড়ালে।
তরঙ্গে ভাসাল দেহ।
বরুণ বরণ করে নিল তার পেলব শরীর।
স্নান শেষে সিক্ত বস্ত্রে আনত নয়নে
দাঁড়াল ষোড়শী কন্যা ঋষির অদূরে।

পরাশর ঃ [স্বগত]

বরুণের জলগৃহে –
কোন শিল্পী গড়ে দিল প্রস্তরের বিস্ময়-প্রতিমা!
অবিকল রতি মূর্তিমতী।

[সোচ্চারে] ধরো এই লতাখণ্ড। অত্যাশ্চর্য বনৌষধি, অপার মহিমা।

সূত্রধার ঃ

ঋষিদত্ত লতাখণ্ড চর্বণে নিমগ্ন সুতনুকা,
চারিদিকে প্রবাহিত মধুর সুবাস।
গন্ধবতী নেয় বারংবার
করতল বক্ষের আঘ্রাণ।
মনে হল তার –
প্রতি রোমকূপ থেকে গন্ধ উৎসারিত।
কস্তুরী মৃগের মতো, আপনার অঙ্গবাসে আপনি বিভোর।
দেবনর্তকীর মতো চঞ্চল চরণে
মনোহর পরিক্রমা তার।
ভাসিয়ে দু'বাহু শূন্যে
সে কী নৃত্য চরমৃত্তিকায় ঘুরে ঘুরে!
সহসা দাঁড়াল স্থির হয়ে
ঋষির সম্মুখে কলাবতী।

পরাশর ঃ [স্মিত হাস্যে]

তৃপ্ত কি হয়েছ তুমি?
অন্তরের অবরুদ্ধ মেঘ দূর হল এতদিনে?
(আবেগ-কম্পিত অঙ্গ লীলাবতী আনন্দে বিহ্বল।
লুণ্ঠিত যৌবনভার ঋষির চরণে।)

[দুই হস্তে গন্ধবতীকে বক্ষে টেনে নিয়ে]

যৌবন অমূল্য-রত্ন, পদতলে নয় তার স্থান।
মধ্যমণি, বক্ষ রত্নহারে।
ইন্দ্রনীল মণি তুমি আমার এ রুদ্রাক্ষমালায়।

দেহ চায় দেহের মিলন।
পূর্ণ করো প্রার্থনা আমার।

পদ্মগন্ধা ঃ

অনাঘ্রাতা কুমারী এখনও –
সমাজের শাসন-শৃঙ্খলে রয়েছি বন্দিনী,
লোকলজ্জা ভয় –
এখনও রয়েছে ঘিরে আমার এ দেহ-মন-প্রাণ।
কামনার যজ্ঞে যদি এ দেহ আহুতি দিই আজ
কোথায় দাঁড়াবে পরিণাম,
এ-কথা কি ভেবেছেন ঋষি?

পরাশর ঃ

বাঁধ ভাঙা শ্রাবণ-বন্যায়
ভেসে যায় চরাচর ঋদ্ধ জনপদ।
বন্যা অন্তে আবার সুস্থিত, বিপর্যস্ত অস্থির সংসার।
সেই বন্যা এসেছে এখন, উদ্বেলিত এই দেহতট।
ভেসে যাক লোকলজ্জা, ভবিষ্য-ভাবনা।
যৌবন-তরঙ্গে চলো ভাসি।
কূল পাব ঠিক।

সূত্রধার ঃ

ঊর্ধ্বমুখী কামনার শিখা, চাই হব্যের আহুতি।
নরনারী, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের
ক্ষুধার স্বরূপ এক।
নানা ছলে নানা আবরণে
মানুষ আড়াল করে ক্ষুধা।
এই সঙ্গোপন-লীলা জানে না ইতর প্রাণীকুল।
নব নব পরিবেশে—
সম্ভোগে মানুষ দেয় সুচারু সুষমা।
রাত্রির সুস্নাত শুকতারা
ঝাঁপ দিল অরুণের অনুরাগ আরক্ত বন্ধনে।

যোজনগন্ধা ঃ [লীলা সাঙ্গ হলে]

গন্তব্যে যাবেন চলে ঋষিবর
উচ্ছিষ্ট পত্রের মতো আমি পড়ে রবে
কী হবে আমার পরিণাম?

পরাশর ঃ

আমার অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত তোমার শরীরে
এ-বীর্য হবে না ব্যর্থ। কণামাত্র বীজ
জন্ম দেয় মহামহীরুহ।
সকল বীজের শক্তি হয় না সমান।

তুমি সেই মৃত্তিকা উর্বর,
যেখানে ফেলেছে বীজ মহাবিহঙ্গম
জন্ম নেবে বনস্পতি ধীরে ধীরে শাখাবাহু মেলে।
ঊর্ধ্বে তার গ্রহপুঞ্জ প্রদীপ্ত আকাশ
নিম্নে পৃথ্বী দিগন্ত প্রসারী।
সেই মহাবিটপী শাখায় –
শোনা যাবে সহস্রপক্ষীর কলরব।
নীড় বেঁধে জীবন কাটাবে তারা।
ঋতুপর্ব আবর্তিত হবে তাকে ঘিরে।
সে রবে নীরব দ্রষ্টা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের,
নিত্য লীলা পূর্ণ নাটমঞ্চ বসুধার।
সে করবে পাঠোদ্ধার মহাকাল বিরচিত মহান নাট্যের।
যতকাল রবে পৃথ্বী-উচ্চারিত হবে তার নাম
এ মহীমণ্ডলে।

গন্ধবতী ঃ

কী নামে চিহ্নিত হবে কুমার আমার, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি?

পরাশর ঃ

দ্বৈপায়ন, বেদব্যাস, সত্যবতী-সুত।

ধীবরনন্দিনী ঃ

কী পুণ্য আমার, ঋষিপুত্র বক্ষে নিয়ে কাটাব জীবন।

পরাশর ঃ

সে সৌভাগ্য হবে না কল্যাণী।

দাসরাজকন্যা ঃ [হতাশায়]

কী লাভ জননীপদে তবে,
সন্তান থেকেও যার শূন্য এই বুক।
কী নিয়ে থাকব প্রভু,
কী করে কাটবে তবে ভাগ্যহত নারীর জীবন?

পরাশর :

অসামান্য রূপবতী তুমি,
মহারাজ শান্তনুর দৃষ্টিপথে পড়বে কোনওদিন
তোমার দর্শনে মুগ্ধ হবে মহীপতি।
সত্যে স্থিত পুত্র তাঁর ত্যাগ করবে রাজ্য-অধিকার।
তুমি হবে সেই রাজেন্দ্রাণী।
সত্যের প্রচ্ছায়ে নাম হবে সত্যবতী –
এ ভবিষ্য-লিপি লেখা অদৃষ্টে তোমার।

সত্যবতী ঃ [ক্রন্দনরত]

ভিখারিনি হতে রাজি আছি, পুত্রে যদি পাই বুকে।
তারে নিয়ে জীবন কাটাব।

পরাশর ঃ

যেখানেই থাকো তুমি, তোমার আহ্বান
উপেক্ষার শক্তি তার হবে না কখনও।
জন্ম তার শ্রেষ্ঠ ঋষিকুলে — পরাশর জন্মদাতা পিতা,
স্বল্পায়ু তাপস শক্ত্রি পিতামহ তার।
বশিষ্ঠ প্রপিতামহ, ঋষিকুলোত্তম।
সুধন্য তাপসদের রক্ত তার দেহে সঞ্চারিত।
অন্যদিকে অব্রাহ্মণ অন্ত্যজ কন্যারা
করেছে এ ঋষিবংশে রক্ত-সংমিশ্রণ।
তোমার পুত্রের দেহে প্রবাহিত দুই রক্তধারা।
পরিপূর্ণ উপনদীগুলি
ধারা মিলিয়েছে মহানদীর সলিলে।
সমুদ্র-সঙ্গমে
স্তরে স্তরে সৃষ্টিশীল পলির সঞ্চয়।
সে উর্বর পলিমৃত্তিকায় জন্ম নেবে মহাদ্বীপ।
বুকে তার সৃষ্টি হবে নূতন ভারত।
তোমার গর্ভের পুত্র স্রষ্টা সেই মহাভারতের।
অনন্তকালের বুকে সে ভারত রবে দীপ্যমান,
স্থির ধ্রুব নক্ষত্রের মতো।
মহাবিশ্বে শুভ সত্য পথের দিশারী।
তাই বলি-সংবর্ধিত করো পুত্রে অতি সংগোপনে।
যথাকালে তপোবনে নিয়ে যাব দ্বৈপায়নে
এই দ্বীপে এসে।
বাল্য ও কৈশোর আর তারুণ্যের দিন,
কেটে যাবে অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ আর তপস্যায়।
জ্যোতির্ময় দিব্যদৃষ্টি উদ্ভাসিত হবে দু'নয়নে।
তখন প্রব্রজ্যা নিয়ে
শুরু হবে ভূমণ্ডলে তার পরিক্রমা।
জগতের জীবনের মহাজ্ঞান সঞ্চয়ের শেষে,
তোমার আহ্বানে ধূলি ধূসরিত পদে
সে আসবে জননীর পাদ-বন্দনায়।
ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একদিন তুমি ভেসে যাবে বিশ্বস্রোতে।
অসহায় দু'হাত বাড়িয়ে উদ্ধারের আকুল আশায়
করবে স্মরণ এই তাপস সন্তানে।
সেদিন দেখবে তাকে ভিন্নভূমিকায়,
বিচিত্র মহান এক বংশ প্রতিষ্ঠায়,
ঋষি হবে সর্বোত্তম গৃহী।

সত্যবতীর শাখা প্রশাখা

এইমাত্র পাণ্ডবেরা চলে যাচ্ছেন মহর্ষি ব্যাসের আশ্রম ত্যাগ করে। সম্মুখে যুধিষ্ঠির আর সর্বশেষে ছায়াসঙ্গিনী দ্রৌপদী। এঁদের অনুসরণ করে চলেছে এক পথ-কুক্কুর। সেই হস্তিনাপুর থেকে পিছু নিয়েছে।

দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত আশ্রম সীমান্তে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেখতে লাগলেন তাঁদের নীরব-যাত্রার দৃশ্য। এক মহান সার্থক অন্তিমযাত্রা।

শেষ রাত্রে বদরিকাশ্রমে যজ্ঞবেদিকায় আহুতি দিয়েছিলেন ব্যাসদেব। মহাকালের উদ্দেশে জানিয়েছিলেন অন্তরের প্রণতি। ঘন নীলকান্ত আকাশে হীরকদ্যুতি নিয়ে জ্বলজ্বল করছিল শুকতারা। আশ্রম সমীপে অলকানন্দার কলধ্বনি। ছায়া ঢাকা পর্বতের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল ঊর্ধ্বশীর্ষ শুভ্র তুষারমৌলি। ললাটে সংলগ্ন শুক্লা চতুর্থীর শশীলেখা।

যজ্ঞবেদিকার চতুর্দিক বেষ্টন করে আত্মমগ্ন পঞ্চপাণ্ডব। ব্যাসপুত্র শুকদেব যজ্ঞকুণ্ডে মাঝে মাঝে সমিধ দান করে উদ্দীপ্ত করছিলেন অগ্নি। অদূরে ঋষিজায়া ঘৃতাচীর স্নেহসান্নিধ্যে উপবিষ্ট যাজ্ঞসেনী।

আহুতি সম্পন্ন করে মহর্ষি দ্বৈপায়ন বলেছিলেন, মহাকাল চিরচলিষ্ণু। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলাকার তিনি। কীটানুকীট থেকে গ্রহপুঞ্জ তাঁরই স্পর্শে স্পন্দিত, আবর্তিত। আজ সেই মহাকালের আহ্বান এসেছে তোমাদের কাছে। শুভ হোক তোমাদের যাত্রা, পূর্ণ হোক মনস্কাম।

পিতামহ ব্যাসের নির্দেশে প্রথম সূর্যের আলোকে স্নান করতে করতে দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডব যাত্রা করলেন মহাপ্রস্থানের পথে।

পাণ্ডবদের চির বিদায়ের পথে যাত্রা করিয়ে দিয়ে অলকানন্দার কূলে এক শিলাসনে এসে বসলেন মহর্ষি দ্বৈপায়ন। অলকানন্দার অনন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করলেন করাঙ্গুলিতে। অমনি শিহরিত হল তাঁর সমস্ত সত্তা। খুলে গেল মগ্নচৈতন্যের দ্বার। তিনি অপার বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন এক মহানাটক। অগণিত কুশীলব সমাকীর্ণ, ঘটনার বিপ্রতীপ ঘূর্ণিবাত্যায় আবর্তিত রঙ্গমঞ্চ। একসময় দ্রষ্টা আর স্রষ্টা হয়ে গেলেন অভিন্ন।

* * *

যাত্রাপথে প্রথম পাণ্ডবের চিত্ত পূর্ণ হয়ে আছে একটি ভাবনায়। অপার রহস্যলোক থেকে মহাকালের স্রোতে বুদবুদের মতো জেগে ওঠে যে জীবন, সে তার সুখদুঃখের লীলা অবসানে আবার ফিরে যায় সেই রহস্যালোকে। জন্মের পূর্বে অন্ধকার, মৃত্যুর পরেও অন্ধকার। দুই প্রান্তকে যুক্ত করেছে একটি অবিনাশী স্বর্ণসূত্র, যার নাম ধর্ম, যার নাম সত্য।

স্রোত কিন্তু সারাক্ষণ ঋজুরেখায় বয়ে চলে না। কখনও বঙ্কিম, কখনও আবর্ত-সংকুল তার গতিছন্দ। ধর্মও তাই। বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয় তার আকার। কিন্তু কখনও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় না সত্যধর্মের সূত্রটি।

পরক্ষণেই চোখের সামনে অভিনীত হল একটি দৃশ্য।

কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আজই বুঝি সমাপ্ত হয়ে যায় কুরুক্ষেত্র মহারণ। ভয়ংকর হয়ে উঠেছেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। মহাপ্রলয় ঘটে চলেছে পাণ্ডব সৈন্যদের ভেতর।

তাই তো দেখছি সখা। গুরু আজ মারণযজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন পাণ্ডব সৈন্যদের। এর হাত থেকে উদ্ধারের কোনও উপায় কি নেই?

আছে সখা। নিরন্ধ্র অন্ধকারে একটিমাত্র আলোক-দিশা। ব্যাখ্যা করে আমাকে আশ্বস্ত করো যদুপতি।

সেই আলোকের দিশারী আপনি স্বয়ং ধর্মরাজ।

সে কী! কীভাবে?

স্মরণে কী নেই আপনার, একসময় কথাপ্রসঙ্গে গুরু দ্রোণ বলেছিলেন, একমাত্র কোনও সত্যব্রত ব্যক্তি যদি কোনওদিন আমার কাছে আমার কোনও প্রিয়জনের দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে তা হলে সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে আর অস্ত্রধারণ করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া সারাক্ষণই অস্ত্র থাকবে আমার সঙ্গী হয়ে।

মনে আছে সখা।

যদুকুলপতি বললেন, এই মুহূর্তে নরমেধ যজ্ঞ থেকে যদি দ্রোণাচার্যকে বিরত করতে চান তা হলে আপনাকেই তাঁর কাছে একটি দুঃসংবাদ পৌঁছে দিতে হবে।

কী সে দুঃসংবাদ সখা?

ঠিক সেই মুহূর্তে ভীম এসে স্বপক্ষীয় এক রাজার অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তির গদাঘাতে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বললেন, এই অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদটিই আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে গুরু দ্রোণাচার্যের শ্রবণে।

হস্তির নিধন-সংবাদ পৌঁছে দিলে গুরু দ্রোণই বা নিরস্ত্র হবেন কেন?

সত্যই কি আপনি এখনও বিষয়টিকে অনুধাবন করতে পারেননি?

আরও একটু স্পষ্ট করো যদুপতি।

হস্তির নয়, গুরু দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামারই মৃত্যু ঘোষণা করবেন আপনি।

আমি চিরদিনই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কী করেই বা এই মিথ্যা সংবাদ আমি গুরুর শ্রবণে পৌঁছে দেব।

উত্তেজিত কৃষ্ণ বললেন, আপনার আচার্য ব্রাহ্ম-অস্ত্র প্রয়োগ করে বিশ সহস্র পাঞ্চাল সৈন্য, পঞ্চশত মৎস্য সৈন্য এবং ছয় সহস্র সৃঞ্জয় সৈন্য বধ করেছেন। অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত মহাধনুর্ধর দ্রোণ এভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই পাণ্ডবপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতএব প্রিয় পাণ্ডবগণ, ধর্ম পরিত্যাগ করে জয়ের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করুন। বরং আপনি একটু প্রচ্ছন্নতার কুয়াশায় আবৃত করুন নিজেকে।

কী রকম?

আপনি উচ্চৈস্বরে বলুন, অশ্বত্থামা রণে হতঃ।

এরপর অনুচ্চে বলুন, ইতি কুঞ্জরঃ।

সেদিন আমার কথায় গুরু অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন। পুত্রশোকে যোগমুক্ত হয়ে বরণ করেছিলেন মৃত্যু। আর পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের রথে আরোহণ করে অসির দ্বারা তাঁর শিরচ্ছেদ করেছিল।

পথ চলতে চলতে এই ভাবনার কাতর হলেন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির। তিনি কিছুতেই গুরুর মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়মুক্ত করতে পারলেন না।

সহসা তাঁর পিতামহ ব্যাসদেবের কথা মনে পড়ল, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, আর যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়।

কৃষ্ণের নির্দেশেই জয়লাভের জন্য সেদিন তিনি মিথ্যাচার করেছিলেন। যিনি স্বয়ং ধর্মের রক্ষক, তিনি কীভাবে শুধু জয়ের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ধর্মকে পরিত্যাগ করলেন।

এ দ্বন্দ্বের কোনও সমাধান যুধিষ্ঠির কোনও ভাবেই খুঁজে পেলেন না।

সহসা দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল।

যুধিষ্ঠির আর ধর্ম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

তৃষ্ণার জল অন্বেষণে গিয়ে চার ভ্রাতা বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এ পুষ্করিণী পূর্বেই আমার অধিকৃত। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলপান করতে গেলেই মৃত্যু অবধারিত।

প্রশ্ন করুন।

বকরূপী যক্ষ সেদিন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে, কিন্তু কোনও ভাবেই তাঁকে বিব্রত করতে পারেননি। প্রশ্নগুলি ছিল সত্যিই বিচিত্র।

কয়েকটি প্রশ্ন এই মুহূর্তে ছবির মতো ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরগুলোও ধ্বনিত হল তাঁর অন্তরে।

যক্ষ ঃ 'পৃথিবীর অপেক্ষাও গুরুতর কে, আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে, বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে, আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'পৃথিবীর অপেক্ষা মাতা গুরুতর, আকাশ অপেক্ষা পিতা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহুতর।'

আবার প্রশ্ন করলেন যক্ষ ঃ 'কে নিদ্রিত হলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্ম নিয়ে স্পন্দিত হয় না, হৃদয় কার এবং কে বেগে বর্ধিত হয়?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'মৎস্য নিদ্রিত হলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড জন্ম নিয়ে স্পন্দিত হয় না, হৃদয় নেই পাষাণের এবং বেগে বর্ধিত হয় নদী।'

যক্ষ ঃ 'প্রবাসীর মিত্র কে, গৃহবাসীর মিত্র কে, আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষ ব্যক্তির মিত্রই বা কে?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'প্রবাসীর মিত্র হল সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্যা, আতুরের চিকিৎসক এবং মুমূর্ষ ব্যক্তির দানই মিত্র।'

যক্ষ ঃ 'কাকে সংযত করলে শোক থাকে না এবং কার সঙ্গে সন্ধি করলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'মনকে সংযত করলে শোক থাকে না এবং সাধুর সঙ্গে সন্ধি হলে তা ভঙ্গ হয় না।'

যক্ষ ঃ 'কী ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, কী ত্যাগ করলে শোক হয় না, কী ত্যাগ করলে অর্থবান হয়, এবং কী ত্যাগ করলে সুখী হয়?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করলে অর্থবান হয় এবং লোভ ত্যাগ করলেই সুখী হয়।'

যক্ষ ঃ 'পুরুষের কোন শত্রু দুর্জয়, কোন ব্যাধি অনন্ত, কোন লোক সাধু এবং কোন লোকই বা অসাধু?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'ক্রোধ দুর্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তি সাধু এবং নির্দয় ব্যক্তিই অসাধু।'

যক্ষ ঃ 'সুখী কে, আশ্চর্য কী?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হয়ে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন, তিনিই সুখী। প্রাণীগণ প্রতিদিন শমন সদনে গমন করছে দেখেও মানুষ জীবনের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়—এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে।

যক্ষ ঃ 'পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনীই বা কে?'

যুধিষ্ঠির ঃ 'মানবের নাম পুণ্যকর্মের দ্বারা স্বর্গস্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যতদিন থাকে, ততদিন সেই পুণ্যকর্মা ব্যক্তি পুরুষ বলে পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্যজ্ঞান করেন, তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।'

দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর-পর্ব চলার পর অত্যন্ত পরিতৃপ্ত যক্ষ বলেছিলেন, তুমি যথার্থই বুদ্ধিদীপ্ত মন সত্যসন্ধানী বিবেকের অধিকারী। আমি তোমার উত্তর শুনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি তোমার এই মৃত ভ্রাতাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের জীবন আমার কাছে প্রার্থনা করো। এখন বলো, কাকে তুমি সে সুযোগ দিতে চাও?

হে যক্ষ! ওই যে শ্যামকলেবর বিশাল বক্ষ মহাবাহু নকুল শায়িত রয়েছে, সে আপনার কৃপায় সঞ্জীবিত হোক।

যক্ষ সবিস্ময়ে বলেছিলেন, হে রাজন! তুমি দশসহস্র মাতঙ্গসম বলশালী তোমার অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় ধনুর্ধর ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করে কী জন্য বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়েছ!

ধর্মকে বিনষ্ট করলে ধর্মও আমাদের বিনষ্ট করবেন এবং তাঁকে রক্ষা করলে তিনিও আমাদের রক্ষা করবেন। অতএব আমি কখনও ধর্মকে পরিত্যাগ করব না এবং ধর্মও যেন আমাকে কখনও পরিত্যাগ না করেন।

কুন্তী এবং মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। তাঁদের পঞ্চপুত্র আমরা সকলেই ভাই ভাই। আমি প্রথমেই ভ্রাতা নকুলকে জলান্বেষণে পাঠিয়েছিলাম। তাই বিমাতা-পুত্র হলেও তাঁর প্রাণরক্ষা করাই আমার প্রথম কর্তব্য।

ধর্মরূপী যক্ষ বলেছিলেন, হে রাজন! আপনার আচরণে ও ধর্মবোধে আমি পরম পরিতুষ্ট। শুধুমাত্র নকুলই নয়, আমি সানন্দে আপনার সমস্ত ভ্রাতাকে সঞ্জীবিত করলাম।

* * *

যাত্রাপথে মহাতেজা মার্কণ্ডেয় মুনির কথা স্মরণে এল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। মুনিবর তাঁর কাছে কৌশিক নামে এক তপোপরায়ণ, ধর্মশীল ব্রাহ্মণের কাহিনী বলেছিলেন।

ব্রাহ্মণ অল্পতেই ক্রুদ্ধ হতেন এবং সে ক্রোধ সহজে সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁর ক্রোধের অগ্নিতে মনুষ্যেতর প্রাণী পর্যন্ত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। একদিন সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ এক

গৃহস্থ ভবনে উপস্থিত হলেন। গৃহস্থ-পত্নী তাঁকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বলে ভিক্ষা আনার জন্যে ভেতরে গেলেন। গৃহমধ্যে ভিক্ষাপাত্রটি পরিষ্কার করছেন এমন সময় গৃহে প্রবেশ করলেন তাঁর ক্ষুধাতুর স্বামী। সেই পতিব্রতা নারী পতিকে সমাগত দেখে তাঁরই পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন।

স্বামী ভোজনে তৃপ্ত হবার পর সেই গৃহবধূ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাদানের জন্য বাইরে এলেন।

অতি ক্রুদ্ধকণ্ঠে তখন ব্রাহ্মণ বললেন, এতক্ষণ তুমি আমাকে অপেক্ষা করালে কেন? তুমি কি ব্রাহ্মণদের গুরু বলে জ্ঞান করো না, কেবল স্বামীকেই গুরুর সম্মান দাও? তুমি ব্রাহ্মণের ক্রোধ সম্বন্ধে কি অবহিত নও?

পতিব্রতা বললেন হে তপোধন, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমি সমস্ত ব্রাহ্মণকেই শ্রদ্ধা ও সেবা করি। তবে পতিসেবাই আমার পরম ধর্ম। প্রাচীন ঋষিরা বলেন, শাশ্বত ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

হে ভগবন্! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন তবে মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞেস করুন। ওই ব্যাধ সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত। সেই ব্যাধই আপনার নিকট ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

ব্রাহ্মণ কৌশিক নানা স্থানে জিজ্ঞাসাবাদের পর মিথিলায় ধর্মব্যাধের সন্ধান পেলেন।

ব্যাধ তখন পশুদের বধ্যভূমিতে বসে মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রি করছিলেন।

ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখে এবং তাঁর অভিপ্রায় জেনে ধর্মব্যাধ তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ কৌশিক ব্যাধের গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও শোভাসৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, মহাত্মা, আমি আপনার বৃত্তির সঙ্গে উচ্চ জীবনচর্যাকে মেলাতে পারছি না। একদিকে পশুবধ করছেন অন্যদিকে ধর্মাচরণ, এই দুই বিরুদ্ধ কর্ম একই সঙ্গে কী করে সম্ভব হচ্ছে।

ব্যাধ বললেন, আমি স্বীয় ধর্মানুসারে পূর্বপুরুষ পরম্পরাগত কর্মানুষ্ঠানই করে থাকি। প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র কর্মধারা রয়েছে। কোনও কর্মকেই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।

গুরুজনদের সেবা করাই আমার ধর্ম। আমি সত্যবাক্য বলি। কারও প্রতি কখনও ঈর্ষা পোষণ করি না। যথাসাধ্য আর্তজনকে দান করে থাকি।

সমাজ সংস্থাপকের বিধান অনুসারে শুদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত। কোনও এক সম্প্রদায়ের কর্ম অন্য সম্প্রদায়ের কর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।

ধর্মব্যাধ আরও বললেন, এই জনক রাজ্যে একজনও কুকর্মী নেই। চারিবর্ণের মানুষই স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত।

নিত্যদিনের আচরণীয় ধর্মকর্ম এবং সামাজিক বিধান সম্বন্ধে বলার পর ধর্মের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন ধর্মব্যাধ।

যাঁর আমাকে নিন্দা করেন এবং যাঁরা প্রশংসা করেন, আমি অসূয়ামুক্ত চিত্তে বিনয়সম্পন্ন কর্মের দ্বারা তাঁদের সকলকেই পরিতুষ্ট করি।

প্রিয় ঘটনায় যেমন আমি অতিরিক্ত হৃষ্ট হই না অপ্রিয় ঘটনাতে তেমনই আমি একান্ত ম্রিয়মানও হই না। যা কিছু কল্যাণকর মনে হয় তাতেই অনুরক্ত থাকি আমি।

লোভই সকল পাপের আশ্রয়। লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে আসক্ত হয়। আদিত্য উদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় তেমনই কল্যাণকর কর্মে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

অধার্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট ধর্মরূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকে। বাইরে তাদের আচরণে পবিত্রভাব, ধর্মানুগ আলাপ ইত্যাদি দেখা গেলেও ধর্ম বা সদাচারের লেশমাত্র তাদের মধ্যে নেই।

ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। প্রাণসংকট উপস্থিত হলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। আপাতদৃষ্টিতে যা সত্যধর্মের বিপরীত তাই আবার ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

পিতামাতা গুরুজনের ঐকান্তিক সেবাই পরমধর্ম। নিজের পুত্রকলত্র সহ তাঁদের সেবা করতে হয়। পিতা মাতা অগ্নি আত্মা ও উপদেষ্টা, এই পাঁচজনই আমাদের গুরু। এঁদের সেবা করলেই মোক্ষলাভ হয়।

আপনি আপনার বৃদ্ধ জনক-জননীকে ত্যাগ করে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন, অচিরে গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁদের সেবা করুন। সকল ধর্ম সেখানেই বিরাজ করছে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন আর মহাত্মাদের উপদেশাবলী জাগরিত হচ্ছে তাঁর অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মদর্শন, যক্ষরূপী ধর্মের বিচিত্র প্রশ্নাবলী, ধর্মব্যাধের সংসারকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ, শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কাহিনীর পর কাহিনী উল্লেখে ধর্মোপদেশন।

এই মুহূর্তে চারিভ্রাতা ও সঙ্গিনী সঙ্গে থাকলেও ধর্মরাজ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, মোহবিমুক্ত। তিনি চলেছেন ধর্ম ও সত্যের স্বরূপ উপলব্ধির ভেতর দিয়ে।

অরণ্যভূমি ধীরে ধীরে নিম্নে অদৃশ্য হতে লাগল। তরুলতাহীন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন তাঁরা। বিলুপ্ত হল জনপদ চিহ্ন। সম্মুখে তুষারধবল শৃঙ্গরাজি। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র নভোনীলিমা বিভাসিত দেবলোক। সেইদিকে লক্ষ স্থির রেখে স্বর্গারোহণ, আত্মার অভিযাত্রা।

অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন দ্বিতীয় পাণ্ডব। পরম শক্তিমান, দুর্জয় সাহসী ভীম অন্তরে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করছেন। অনুতাপের অশ্রুজলে ধৌত হচ্ছে তাঁর অন্তরের গ্লানি। অনুতাপ অন্তরের এমন এক শুদ্ধ আবেগ যা বিক্রমকেও অতিক্রম করে যায়। জরাসন্ধ, কীচক, দুঃশাসন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অধিকাংশ পুত্রকে বধ করে যে উল্লাস তিনি প্রকাশ করেছিলেন আজ তা অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধে বিজয়ী হবার পরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীমসেন ব্যতীত অন্যান্য ভ্রাতারা সন্তানহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারীর সর্বপ্রকার দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করতেন।

ভীম কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব বৈরিতাকে বিস্মৃত হননি। তিনি পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রকে একাকী পেলে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যাবার সময় পদাঘাতে ধরণীকে কম্পিত করতেন ভীমসেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করতেন, কে যায়?

অমনি ভীম উত্তর দিতেন, আপনার চিরশত্রু ভীমসেন।

উত্তর শুনে নীরব হয়ে যেতেন অন্ধ রাজা। কিন্তু নীরব হতেন না মহাবলী ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমসেন। পিতৃব্যের অতীত ব্যবহারগুলি তাঁকে বৃশ্চিক দংশনের মতো যন্ত্রণা দিত।

তিনি সক্ষোভে দম্ভ প্রকাশ করে বলতেন, আপনি যেমন লৌহ ভীমকে নিজ বাহুবলে চূর্ণ করেছিলেন তেমনই আমি আমার গদাঘাতে আপনার পুত্রদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছি। দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রুধির পান করেছি।

ভীমের পরুষবাক্য শুনে হতচেতনের মতো বসে থাকতেন নিগৃহীত ধৃতরাষ্ট্র। অশ্রুমোচন করতেন গান্ধারী।

এতেও জ্বালা মিটত না দ্বিতীয় পাণ্ডবের। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সেবারত ভৃত্যদের তিনি গোপনে অশ্রদ্ধা করতে শিখিয়ে দিতেন।

আজ মৃত্যুর পথে যাত্রা করে ভীমসেন আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে লাগলেন।

যাত্রাপথে এমনই এক দুর্বিষহ গ্লানিতে ভুগছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব। তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল একটি মুখ। কৃষ্ণকায়, অরণ্যচারী এক অনার্য সন্তান।

সেদিন গুরু দ্রোণের সঙ্গে রাজপুত্ররা গিয়েছিলেন মৃগয়ায়। একটি কুকুর বারবার রব তুলে অরণ্যের স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করছিল। কুকুরটি এসেছিল মৃগয়াভিলাষী রাজকুমারদের সঙ্গে।

অরণ্যের অভ্যন্তরে নিবিষ্টচিত্তে শরসন্ধান করছিল ব্যাধপুত্র একলব্য। তার সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় সে এমন বিস্ময়কর নিপুণতায় বাণ নিক্ষেপ করল, যাতে স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল ওই সারমেয়র কিন্তু প্রাণহানি হল না। সেই রুদ্ধস্বর সারমেয় চলে গেল মৃগয়ারত রাজপুত্রদের কাছে।

স্তম্ভিত অর্জুন! কে এই নিপুণ লক্ষবিদ! তাঁকে আবিষ্কারের জন্য অর্জুন অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। একসময় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হল এক ব্যাধসন্তান। ক্রমাগত শরক্ষেপ করে চলেছে সেই নিপুণ ধনুর্ধর।

অর্জুন সবিস্ময়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি বাণনিক্ষেপ করে এই সারমেয়টির স্বররুদ্ধ করেছ?

যুবক মস্তক সঞ্চালন করে জানাল, রাজপুত্রের অনুমান সঠিক।

পরম বিস্ময়ে অর্জুন এবার প্রশ্ন করলেন, কোন ধনুর্ধর তোমার অস্ত্রগুরু?

ভুবনখ্যাত মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য। ওই দেখুন গুরুর মৃন্ময় মূর্তি। তাঁকে সম্মুখে রেখেই আমি অস্ত্র চালনা করি।

উদ্‌ভ্রান্ত অর্জুন দ্রুত ধাবিত হলেন গুরু দ্রোণাচার্যের সমীপে।

গুরুদেব, আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন আপনার শিষ্যদের মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় কেউ আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না, একথা কি সত্য?

এ প্রশ্ন কেন পার্থ?

আপনার অসাধারণ কৃতী অপর এক শিষ্য রয়েছে যাঁকে আপনি নিভৃতে শিক্ষা দান করে আমার থেকেও বড় ধনুর্ধর করে গড়ে তুলেছেন!

সেকী! অসম্ভব!

সেদিন একলব্যের কাছে গুরুকে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্থ।

সব দেখে গুরু বিস্মিত, আশাহত অর্জুন!

ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্য মুহূর্তে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

তিনি একলব্যকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন, এই যুবকই একদিন তাঁর কাছে অস্ত্র-

শিক্ষালাভের আবেদন নিয়ে গিয়েছিল আর তিনি তাকে অনার্য সন্তান বলে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন সেই যুবকই তাঁর মৃণ্ময় মূর্তি রচনা করে তারই সম্মুখে অস্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে।

তিনি একলব্যকে বললেন, আমাকে যদি গুরু বলে স্বীকার করে থাকো, তা হলে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আনন্দে আত্মহারা একলব্য সঙ্গে সঙ্গে বলল, বলুন গুরুদেব, কীরূপ দক্ষিণা আপনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন? আমি আজ আপনাকে সেই দক্ষিণা দিয়ে ধন্য হই।

নির্মম দ্রোণাচার্য অকম্পিত স্বরে বললেন, তোমার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আমায় দান করো।

আর কোনওদিন তার পক্ষে অব্যর্থ শরসন্ধান করা সহজ হবে না জেনেও সানন্দে একলব্য গুরুর চরণে তার অঙ্গুষ্ঠ দান করল।

উল্লসিত অর্জুনের সঙ্গে সেদিন ফিরে গেলেন গুরু দ্রোণাচার্য। গুরুর এই ধূর্ত আচরণে গভীর স্বস্তিলাভ করেছিলেন অর্জুন।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি দৃশ্য ফুটে উঠল অর্জুনের দৃষ্টির সম্মুখে।

তুমুল সংগ্রামের মধ্যে সহসা মেদিনী গ্রাস করল অভিশক্ত কর্ণের রথচক্র।

উদ্যত-সায়ক অর্জুন কিন্তু ইতস্তত করছিলেন শরনিক্ষেপে। অস্ত্রহীনকে আঘাত করা যুদ্ধের রীতিবিরুদ্ধ। তা ছাড়া রথচক্র উত্তোলনের জন্য সচেষ্ট কর্ণ পার্থকে রথচক্র সচল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে বিরত থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন।

সারথি কৃষ্ণের প্ররোচনায় সেদিন যুদ্ধের সব রীতি ভঙ্গ করে অর্জুন কর্ণকে বধ করেছিলেন নির্মমভাবে।

আজ অগ্রজের সেই অসহায়, সকরুণ মুখখানি স্মরণে আসতেই দু'চোখ প্লাবিত করে অশ্রুধারা নেমে এল মহা ধনুর্ধর সব্যসাচীর।

এদিকে শেষের মুহূর্ত যত ঘনিয়ে আসতে লাগল নির্বেদ উপস্থিত হল নকুলের মনে।

সকলের মুখে অসাধারণ সুপুরুষরূপে কীর্তিত হতেন তিনি। শ্যামবর্ণ, লোহিতাক্ষ, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ যুবাপুরুষ। শালবৃক্ষের মতো সমুন্নত তাঁর দেহ, দৃঢ় ও প্রশস্ত বক্ষস্থল। এমন দর্শনীয় সুকুমার পুরুষ চরাচরে প্রায় দুর্লভ ছিল। এজন্যে নকুলের অন্তরে ছিল অহংকার।

বনযাত্রার সময় দেহকে ধুলিধূসরিত করেছিলেন তিনি। তাঁর রমণীমোহন মূর্তি যেন কোনও নারীর চোখে না পড়ে। সেই দুঃখের দিনে তিনি তাঁর বিষণ্ণ মুখচ্ছবি কাউকে দেখাতে চাননি।

আজ নকুলের মনে হতে লাগল, মহাকাল বা মৃত্যুর কাছে ধন-জন-যৌবনের গর্ব অকিঞ্চিৎকর। পৃথিবীতে যত অপরূপ, একদিন সবই মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন পঞ্চভ্রাতার সর্বকনিষ্ঠ সহদেব। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, ভ্রাতা সহদেবের পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। ধর্মবিষয়ে তাঁর উপদেশ বিশেষ প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। কিন্তু তিনি কোনও ব্যক্তিকেই আপনার সদৃশ জ্ঞানী বলে মনে করতেন না।

আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহদেবের অন্তরে একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠল। প্রজ্ঞার আলোকে কি তিনি মৃত্যুর রহস্যকে ভেদ করতে পারবেন?

তাঁর মনে হল, মৃত্যুর কাছে কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও জ্ঞানের প্রকাশ নয়, এখানে কেবলই আত্মসমর্পণ।

সর্বশেষে চলেছেন নতমুখী দ্রৌপদী, পঞ্চস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

মানুষের চিরন্তন সঙ্গী চিন্তা। আমৃত্যু সে আমাদের সঙ্গ দান করে। স্বর্গারোহণের পথেও দ্রৌপদী সেই চিন্তার মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারলেন না।

সম্মুখে পঞ্চস্বামী স্মৃতি থেকে মুছে গেছেন।

পথচারিণী পাঞ্চালী এখন দাঁড়িয়ে আছেন পাঞ্চাল রাজপুরীর সুসজ্জিত স্বয়ংবর সভায়। মাঙ্গলিক-থালিকা হস্তে তাঁর দুই পার্শ্বে সহচরীবৃন্দ। মধ্যে চম্পকমালিকা হস্তে, যেন এক সৌন্দর্যপ্রতিমা। অঙ্গকান্তি বৈদুর্যমণির প্রভার ন্যায় নীলাভ স্নিগ্ধ। নীলোৎপলের সৌরভের ন্যায় চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে দেহের সৌরভ। আকর্ণ বিস্তৃত নেত্রযুগল অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকার মঞ্চে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট ভারতের বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের দিকে।

শূন্যে সংস্থাপিত ঘূর্ণায়মান একটি চক্র। চক্রের ছিদ্রপথে দেখা যায় ক্ষুদ্র একটি লক্ষ্যবস্তু। মণিকুট্টিমে স্থাপিত জলপূর্ণ একটি পাত্রে বিঘূর্ণিত চক্র ও ছিদ্রমধ্যস্থ লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে। পাত্রের পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরের বেদিতে রাখা আছে কয়েকটি তীক্ষ্ণাগ্র শায়ক সহ একটি সুদৃশ্য শরাসন। জলে প্রতিবিম্ব দেখে উর্ধ্বস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে হবে।

ধনুতে শর সংযোগ করে যিনি ঘূর্ণিত চক্রের ছিদ্রমধ্যস্থ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারবেন তিনিই লাভ করবেন পাঞ্চাল রাজকন্যা পাঞ্চালীকে।

একে একে প্রতিযোগীরা এগিয়ে এলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ করা তো দূরের কথা, তাঁরা শরাসনটিকে বেদি থেকে উত্তোলন করতে পারলেন না। লজ্জায় অধোমুখ ফিরে গেলেন নিজ নিজ আসনে।

এবার এলেন হস্তিনাপুরের সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের ধনুর্ধর পুত্র দুর্যোধন। তাঁরই পার্শ্বে উপবিষ্ট পরমবন্ধু অঙ্গরাজ কর্ণ তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

দুর্যোধন বীরের ভঙ্গিতে আনত হয়ে ধনুটিকে আকর্ষণ করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! শরসংযোগ তো দূরের কথা, ধনুটি উত্তোলন করতেও অসমর্থ হলেন তিনি। আরক্ত হল দুর্যোধনের আনন।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাকিয়ে আশাহত দুর্যোধন ফিরে গেলেন নিজ সিংহাসনে।

বন্ধুর পরাভবের প্রত্যুত্তর দিতে যেন সিংহাসন ছেড়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে এলেন কর্ণ।

তিনি শরাসনটি উত্তোলন করামাত্রই দৃপ্তকণ্ঠে দ্রৌপদী বলে উঠলেন, সূতপুত্রের কণ্ঠে দ্রুপদ-কন্যা কখনও মাল্যদান করবে না।

প্রদীপ্ত সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে কর্ণ মৃদুহাস্যে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করলেন।

সভার একদিকে পঞ্চপাণ্ডব বসেছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। একে একে ক্ষত্রিয় রাজগণ নিরস্ত হলে ব্রাহ্মণগণের ভেতর থেকে গাত্রোত্থান করলেন ছদ্মবেশী অর্জুন।

মনে মনে মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে এবং সভায় উপস্থিত সখা কৃষ্ণকে স্মরণ করে অবলীলায় ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন তিনি।

পাত্রের জলে অকম্পিত ছায়া। সেই প্রতিবিম্বের দিকে নির্নিমিখ তাকিয়ে শরাসন থেকে

উর্ধ্বে লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশে শরনিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তে ছিদ্রপথে প্রবেশ করল তীক্ষ্ণাগ্র শর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধ হল লক্ষ্যবস্তু। পতিত হল সভা মধ্যস্থ মনিকুট্টিমে সকলের বিস্ময়-দৃষ্টির সম্মুখে।

জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন কৃষ্ণ, বলরাম, ব্রাহ্মণকুল ও শুভানুধ্যায়ীরা। শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি উত্থিত হল। সূত-মাগধাদির স্তুতিগীতিতে মুখরিত হল সভা। সানন্দে ব্রাহ্মণবেশী বীরের কণ্ঠে বরমাল্য দান করলেন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী।

সেই চারিচক্ষের মিলনলগ্নে যে হৃদপদ্মটি বিকশিত হয়েছিল, এতকাল পরে তারই সৌরভে আপ্লুত হলেন পথচারিণী পাঞ্চালী।

সেই মুহূর্তে আনন্দ বেদনার এক অব্যক্ত আবর্ত সৃষ্টি হল দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে। সেই আবর্তের মধ্যে অবলুপ্ত হল মহানাটকের নায়িকার চৈতন্য।

দ্রৌপদীর পতনের পর একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমসেন পথিমধ্যে অবসন্ন হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন।

স্থির পদক্ষেপে তুষারের ওপর পদচিহ্ন এঁকে দেবলোকের অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। পার্শ্বে তাঁর একমাত্র সঙ্গী সেই প্রভুভক্ত সারমেয়।

তুষারশৃঙ্গের ওপর এসে পড়ল তরুণ সূর্যের সুবর্ণ রশ্মি। ঠিক যেন শ্বেত-অশ্ববাহিত একটি হিরণ্ময় রথ নেমে এল সুরলোক থেকে।

স্তব্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন যুধিষ্ঠির, তার ললাট স্পর্শ করল স্বর্ণরশ্মিরেখা।

* * *

সেই অপার্থিব দৃশ্যটি প্রতিবিম্বিত হল অলকানন্দার তীরে উপবিষ্ট মহর্ষি দ্বৈপায়নের মানসনেত্রে। তিনি দেখলেন, প্রভাতের সেই সুবর্ণ রথ থেকে অবতরণ করলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি প্রসন্নমুখে ধর্মরাজের সমীপবর্তী হয়ে সুমিষ্ট ভাষণে বললেন, তুমি অবিলম্বে এই রথে আরোহণ করে আমার সঙ্গে স্বর্গলোকে যাত্রা করো।

প্রিয়তম সঙ্গিনী ও ভ্রাতাদের জন্য অন্তরে গভীর বেদনাবোধ করছিলেন ধর্মরাজ। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, আমার পত্নী ও ভ্রাতারা নিজ নিজ কর্মদোষে ভূমিতে নিপতিত হয়েছেন। তাঁদের এই অবস্থায় এখানে পরিত্যাগ করে আমার স্বর্গ-গমনের কোনও বাসনাই নেই।

দেবরাজ বললেন, এ বিষয়ে তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই যুধিষ্ঠির। তারা সশরীরে না হলেও তোমার পূর্বে স্বর্গগমন করেছে।

সস্নেহে পাশের কুকুরটির মস্তকে হাত রেখে হৃদয়বান যুধিষ্ঠির বললেন, এই কুকুরটি হস্তিনাপুর থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। প্রভুভক্ত এই সারমেয় বহুবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেনি। তাই একে পরিত্যাগ করে আমার একার পক্ষে স্বর্গারোহণ কী করে সম্ভব সুরপতি।

দেবরাজ বললেন, কুকুর অতিশয় অপবিত্র প্রাণী। তার পক্ষে তোমার মতো পরিশুদ্ধ ধার্মিকের সঙ্গে সশরীরে স্বর্গগমন একেবারে কল্পনার অতীত। তুমি ওই জীবটিকে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো। আজ তুমি অতুল বৈভব, অমরত্ব এবং আমার স্বরূপত্ব লাভ করবে, তাই অচিরে এই সারমেয়কে ত্যাগ করে রথারোহণ করো।

ক্ষুব্ধ বেদনার্ত যুধিষ্ঠির বললেন, এই পরমভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমি স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করতে চাই না। আমার মতে শরণাগতকে পরিত্যাগ করা মহাপাতক।

যুধিষ্ঠিরের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করে কুকুরটি যেন স্বয়ং ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করলেন।

তটিনীতটে বসে সে দৃশ্য অবলোকন করে অভিভূত হলেন মহর্ষি দ্বৈপায়ন। তিনি মানসনেত্রে দেখলেন সেই দিব্যরথ জ্যোতির্ময় পথরেখা ধরে স্বর্গলোকে যাত্রা করল।

এবার মহর্ষি ব্যাসদেবের শ্রবণে ধ্বনিত হল দেবর্ষি নারদের দিব্য কণ্ঠ।

তিনি বললেন, পূর্বে যে সকল রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করেছেন, নিজের যশ ও পুণ্যের দ্বারা যুধিষ্ঠির সকলের কীর্তি আচ্ছাদন করে সশরীরে উপস্থিত হলেন দেবলোকে।

দেবর্ষির কথা শেষ হলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবগণকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে বললেন, আপনাদের অনুগ্রহে আমি আজ স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা আমাকে কৃপা করে আমার ভ্রাতৃগণ যে স্থানে অবস্থান করছে, তা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যাই হোক না কেন, সেই স্থানে প্রেরণ করুন। আমি তাদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত।

দেবরাজ বললেন, স্বর্গে অবস্থান করে তুমি কেনই বা পার্থিব মানুষের মতো মায়া-মমতার বশীভূত হচ্ছ?

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি সত্যকে অলম্বন করে ধর্মাচরণ করেছি, তাই আজ সুরলোকে আমার স্থান হয়েছে, কিন্তু পার্থিব হৃদয়বৃত্তিগুলিকে আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। আর ত্রিলোকের কোনও কিছু দুর্লভ বস্তুর বিনিময়েও আমি হৃদয়ের সেই সঞ্চিত অমূল্য সম্পদগুলিকে ত্যাগ করতে পারব না। স্বর্গ আমাকে দেবে অনন্ত আনন্দ, কিন্তু বেদনার অনুভূতির শিশির-সিক্ত স্পর্শ তো আমি এই নন্দনলোকে পাব না !

সুরপতি বললেন, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক যুধিষ্ঠির। দেবদূতের সঙ্গে তুমি তোমার আত্মজনের কাছে গমন করো।

যিনি স্বর্গারোহণের পথে লক্ষ্যে ছিলেন স্থির, স্বজনের ভূমিশয্যা গ্রহণে একান্ত অচঞ্চল ও উদাসীন, তিনি আকাঙ্ক্ষিত দিব্যলোকে পৌঁছে অন্তরালবর্তী আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য হয়ে উঠলেন উৎকণ্ঠিত, উন্মুখ। জ্যোতির্ময় দেবলোকে এসে মনে পড়ল ধুলিধূসরিত স্নেহময়ী ধরিত্রীর কাতর মুখচ্ছবি।

সম্মুখে চলেছেন দিশারী দূত, পশ্চাতে দর্শনোৎসুক যুধিষ্ঠির।

সহসা দৃষ্টি থেকে মুছে গেল স্বর্গীয় জ্যোতি। নেমে এল সকরুণ সন্ধ্যার ছায়া। মাঝে মাঝে ম্লান দীপালোকে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টপ্রায় পথরেখা।

উৎকট গন্ধে পীড়িত তৃতীয় ইন্দ্রিয়। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন ধর্মরাজ। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, পত্নীসহ চারিভ্রাতা স্বর্গে অবস্থান করছেন। কিন্তু এই কি স্বর্গ! একেই কি বলে স্বর্গীয় সুষমা!

কলুষিত বিষবাষ্পে ক্লান্ত কাতর হয়ে পড়লেন যুধিষ্ঠির।

অমনি দেবদূত বললেন, চলুন ধর্মরাজ, আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাই। দেবরাজের নির্দেশ ছিল, আপনি অবসন্ন হলেই যেন আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সহসা চতুর্দিক থেকে উত্থিত হল আর্ত স্বর, তুমি চলে যেয়ো না, আমাদের ছেড়ে চলে যেয়ো না ধর্মরাজ। তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে।

বিস্মিত ধর্মরাজ প্রশ্ন করলেন, কে তোমরা?

বিভিন্ন দিক থেকে পরিচয়বাহী শব্দ ভেসে এল, আমি কর্ণ, আমি বৃকোদর, আমি পার্থ, আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, আমি পাঞ্চালী, আমরা জননী দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্র,—প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন।

স্তব্ধ হয়ে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন ধর্মরাজ। করুণায় বিগলিত হল তাঁর অন্তর। তিনি দেবদূতের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই আমার স্বর্গ, এঁরাই আমার স্বজন। এঁদের পরিত্যাগ করে আমি অন্য কোনও সুখস্বর্গে যাব না।

সঙ্গে সঙ্গে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল চতুর্দিক। বয়ে এল নন্দনের পারিজাত-সুবাস।

দেবরাজ এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরে সম্মুখে। বললেন, অশ্বত্থামার মৃত্যু ঘোষণা করে তুমি পুরুষোত্তম কৃষ্ণের পরামর্শে যে সামান্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলে, তারই প্রায়শ্চিত্তে ক্ষণকালের জন্য হলেও তোমার এই নরক-দর্শন হল। সত্যধর্মে সংস্থিত ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ তুমি। তোমার সুকৃতির ফলে আত্মীয়স্বজন-সহ পরমানন্দে উপভোগ করো এই দিব্যভূমি।

সঙ্গে সঙ্গে মধুস্রাবী হল সুরনদী মন্দাকিনী। বইতে লাগল নন্দন-বন-চন্দন সুরভিত গন্ধবহ। জ্যোতির তিলক এসে স্পর্শ করল ধর্মপুত্রের প্রশস্ত ললাট।

ওঁকার ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়ল এই সানন্দ-সংবাদ।

দিব্যদৃষ্টিতে নয়নসুভগ দৃশ্যটি দেখতে পেলেন সত্যবতী-সুত মহর্ষি দ্বৈপায়ন। এই মুহূর্তে তাঁর অন্তরবাসী দ্রষ্টা-কবি উদ্বুদ্ধ হলেন মহান ভারতকথা রচনায়। সমগ্র ভারতভূমি, তার সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম কর্ম কাম মোক্ষ নিয়ে সুসংহত হল মহর্ষির ভাবনায়। তিনি সদ্য সমাপ্ত কুরু-পাণ্ডবের মর্মন্তুদ কাহিনীর মধ্যে সমগ্র ভারতভূমির যুগযুগান্তের ধ্যানধারণা, তপস্যা সাধনা, ক্রিয়াকর্ম, ঈর্ষাদ্বেষ, সংগ্রাম সংঘাতের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পেলেন।

সেই মহানাটকের কুশীলবদের নিয়ে আবর্তিত হতে লাগল তাঁর নাট্যভাবনা। তিনি আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে লব্ধ উপাদানগুলি সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট কল্পনাকেও অতিক্রম করে যাবে।

সৃষ্টির এই এষণা মহর্ষি দ্বৈপায়নের অন্তরে এনে দিল এক অলৌকিক আনন্দের ভার। সেই আনন্দের কুম্ভ পূর্ণ করার জন্য চাই সৃষ্টির মন্থনজাত বেদনার অমৃত-বিন্দু। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই বেদনা-সম্ভব। শ্রাবণের অকৃপণ বর্ষণের মতো প্রেরণার বারিবিন্দু ঝরে পড়ে স্রষ্টার অন্তর্লোক। সেখানে মহাকাশ আর মৃত্তিকার মিলনে অঙ্কুরিত হয় সৃষ্টির বীজ। শাখাবাহু মেলে সে বীজ একদিন রূপ পরিগ্রহ করে মহাদ্রুমে।

আশ্চর্য এক ব্যথার প্রতিমা সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়ালেন মহাকবি দ্বৈপায়নের সামনে। মহর্ষি তাকিয়ে রইলেন সেই মূর্তিমতী প্রতিমার দিকে।

ক্ষণকালমাত্র। পরক্ষণেই মহর্ষি বললেন, কী সংবাদ কল্যাণী!

আপনার অন্বেষণেই এখানে এসেছি ঋষি।

বিশেষ কোনও প্রয়োজন?

ঘৃতাচী বললেন, আছে স্বামী।

মহর্ষি, শুকদেব-জননীর মুখের দিকে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে চেয়ে রইলেন।

আজ আপনি অন্যমনা কেন ঋষি?

আমর প্রিয়তম পৌত্রেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছে, তাদের কথাই আমার ভাবনাকে আশ্রয় করে আছে।

ঘৃতাচী বললেন, খুবই স্বাভাবিক।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এই শিলাসনে আশা করি আমাদের দু'জনের স্থান হয়ে যাবে।

ঘৃতাচী সন্নিহিত এক শিলায় মহর্ষির মুখোমুখি বসলেন। দৃষ্টিতে সজল মেঘের সিক্ত ছায়া।

মহর্ষি বললেন, তোমার দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠেছে, তুমিও কি কল্যাণীয়া পাঞ্চালী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের সুরলোক-যাত্রায় বেদনার্ত?

না মহর্ষি, সঠিক নয় আপনার অনুমান। মর্তভূমি ত্যাগ করে ওদের স্বর্গারোহণে আমি আনন্দিত।

তবে তোমার দৃষ্টি কেন সজল?

সুরলোকে যাত্রার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে আমার মন। কিন্তু আপনাকে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে ভেবে কাতর হচ্ছি।

দ্বৈপায়ন কিছু সময় স্থির হয়ে বসে রইলেন। পরে বললেন, কারুর অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করে রাখতে নেই সুকল্যাণী। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দীর্ঘকাল আমার আশ্রমে থেকে তুমি তাপসীর জীবন যাপন করেছ, কিন্তু সদানন্দময় স্বর্গের জন্য মাঝে মাঝে তোমাকে উন্মনা হতে দেখেছি। মেঘের ঘর্ষণে যখন দীপ্র হয়ে উঠত বিদ্যুৎ, তখন মেঘের অন্তরালে পরতে পরতে ফুটে উঠত স্বর্গের জ্যোতির্ময় সৌধগুলি। তুমি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ললাটে করস্পর্শ করে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে সে ছবি। আবার বজ্রধ্বনি হলে তুমি নির্ভয়ে শ্রবণ পেতে শুনতে সে ধ্বনি। হয়তো বা তখন তুমি স্মরণ করতে মহাবিক্রমী বজ্রধর সুরপতিকে।

আষাঢ়ের নবজলধারা যখন আশ্রম-সরসীতে ঝরে পড়ত নূপুর নিক্কণে তখন তুমি দেবনর্তকীর মোহন-মুদ্রায় লীলা-পদ-বিক্ষেপে ধাবিত হতে সেদিকে।

আমার মনে হত তুমি বন্দিনী এক বিহঙ্গী। তবু আমি তোমাকে নীল নভলোকে মুক্তি দিতে চাইনি। তুমি স্বয়ং বন্দি ছিলে অপত্য স্নেহে। আমি ভাঙতে চাইনি সে স্নেহনীড়।

মহর্ষি স্তব্ধ হলে স্বর্গনটী ঘৃতাচী বললেন, স্বর্গের স্বাদ, স্বর্গের সুবাস আমার অঙ্গে অঙ্গে। আমি আপনার কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারিনি। একজন দিব্য শক্তিমান মহর্ষি কীভাবে কামমোহিত হন তা জানার জন্য ছিল আমার অসীম আগ্রহ। আমি একদিন আপনাকে আমার রূপে ভুলিয়েছিলাম, কিন্তু আপনার রূপের বাঁধনে আমি বাঁধা পড়িনি।

আপনার আবেগমথিত নর্মলীলার শেষে আমি ফিরে গিয়েছিলাম দিব্যলোকে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে হল আপনার সান্নিধ্যে, আপনার আশ্রমে। স্বর্গে গিয়েই অনুভব করি আমি সন্তানসম্ভবা। আপনার সন্তান আপনার সান্নিধ্যে সংবর্ধিত হোক এই ছিল আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা।

পুত্রমুখ দর্শনের পর আমি আর সুখস্বর্গে ফিরে যেতে পারিনি। আমার সন্তানকে নিয়ে মর্তেই আমি স্বর্গ রচনা করেছিলাম।

আজ সে কেবল শাস্ত্রজ্ঞই নয়, জিতেন্দ্রিয়। কামনা জর্জরিত যৌবনেও সর্বত্যাগী, নিষ্কাম সন্ন্যাসী। শিশুর সারল্য তার সর্বাঙ্গে, সমস্ত চেতনায়।

এবার আপনার হাতে আপনার পুত্রকে সমর্পণ করে চলে যেতে আমার কোনও বাধা নেই। স্বর্গে থেকেও আমি ভুলতে পারব না এই আশ্রম, এই মর্তভূমিকে। ভোগ আর যোগ কীভাবে একই আধারে থাকে তা আপনার সান্নিধ্যে না এলে বুঝতে পারতাম না।

মহর্ষি বললেন, আশ্চর্য দৃষ্টি তোমার সুকল্যাণী, তুমি আমার চরিত্রের সম্যক বিশ্লেষণ করেছ। সংসারকে ভোগ করতে হয় নিরাসক্ত থেকে। পঙ্কে জন্ম পদ্মের কিন্তু প্রস্ফুটিত পদ্মে পঙ্কের গন্ধ থাকে না। জলচর পক্ষী জলে ডুব দেয় কিন্তু তার পাখা জলে সিক্ত হয় না। যিনি সংসারে এইভাবে থাকতে পারেন তিনি সংসারী হয়েও সন্ন্যাসী।

তুমি শুকদেবের প্রসঙ্গ তুলেছিলে। জন্ম থেকেই সে একেবারে স্বতন্ত্র। সে স্বর্গেরও নয়, মর্তেরও নয়। নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করে নিয়েছে নিজস্ব জগৎ। কামনাবাসনা-বিমুক্ত আত্মমগ্ন এক স্রষ্টার চতুর্থ ভুবন।

স্থির দৃষ্টিতে মহর্ষির দিকে তাকিয়ে ঘৃতাচী বললেন, জলভরা মেঘের মতো কিছু বেদনা যদি কখনও সঞ্চারিত হয়ে থাকে আপনার অন্তরে এই দেবনটীর জন্য, তা হলে তাকে তপস্যার তাপে বিশুষ্ক আর নিশ্চিহ্ন করে দেবেন ঋষি। আমি স্বর্গে থেকে নিরন্তর প্রার্থনা করব, স্বর্গ মর্তে সেতুবন্ধন প্রয়াস যেন আপনার নির্বিঘ্নে সফল ও সার্থক হয়।

এবার অখণ্ড নীরবতা। অন্যমনে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন ঋষি কবি। বেদনা-সম্ভব সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান লগ্নে। এখন সেই সৃষ্টিধারায় গতিসঞ্চার করলেন স্বর্গগমনাভিলাষী অপ্সরা ঘৃতাচী।

কী ভাবছেন স্বামী?

এই মুহূর্তে আমার ভাবনার বৃত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন তোমারই মতো আরও দু'জন ত্রিভুবনবাঞ্ছিতা স্বর্গনটী। তাঁরা একসময় মর্তজনের মর্মের বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন।

তাঁদের পরিচয় ও লীলা জানবার জন্য উৎসুক হয়েছি মহর্ষি।

দ্বৈপায়ন বললেন, দেবরাজ ইন্দ্রের মতে স্বর্গনটী মেনকা হলেন সর্বোত্তমা। তিনি একসময় সুরপতির অনুরোধে মর্তে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

ঘৃতাচী বললেন, সে সময় শুনেছিলাম, কোন ঋষির তপোভঙ্গের জন্য নাকি মেনকাকে পাঠানো হয়েছিল মর্তলোকে।

সেই ঋষি হলেন মহাতপা বিশ্বামিত্র। তাঁর কঠোর তপস্যায় শঙ্কিত হয়েছিলেন দেবরাজ। তিনি ভেবেছিলেন, এই মহাশক্তিধর তপস্বী তাঁর ইন্দ্রত্বই বুঝি বা কেড়ে নেন। তাই তিনি দেবনর্তকী মেনকাকে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করতে।

উৎসুক ঘৃতাচী বললেন, তার পরিণতি কী হয়েছিল ঋষি?

উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। আর সেজন্যে নটী মেনকাকে সাহায্য নিতে হয়েছিল পবন দেবতার।

বিস্মিত ঘৃতাচী বললেন, সাহায্য নিতে হয়েছিল! কী ধরনের?

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনে একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন পবনদেব ও মেনকা। অদূরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ছিলেন উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

সহসা পবনদেব শুরু করলেন তাঁর লীলা।

তপোবনে প্রবাহিত হল চঞ্চল পবন। মর্মরধ্বনিতে পূর্ণ হল বনস্থলী। দক্ষিণ পবনের ছোঁয়ায় পিক তুলল কুহুধ্বনি। বসন্তকুসুম ছড়িয়ে দিল তার সুবাস।

মঞ্জীর ঝংকারে মুখর হল তপোবন। মত্ত পবনে মধুমাধবীর সুবাসে নূপুর নিক্কণে বিশ্বামিত্রের তপোবনে যেন আবির্ভূতা হলেন মন্মথ মনোহারিণী রতি।

ধ্যানভঙ্গ হল বিশ্বামিত্রের। শ্রবণে, আঘ্রাণে স্পর্শে বিমোহিত হল মহর্ষি বিশ্বামিত্রের চিত্ত। তিনি সম্মুখে দেখলেন এক অপরূপা, লাস্যময়ী দেবনর্তকী।

এবার প্রমত্ত হল পবন। ঘূর্ণি বায়ুতে উড়ে চলে গেল নর্তকীর উত্তরীয়। বিস্রস্ত হল বেশবাস।

রতির স্পর্শে মহর্ষির হৃদয়ে জাগল প্রেমের উচ্ছ্বাস। তিনি প্রায় বিবসনা নর্তকীকে ধারণ করলেন আপন বক্ষে।

লীলা অবসানে বিচ্ছিন্ন হলেন দু'জনে। পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলেন ঋষি বিশ্বামিত্র।

মেনকা তাঁর গর্ভজাত শিশুকন্যাকে একদিন পরিত্যাগ করে গেলেন মহর্ষি কণ্বের তপোবনে। শকুন্তের পক্ষচ্ছায়ায় রক্ষিত হয়েছিল বলে তার নামকরণ করা হয়েছিল শকুন্তলা।

পরে যৌবনে আশ্রমদুহিতা শকুন্তলার প্রণয়মুগ্ধ হন পৃথিবীপতি মহারাজ দুষ্মন্ত।

তাঁদেরই একমাত্র সন্তান ভরত, কুরু-পাণ্ডব বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে চিহ্নিত।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন নীরব হলে ঘৃতাচী প্রশ্ন করলেন, দ্বিতীয় অপ্সরা কোন জন এবং তিনি তাঁর প্রেমে কাকে মুগ্ধ করেছিলেন?

উত্তর এল মহর্ষির মুখ থেকে, যাঁরা চরণের স্পর্শে মঞ্জরিত হত অশোকতরু, বিকশিত হত নন্দনের পারিজাত, তুফান উঠত দেবতাদের হৃদয়ে, সেই ত্রিভুবন বিমোহিনী উর্বশীই একসময় মর্তভূমির মহারাজ পুরূরবার হৃদয়বাসিনী হয়েছিলেন।

উর্বশী ব্রহ্মশাপে স্বর্গভ্রষ্টা হন।

মর্তে অবতরণ করে তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হন মহারাজ পুরূরবা-র রূপে। মহারাজও স্বর্গনটীকে দর্শন করে প্রমত্ত হলেন তাঁর প্রেমে। তিনি সেই বরবর্ণিনী অপ্সরাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন।

নটী উর্বশী সম্মত হলেন রাজাকে গ্রহণ করতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি শর্ত দিলেন।

ঘৃতাচী জানতে চাইলেন, কী শর্ত মহর্ষি?

মহারাজ কোনওদিন প্রিয়তমা উর্বশীর দৃষ্টির সম্মুখে বিবসন হতে পারবেন না।

মহারাজ সেই শর্তে রাজি হলেন। কিন্তু নির্মম বিধির নির্বন্ধ। একদিন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় শর্ত ভঙ্গ হয়ে গেল।

উৎসুক ঘৃচাতী বললেন, কীভাবে?

পশুদের ওপর অগাধ মমতা ছিল স্বর্গনটী উর্বশীর। তিনি দুটি মেষ শিশুকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করতেন। নিশাকালে উর্বশীর শয্যাপার্শ্বেই ছিল তাদের স্থান।

একরাত্রে যখন মহারাজ এবং উর্বশী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, তখন সহসা দুটি মেষের আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

উর্বশী চমকে উঠে বসলেন শয্যার ওপর। জ্যোৎস্নালোকে দেখলেন, জনৈক তস্কর দুটি মেষশিশুকে নিয়ে পলায়ন করছে।

উর্বশী চিৎকার করে উঠলেন।

মহারাজ তাঁর আর্তস্বর শুনে অসংবৃত বেশবাসে গৃহ থেকে বেরিয়ে তস্করের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

চন্দ্রালোকে মহারাজকে নিরাবরণ অবস্থায় দেখে উর্বশীর মনে পড়ে গেল তাঁর দেওয়া শর্তের কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

উর্বশী বিহনে মহারাজ কাতর হয়ে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন স্থান থেকে স্থানান্তরে।

একদিন এক তীর্থ সরোবরে তাঁর দেখা হয়ে গেল উর্বশীর সঙ্গে।

পুরূরবা কাতর কণ্ঠে বললেন, তোমার চিত্ত কি এতই নিষ্ঠুর! দয়া করে তুমি এখনই আমাকে পরিত্যাগ করে যেয়ো না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

উর্বশী বললেন, কী হবে তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে, আমি শর্ত মেনেই চলে এসেছি। তা ছাড়া মনে করো, আমি ঊষা তুমি সূর্য। অনাবৃত সূর্যকে আকাশে দেখা গেলে ঊষা সেখান থেকে সরে চলে যায়। হে রাজা, তুমি আপন প্রাসাদে ফিরে যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তেমনই আমাকেও তুমি ধারণ করতে পারবে না।

পুরূরবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার বিরহে আমি বিষণ্ণ। ধনুতে শরসন্ধান করতে পারিনি দীর্ঘকাল, তাই জয়শ্রী লাভে অকৃতার্থ হয়েছি। আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করবার চিন্তা ত্যাগ করেছে।

তুমি বীর, তুমি প্রেমিক পুরূরবা। দেবতারা তোমাকে দস্যুবধ উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

তুমি আমাকে ভালবেসে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করেছিলে। আমি তোমার সুশ্রী পুত্রের জননী হতে চলেছি। তাকে আমি কিছুদিনের মধ্যেই তোমার হাতে সমর্পণ করব।

কাতর পুরূরবা বক্ষে করাঘাত করে বললেন, আমাকে হিংস্র বৃকেরা (নেকড়ে) যেন ভক্ষণ করে। তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

আর্দ্রকণ্ঠে উর্বশী বললেন, এমনভাবে তোমার অবসানের কথা ঘোষণা কোরো না, প্রিয়তম। স্ত্রীলোক আর বৃকের হৃদয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

শেষবারের মতো কাতরোক্তি করে উঠলেন মহারাজ পুরূরবা। ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে উর্বশী।

উর্বশী আশ্বাস দিয়ে বললেন, হোমদ্রব্য দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করো। তাঁদের কৃপায় তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হবে।

ঘৃতাচীর প্রশ্ন, পুরূরবা কি তাঁর সন্তানকে পেয়েছিলেন?

মহর্ষি বললেন, কথা রেখেছিলেন উর্বশী। বৎসরান্তে স্বর্গ থেকে নেমে এসে তিনি পুরূরবার অঙ্কে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সন্তান।

কাহিনী শেষে নীরবে দু'জনে বসে রইলেন কতক্ষণ। একসময় ঘৃতাচী বললেন, স্বর্গের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। যাঁরা একবার স্বর্গবাসের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা মর্তভূমিতে এলেও স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। মর্ত-মানুষের কাছেও স্বর্গপ্রাপ্তি এক শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু।

মহর্ষি বললেন, তোমাকে আজ আমি প্রসন্নমনে মুক্তি দিলাম। যদি কোনওদিন এই মর্তের মৃত্তিকাকে মনে পড়ে, যদি ফলভারে অবনত আশ্রমতরুগুলি তোমার স্মরণে আসে, অথবা পুত্রস্নেহে উদ্বেল হয় তোমার হৃদয়, তা হলে চলে এসো এ আশ্রমে। হে কল্যাণী, তোমার জন্য এ আশ্রমের দ্বার চির উন্মুক্ত থাকবে।

ঘৃতাচী বললেন, শেষ বিদায়ের আগে শুধু একটি অনুরোধ, যে বিপুল অভিজ্ঞতা আপনি সঞ্চয় করলেন জীবনে তাকে রূপ দিন আপনার লেখনীতে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সেই সৃষ্টি লাভ করবে অক্ষয় অমরত্ব। সেদিন আপনার কাছে আমি না থাকলেও দূর স্বর্গলোক থেকে আমি দেখব, আপনার বহুবর্ণময় সৃষ্টির ইন্দ্রধনু স্থল জল অন্তরীক্ষকে স্পর্শ করে এক অনাদি অনন্ত পরম বিস্ময়লোক রচনা করেছে।

মহর্ষি বললেন, আশ্চর্য আমাদের ভাবনার মিল কল্যাণী! তোমার আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই আমি আমার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়ে মহাভারত রচনার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, তোমার অদৃশ্য প্রেরণাই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমার ভাবনাকে। তবে তাই হোক। বিদায়-বেদনার মন্থনে উঠে আসুক অনন্ত জীবনদায়ী অমৃত।

দুই

প্রাসাদে ঘণ্টাধ্বনি হল। পার হয়ে গেল মধ্যরাত্রি। নিদ্রাহীন নিশিযাপন করছেন মহারাজ সুবল। ললাটে করস্থাপন করে মহারানিও চিন্তামগ্ন।

খোলা বাতায়ন-পথে দেখা যাচ্ছে গান্ধারের আকাশ নক্ষত্রখচিত। মহারাজ অমারাত্রির সেই আকাশের দিকে তাকালেন। এ যেন নক্ষত্র নয়, চিন্তার জোনাকিপুঞ্জ।

মহারানির দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

মহারাজ বললেন, কী ভাবছ?

অন্ধকারে ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। কান্না-ভেজা গলায় মহারানি বললেন, কিছু ভাবতে পারছি না রাজন।

মহারাজের স্বরে উৎকণ্ঠা, নিশা-অবসানের অধিক বিলম্ব নেই, প্রভাতেই হস্তিনাপুরের দূতকে মহামতি ভীষ্মের প্রস্তাবের উত্তর দিতে হবে। রাত্রির শেষ যামের মধ্যেই কিন্তু আমাদের পৌঁছোতে হবে যে-কোনও একটি সিদ্ধান্তে।

একসময় উত্তেজনায় শয্যার ওপর উঠে বসলেন মহারাজ সুবল।

বললেন, হস্তিনাপুরের খ্যাতি আসমুদ্র হিমাচল। সেই কুরুকুলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন যে-কোনও রাজপরিবারের পক্ষেই অত্যন্ত গৌরবের।

মহারানিও উত্তেজনায় উঠে বসলেন, এতে কোনও রকম দ্বিমত থাকার কথা নয় মহারাজ। আমি শুধু সর্বগুণান্বিত সেই পাত্রের অন্ধত্বের কথা ভাবছি।

মহারাজ সুবল এবার যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন, তুমি যথার্থই বলেছ, পাত্র সর্বগুণান্বিত। স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন। তা ছাড়া অন্ধ হলেও শব্দভেদী বাণে তিনি লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারেন। শস্ত্র শাস্ত্র দুটোই তাঁর অধিগত।

এই মুহূর্তে মহারানি চিন্তাভার মুক্ত হলেন।

এখন আর আমার কোনও দ্বিধা নেই মহারাজ। এই ভারতখ্যাত বংশে জাত সুপুরুষ শক্তিমান পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে এখন আমি প্রস্তুত।

মহারাজ উত্তেজনায় রানির হস্তধারণ করে বললেন, তোমার প্রসন্ন সম্মতিতে আমার সমস্ত দ্বিধা কেটে গেল মহারানি।

চিন্তার ভার মুক্ত হলেন দু'জনে। পূর্বাশার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, শুকতারা একটি বৃহৎ হীরকখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করছে আকাশে।

মহারাজ সেদিকে রানির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দেখো, অন্ধকারের বুকে নক্ষত্রটি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মহারানি বললেন, নতুন প্রভাতের আশ্বাস নিয়ে এসেছে ও।

প্রভাতে কন্যা গান্ধারীকে কাছে ডেকে হস্তিনাপুর থেকে আগত দূতের বার্তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন মহারাজ। শেষে বললেন, কুরুকুলপতি ভীষ্ম তোমাকে হস্তিনাপুরের বধূরূপে পেতে চান। এই প্রস্তাব আমাদের রাজপরিবারের পক্ষে পরম গৌরবের। তবে, অন্ধ হলেও সর্বগুণান্বিত এই পাত্রকে বরণ করার সিদ্ধান্ত একমাত্র তোমাকেই নিতে হবে। এখন তুমি তোমার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গিয়ে কিছু সময় চিন্তা করে তোমার সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়ে যাও।

গান্ধারী ধীরপদে নিজ প্রকোষ্ঠে চলে গেলেন।

মহারাজ সুবলের কন্যাটি চিরদিনই স্থিতধী। সৌন্দর্যের সঙ্গে ধর্মবোধ ও প্রশান্তি তাঁর অবয়ব ও আচরণকে অনন্য মহিমা দান করেছে।

দূরে প্রসারিত শৈলমালা। দিগন্তে তাকে ছুঁয়ে আছে ইন্দ্রনীলাভ আকাশ। একখণ্ড জলভরা মেঘ থমকে থেমে আছে শৈল-শীর্ষে। তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে প্রদীপ্ত সূর্যের কনক-জ্যোতি।

হঠাৎ অলিন্দে নূপুরের ধ্বনি শুনে মহারাজ ও মহারানি তাকালেন প্রবেশদ্বারের দিকে।

পটে লেখা ছবির মতো ঘরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সুসজ্জিতা গান্ধারী। সহচরীর হাতে দক্ষিণ করটি ন্যস্ত।

কিন্তু এ কী।

যে কন্যার দুটি চোখ পদ্মপলাশনিন্দিত, সে দুটিকে বাঁধা হয়েছে ঘনপিনদ্ধ পট্টবস্ত্রে।

মহারানি কন্যার এই রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলেন, এমন করে তোমার দৃষ্টিকে আবৃত করে ফেলেছ কেন মা?

উদ্বিগ্ন মহারাজও কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গান্ধারী গভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি যাঁকে পতিরূপে বরণ করতে যাচ্ছি, আজ থেকে তাঁর জগৎ-ই হবে আমার জগৎ। আলোর জগতে এতদিন তো অনেক কিছু দেখেছি, এবার অন্ধকারের জগতটাকে চিনে নিতে চাই, সেখানেই হবে স্বামীর সঙ্গে আমার সত্যিকারের মিলন।

মহারাজ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি সর্বংসহা, সর্বজয়া হও মা।

হস্তিনাপুরের প্রেরিত অতি সুশোভন রথে পরদিন আরোহণ করলেন গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী।

তাঁর পশ্চাতে মহারাজ সুবলের রথে বিবাহের সমস্ত রকম যৌতুক নিয়ে গান্ধারীর এক ভ্রাতা অগ্রসর হলেন। তিনি শকুনি নামেই সর্বজন পরিচিত।

মহাসমারোহে হস্তিনাপুরে সম্পন্ন হল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহকর্ম। স্বামীর অন্ধত্বকে চিরতরে বরণ করে নেবার জন্য হস্তিনাপুরের দিকে দিকে উঠল গান্ধারীর জয়ধ্বনি।

ধর্ম যেন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন গান্ধারীকে।

* * *

অন্তঃপুরের বিশেষ কক্ষটি আজ সুশোভিত। খাস পরিচারিকা গৃহকোণে মণিদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছে। নববধূর জন্যে নিযুক্ত পরিচারিকা তাঁর হাত ধরে কক্ষের অভ্যন্তরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিয়ে গেছে পালঙ্কের ওপর। পুষ্পরেণু গন্ধ মাখা দক্ষিণ সমীর আঘ্রাণে আকুল করেছে নববধূর হৃদয়।

এবার বাসরগৃহে অন্ধ রাজপুত্রের বধূসমাগম। প্রদীপ্ত যৌবন কান্তিমান ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অতি প্রিয় বৈশ্যা-দাসীর হাত ধরে কক্ষে প্রবেশ করলেন।

দাসী যথাস্থানে রাজকুমারকে বসিয়ে দিয়ে উভয়ের কাছে বিদায় নিয়ে ধীরপদে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে গেল। কেন জানি না একটি বেদনার ছায়া ঘনাল বৈশ্যা-দাসীর মুখে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাহু প্রসারিত করলেন, তুমি কোথায় গান্ধার রাজকুমারী?

গান্ধারী স্বামীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে তাঁর দুটি হাত ধরলেন।

ধৃতরাষ্ট্র নববধূর কম্পিত কর স্পর্শ করে বললেন, কল্যাণী, তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠধন। বলো, তার বিনিময়ে আজ এই মিলন রজনীতে আমি তোমাকে কী দিতে পারি?

বিস্ময়ের সুর গান্ধারীর কণ্ঠে, আমি আপনাকে কী দিয়েছি আর্যপুত্র!

তুমি তোমার জীবন থেকে আলোকের প্রসাদ দূরে সরিয়ে দিয়ে আমার অন্ধকার জগৎটাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ। অন্ধ স্বামীর জন্য তোমার এ ত্যাগ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সুকল্যাণী।

অতি সংযত আর পরিশীলিত কণ্ঠে গান্ধারী বললেন, আশৈশব আমি আলোর দেবতার অনিঃশেষ লীলা দেখেছি, এখন আমি অন্ধকারের তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসিনী মূর্তিটা দেখতে চাই। আর সে রূপ দেখব আমি আপনারই হাত ধরে।

সেই মুহূর্তে এক বীর্যবান যুবাপুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিলেন এক পুত্রকামী নবোঢ়া নারী।

প্রাসাদ পরিক্রমা করছিল ভোরের বৈতালিক। কুরুরাজ পাণ্ডুর জয়ঘোষণা করছিল তারা।

উপবিষ্ট গান্ধারীকে বাম বাহুতে বেষ্টন করে শয্যার ওপর বসে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি বৈতালিকদের জয়ধ্বনি শুনে বললেন, তুমি কি জানো, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুই রাজরাজেশ্বর?

জয়ঘোষণা থেকে এইমাত্র জানলাম আর্যপুত্র।

সামান্য সময় নীরবতা। পরক্ষণেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, এই নিয়ে তোমার চিত্তে কোনও বিক্ষেপ নেই তো কল্যাণী?

আমার চিত্ত ধর্মে স্থিত স্বামী। সত্যকে স্বীকার করাই ধর্ম। সত্য আর ধর্ম আমার চিন্তায় অভিন্ন।

তবু বলি, জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে কুরু সিংহাসন আমারই প্রাপ্য। কিন্তু জন্মান্ধ বলে সিংহাসনের অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত।

এবার আমি কি একটি প্রশ্ন করতে পারি আর্যপুত্র?

অবশ্য, যে-কোনও প্রশ্ন অসংকোচে করতে পারো।

গান্ধারী বললেন, সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আপনার চিত্তে কি কোনও রকম সংক্ষোভ নেই?

তোমার মতো নিরাসক্ত হতে পারলে খুশি হতাম কল্যাণী। তবে সত্যকে স্বীকার করে নিলেও ভাগ্যের বঞ্চনার জন্য মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হই।

আপনি কি দেবর কুরুরাজের প্রতি কোনও রকম অসূয়া পোষণ করেন?

ভাগ্যের ওপর আক্ষেপ থাকলেও ভ্রাতা আমার প্রাণাধিক। পাণ্ডু প্রতিটি রাজকার্যে আমার পরামর্শ নেয়। অগ্রজের প্রতি তার আকর্ষণ প্রশ্নাতীত।

তখনও ভোরের পরিশুদ্ধ আলো প্রাসাদ শিখরকে প্লাবিত করেনি।

গান্ধারী সম্পূর্ণ ভিন্ন কথার অবতারণা করলেন, সম্ভ্রান্ত কুরুকুলের সুখ্যাতি সুদূর গান্ধারেও অবিদিত নয়। কিন্তু কুরুপ্রধান মহাবীর ভীষ্ম বর্তমানে, দেবর পাণ্ডু কীভাবে রাজ্যভার প্রাপ্ত হলেন?

সে কাহিনী সুদীর্ঘ না হলেও বড় বিচিত্র সুকল্যাণী। বৈতালিক শেষ হয়েছে, প্রভাতের অধিক বিলম্ব নেই। প্রধানা কিংকরী আমাদের জাগরিত করতে যে-কোনও মুহূর্তে দ্বারে করাঘাত করবে। কাল নিশি-মিলন-শয্যায় তুমি পাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

মৃদু করাঘাত হল দ্বারে।

বাহুবেষ্টনী শিথিল হল ধৃতরাষ্ট্রের। পালঙ্ক থেকে অবতরণ করলেন গান্ধারী। বিস্রস্ত বাস ও কেশপাশ সংযত করে খুলে দিলেন দ্বার।

আজ দু'জন দাসী এসেছে রাজকুমার ও নববধূর পরিচর্যায়।

প্রভাতি আচমনাদির শেষে কিংকরী বারমহলে নিয়ে গেলেন রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে। সেখানে নিজ আসনে উপবিষ্ট হলেন তিনি। নিত্যকার মতো ভ্রাতা পাণ্ডু এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিছু সময় দু'জনে অতিবাহিত করলেন সানন্দ সংলাপে।

অন্তঃপুরে গান্ধারী দাসীর কর ধারণ করে প্রথমে সত্যবতীর কক্ষে গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করলেন।

সত্যবতী গান্ধারীর শির চুম্বন করে বললেন, তুমি কুরুকুলের লক্ষ্মী, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করো।

এরপর নববধূ দুই শ্বশ্রূমাতা অম্বিকা, অম্বালিকাকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

বিবাহ উপলক্ষে পরিপূর্ণ রাজগৃহে মুহুর্মুহু উচ্চারিত হচ্ছিল প্রশংসাধ্বনি। স্নেহে, সমাদরে অভিসিঞ্চিত হচ্ছিলেন সুবলাত্মজা গান্ধারী।

দ্বিতীয় রজনীতে স্বামী সান্নিধ্যে এলেন নববধূ।

গৃহদ্বার রুদ্ধ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধত্ব তাঁর স্বাভাবিক বিচরণে বিশেষ কোনও বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। তিনি বধূ গান্ধারীকে নিয়ে সুসজ্জিত পালঙ্কে উপবেশন করলেন।

কাল রজনীতে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি কল্যাণী। আজ তোমার কৌতূহল নিরসনের চেষ্টা করব।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলাই আমাদের বংশের উল্লেখযোগ্য আদি পুরুষ ও রমণী। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে বধূরূপে বরণ করেছিলেন কিন্তু নানারূপ দৈব দুর্বিপাকে তাঁদের রাজগৃহবাস সহজ হয়নি। অবশেষে বেদনাময় বিচ্ছেদের পর সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মধুর মিলন।

তাঁদেরই সন্তান ভরত। আর ভরতের বংশেই জন্ম মহারাজ শান্তনুর। ওই বংশেরই অন্যতম রাজা ছিলেন হস্তী, যাঁর নাম থেকে আমাদের এই রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর।

শান্তনুই আমাদের এই কুরুপাণ্ডব বংশের অন্যতম প্রধান পুরুষ। (তিনি জরাজীর্ণ কোনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করামাত্র সে যুবার ন্যায় সবল হয়ে উঠত, এজন্যে তাঁর নাম হয় শান্তনু।)

মহারাজ শান্তনু মহাধনুর্ধর ছিলেন। মৃগয়ায় ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি।

একদিন জাহ্নবীতীরের বনভূমিতে মৃগয়ার অবসরে তিনি দেখতে পেলেন এক পরম কান্তিময়ী কন্যাকে। স্নানলীলা সমাপন করে তিনি তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তির ওপর সূর্যের রশ্মি গলিত স্বর্ণের মতো ঝরে পড়ছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন মহারাজ শান্তনু।

পরমুহূর্তে সেই অলোকসামান্যা কন্যার দৃষ্টিও মহারাজের বরতনুর দিকে আকৃষ্ট হল।

দু'জনে দু'জনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন।

প্রথম বিবাহের প্রস্তাব দিলেন শান্তনু।

সে প্রস্তাব গ্রহণ করেও একটি শর্ত রাখলেন সেই দিব্যকন্যা গঙ্গা।

থামলেন ধৃতরাষ্ট্র।

উৎসুক গান্ধারী বললেন, কী শর্ত আর্যপুত্র?

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, গঙ্গার শর্ত ছিল, বিবাহিত জীবনে তিনি যা কিছু আচরণ করবেন, সে সম্বন্ধে মহারাজ শান্তনুর কোনও রকম প্রশ্ন করা চলবে না।

তাতেই স্বীকৃত হলেন রূপমুগ্ধ মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র কিছু সময় নীরব হলেন।

অন্ধকার রজনী। নিরন্ধ্র অন্ধকার কক্ষ। কক্ষকোণে সারা রাত্রি যে মণিদীপ জ্বলতে থাকে, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রধানা কিংকরী সেটিকে নির্বাপিত রেখেছিল।

রজনী অন্ধকার, গৃহ অন্ধকার, বক্তার নয়নের আলোও চিরতরে নির্বাপিত।

সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে যেন সাতটি হীরককণিকা পরপর কুড়িয়ে নিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র।

ধৃতরাষ্ট্রকে নীরব দেখে গান্ধারী বললেন, গঙ্গার কাহিনী বলতে বলতে আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন স্বামী?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সাতটি অতি মূল্যবান হীরকখণ্ড বৎসরান্তে একটি একটি করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলে তোমার কী ধরনের অনুভূতি হবে প্রিয়তমা?

আমি নিক্ষেপই করব না আর্যপুত্র। এমন নির্বোধ কে আছে যে ওই দুর্মূল্য হীরকখণ্ডগুলি একে একে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে।

মহারানি গঙ্গা তাই করেছিলেন।

সবিস্ময়ে স্বামীর বাহুতে করস্পর্শ করে গান্ধারী বলে উঠলেন, তাই!

না না, হীরকখণ্ড নয়, তার চেয়ে মহামূল্যবান সাত সাতটি সন্তানকে প্রতি বছর এক একটি করে জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করেছিলেন মহারানি গঙ্গা।

বিস্ময়-কাতর গলায় বলে উঠলেন গান্ধারী, আপন সন্তানকে জননী জলে নিক্ষেপ করলেন!

আকৈশোর গঙ্গার ধারণা ছিল, তিনি যৌবনে দিব্যসন্তানদের ধারণ করবেন। তাঁরা শাপগ্রস্ত অষ্টবসু। মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপেই তাঁরা অবতরণ করবেন মর্তভূমিতে। তাঁদের শাপমুক্ত করার ভার নিতে হবে গঙ্গাদেবীকে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই গঙ্গা তাঁর প্রতিটি সন্তানকে জলে নিক্ষেপ করতেন।

গঙ্গার এই আচরণে অন্তরে গভীর আঘাত পেতেন মহারাজ শান্তনু। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলে তিনি গঙ্গার কাজে কোনও রকম বাধার সৃষ্টি করেননি। যখন অষ্টমগর্ভের

সন্তানটিকে জলে বিসর্জন দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন গঙ্গা, তখন তাঁকে বাধা দিলেন পুত্র-শোকাতুর পিতা শান্তনু। এই প্রথম আর শেষ তাঁর বাধাদান।

গঙ্গা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ তাই হবে, এ সন্তানটি তোমারই থাকবে। তবে শর্ত অনুযায়ী আমি আর রাজপুরীতে ফিরে যাব না। এ সন্তানটিকে এখন আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোমার কাছে যথাসময়ে আমি ফিরিয়ে দেব।

গঙ্গাকে চিরতরে হারিয়ে গভীরভাবে মর্মাহত হলেন মহারাজ শান্তনু। কিন্তু সন্তানসহ জননীকে চলে যেতে বাধা দিলেন না।

গান্ধারী বললেন, দেবী গঙ্গাই কি তা হলে মহামতী ভীষ্মকে এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন?

হ্যাঁ। মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে তিনি বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। আর তাঁর শস্ত্র শিক্ষার গুরু ছিলেন মহাশক্তিধর পরশুরাম। তখন ভীষ্মের নাম ছিল দেবব্রত। যথাসময়ে উপযুক্ত পুত্রকে ফিরে পেয়ে মহারাজ শান্তনুর আনন্দের অবধি ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল নীরব রইলেন। গান্ধারী বললেন, আমার কৌতূহলের নিরসন এখনও হয়নি প্রিয়তম।

অন্ধ দুটি চোখ তুলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তুমি জানতে চেয়েছ ভীষ্ম বর্তমানে পাণ্ডু কীভাবে সাম্রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করল?

সে কাহিনী চমকপ্রদ। তার মূলে রয়েছেন আমার পিতামহী সত্যবতী। তাঁর জীবনকথা সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। বলছি শোনো, তাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

স্বামীর পরবর্তী কথাগুলি শোনার জন্য সাগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন নববধূ গান্ধারী।

সত্যবতী ছিলেন ধীবর বংশের রাজার পালিতা কন্যা। যমুনায় খেয়া পারাপারের কাজে পিতাকে তিনি সাহায্য করতেন। যাত্রী পারাপারের কাজটা তিনি নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন।

কুমারী কন্যা সত্যবতী ছিলেন পরমাসুন্দরী এবং উদ্ভিন্ন যৌবনা।

প্রভাতকাল। পারাপারের নৌকো নিয়ে ঘাটে এলেন সত্যবতী। একজন মাত্র পারার্থী দাঁড়িয়ে ছিলেন তীরে, তিনি মহর্ষি পরাশর। বহুদূর পথ অতিক্রম করে তিনি যমুনা পার হয়ে যাওয়ার জন্য পারঘাটে এসেছেন। তাঁর চলা শুরু হয়েছিল মধ্যরাত্রি থেকে। নির্জন জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। প্রকৃতি তন্দ্রাচ্ছন্ন, কুলায় পাখিরা নীরব। মাঝে মাঝে প্রকৃতির প্রশ্বাসের মতো বাতাসের স্বনন, আলো আঁধারে অবগুণ্ঠনে ঝিমিয়ে আছে চরাচর।

কিন্তু যমুনার জলে চন্দ্রদেবের কী বিচিত্র বিভঙ্গ। আলোকে তরঙ্গে আলোড়িত নর্মলীলা। সে দৃশ্য মুনিজনেরও চিত্তবিভ্রান্তি ঘটায়।

ঋষি পরাশর দেখলেন সেই লীলাবতী তরঙ্গ যেন কায়ারূপ ধারণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

সত্যবতীর নৌকো তীর স্পর্শ করামাত্র কামনায় জর্জরিত হলেন তপস্বী পরাশর। ভেঙে গেল তাঁর এতকালের সংযমের বাঁধ। তিনি দাশকন্যার কাছে সকাতরে সম্ভোগের প্রস্তাব রাখলেন।

সত্যবতী নানাভাবে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন মুনিবরকে। এ কার্যের ফলে তাঁর কুমারীত্ব নষ্ট হবে এ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

মহামুনি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, তুমি এক মহান পুত্রের জননী হবে, এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত কোরো না।

সহসা দিগদেশ ঘনকুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সত্যবতী পরাশরকে নিয়ে বনাচ্ছাদিত যমুনার একটি দ্বীপে উঠলেন। সেই নির্জনে কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মিলন হল দু'জনের।

সম্ভোগলীলার শেষে নিজ গন্তব্য পথে চলে গেলেন পরাশর। যাবার আগে তিনি ধীবরকন্যা সত্যবতীকে বললেন, অমোঘ বীর্য আমার, তুমি তারই প্রসাদ লাভ করলে আজ। আমি পরিতৃপ্ত, বলো কী তোমার প্রার্থনা?

সত্যবতী বললেন, ধীরবকুলে আমার বাস, তাই আমার দেহ থেকে মৎস্যগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপনি অনুগ্রহ করে সেই গন্ধ আমার শরীর থেকে দূর করার ব্যবস্থা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে ঋষি পরাশর বনভূমি থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন একটি গুল্ম। বললেন, এটি চর্বণ করো। তোমার সমস্ত গাত্রগন্ধ বিদূরিত হয়ে সুগন্ধে পূর্ণ হবে।

এরপর থেকে সত্যবতী যথার্থই হলেন যোজনগন্ধা। বহুদূরের মানুষও তাঁর দেহের অপূর্ব সৌরভ আঘ্রাণ করে বিমোহিত হতেন।

আশ্রমে যাত্রার আগে ঋষি পরাশর সত্যবতীকে মিথ্যা একটি স্তোকবাক্য শুনিয়ে গিয়েছিলেন।

কী সে স্তোকবাক্য আর্যপুত্র?

তোমার কুমারীত্ব এই মিলনের ফলে নষ্ট হবে না।

গান্ধারী উত্তেজিত হয়ে বললেন, সরলমতি কন্যাদের এইভাবে প্রতারিত করা হয়।

এদিকে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম নিলেন দ্বৈপায়ন। পরে তিনি বেদ বিভাগ করে খ্যাত হলেন বেদব্যাস নামে।

গান্ধারী জানতে চাইলেন, ধীবররাজ কি কন্যার এই গোপন সংযোগের ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন?

না, কোনও ভাবেই নয়। সুকৌশলে তাঁর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল সমস্ত ঘটনাটি।

তারপর?

ঋষি পরাশর একসময় এসে তাঁর পুত্রটিকে নিয়ে চলে গেলেন হিমালয়ের কোলে তাঁর আশ্রমে। সেখানেই চলবে দ্বৈপায়নের ঋষি-সংস্কার সম্মত উপযুক্ত শিক্ষা।

সত্যবতী নিশ্চয়ই স্বামী-পুত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন হিমালয়ের আশ্রমে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার অনুমান সঠিক নয়। তিনি ঋষির আশ্রমে চলে গেলে কুরুবংশের বধূ হয়ে এলেন কীভাবে।

গান্ধারী নিজের ভুলটিকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, তাই তো।

সত্যবতী তাঁর কুমারী জীবনের মতোই পারঘাটে যাত্রী পারাপারের কাজ করতে লাগলেন।

গান্ধারী উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন এরপর কীভাবে এলেন কুরুবংশে? তা ছাড়া আপনিই বা আপনার পিতামহীর এসব গুপ্ত কথা জানলেন কী করে?

তুমি একই সঙ্গে দুটি প্রশ্ন করেছ। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দেবার চেষ্টা করছি।

আমার পিতামহীর নাম সত্যবতী। তাই একদিন আমার কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য তিনি তাঁর অতীত জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন।

তোমার কৌতূহলের বিষয় কী ছিল আর্যপুত্র?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি তখন কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যে প্রবেশ করেছি। দেহে অনুভব করছি সিংহের বিক্রম। প্রাত্যহিক শরীরচর্চা শেষ করে স্নানান্তে বসি বিশ্রামগৃহে। এ সময় আমি প্রতীক্ষা করি আমার স্নেহময়ী পিতামহীর। তিনি এই সময়টিতে আমার পাশে এসে বসেন। প্রভাতকালীন জলযোগ তাঁর স্নেহহস্ত থেকেই আমি গ্রহণ করি।

একদিন তিনি এলেন আমার ঘরে। আমার শ্রবণে চির পরিচিত তাঁর পদধ্বনি। কিন্তু সেদিন শুনতে পেলাম, অশ্রুতপূর্ব অপরিচিত আরও কোনও ব্যক্তির পদশব্দ।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শব্দ লক্ষ করে সেদিকে ফিরলাম।

আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন দু'জন। একজন বহু চেনা, অন্যজন সম্পূর্ণ অচেনা।

পিতামহীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তোমার জন্মদাতা পিতা দাঁড়িয়ে আছেন তোমার সামনে। প্রণাম করো তাঁকে।

আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবাক। আমার পিতা মহারাজ বিচিত্রবীর্য বহুকাল আগে পার্থিব লীলা সংবরণ করেছেন, তিনি সহসা আবির্ভূত হলেন কীভাবে!

তবু পিতামহীর আদেশ আমার অবশ্য পালনীয় মনে করে আমি অনুমানে নত হয়ে হাত বাড়ালাম।

অপরিচিত পুরুষটি আমাকে তাঁর বুকে টেনে নিলেন।

একেবারে নিরাবরণ লোমশ একটি বক্ষস্থলে হাত ঠেকতেই আমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

গান্ধারী এতক্ষণ যেন একটি রহস্য-নাটকের প্রস্তাবনা শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, আপনার বিস্ময়ের কারণ কী আর্যপুত্র?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন হস্তিনাপুর প্রাসাদে মহারাজ শান্তনুর মহিষীর সামনে অনাবৃত বক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা এক অকল্পনীয় ব্যাপার, তাই সেই মুহূর্তে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

উৎসুক গান্ধারী বললেন, তারপর?

সেই অপরিচিত পুরুষ আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, পুত্র, তোমার মানস-নেত্রের উন্মোচন ঘটুক।

পরে তিনি আমার পিতামহীকে জননী সম্বোধন করে বললেন, মা, এখন আদেশ করুন, আশ্রমে ফিরে যাই।

পিতামহী বললেন, চলো বাবা, তোমাকে অন্তঃপুর পার করে দিয়ে আসি।

সেদিনই সন্ধ্যালগ্নে আমি পিতামহীর মুখ থেকে শুনতে পাই, মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মরহস্য। সঙ্গে সঙ্গে আমার এবং ভ্রাতা পাণ্ডুর।

আপনার এবং দেবর পাণ্ডুর যে কোনও রকম জন্মরহস্য থাকতে পারে, এ আমার কাছে এক অভাবনীয় ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সে রহস্যের সমাধান হবে। তার আগে তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি দিতে চাই। সত্যবতী ঋষি পরাশরের কামনা-সঙ্গিনী আর দ্বৈপায়নের জননী হয়েও কীভাবে হস্তিনাপুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন মহারাজ শান্তনুর অগ্র-মহিষীর মর্যাদায়।

বলুন আর্যপুত্র সে রহস্যকাহিনী।

যমুনা তীরে মহারাজ শান্তনু একদিন পরিভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ পারঘাটের অদূরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, ধীবর-পল্লি থেকে একটি কন্যা আলপথের ওপর দিয়ে নদীতীর লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। প্রভাতে নরম সোনালি সূর্যের আলোয় স্নান করছিল মেয়েটি। তার ললাট, চিবুক, কেশপাশ প্লাবিত করে যেন আলোর ঝরনা বয়ে যাচ্ছিল।

মহারাজ শান্তনুর মনে হল, এতখানি মুগ্ধতা জীবনে কখনও তিনি অনুভব করেননি।

কন্যাটি তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছে দেখে মহারাজ বললেন, কোথায় চলেছ মনোহারিণী, কার ঘরই বা তুমি আলো করে রয়েছ?

কন্যাটি সামনে পরমাসুন্দর এক সুসজ্জিত মহিমান্বিত রাজপুরুষকে দেখে নত হয়ে নমস্কার নিবেদন করল। পরক্ষণে অনাবৃত দক্ষিণ বাহুটি ধীবর পল্লির দিকে প্রসারিত করে বলল, আমি দাশরাজকন্যা সত্যবতী। যাত্রী পারাপারের কাজে পারঘাটের দিকে চলেছি।

অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী সেই কুমারী কন্যাটি ঘাটের দিকে নেমে চলে গেল। মহারাজ তার গমনপথের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কামনায় জর্জরিত হলেন।

শেষে আপন পদমর্যাদা ভুলে দূতকে না পাঠিয়ে স্বয়ং উপস্থিত হলেন দাশরাজের নিবাসে।

বিস্মিত, তটস্থ দাশরাজ, মহারাজ শান্তনুকে অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করে করজোড়ে বললেন, মহিমান্বিত সম্রাট, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি?

মহারাজ অকপটে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করে বললেন, আমি আপনার কন্যা সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী।

দাশরাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

বলার পরমুহূর্তে একটি ভাবনা তাঁর অন্তরে খেলা করে গেল। তিনি বুঝেছিলেন মহারাজ তাঁর কন্যাকে লাভ করার জন্য অত্যন্ত কাতর।

তিনি এবার সবিনয়ে বললেন, বিবাহের ব্যাপারে আমার একটি শর্ত আছে মহারাজ।

বলুন, কী শর্ত?

অগ্রমহিষীর মর্যাদা দিতে হবে আমার কন্যাকে। আর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তার গর্ভজাত পুত্রই হবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

বিষণ্ণ হলেন মহারাজ। বললেন, এ শর্ত পূরণে আমি নিরুপায়। আমার সুযোগ্য পুত্র দেবব্রত বর্তমানে সিংহাসনের অধিকার অন্য কাউকে অর্পণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দাশরাজ বললেন, তা হলে আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। এখন ভাগ্যই আমার কন্যাকে পথ দেখাক।

ভগ্ন হৃদয়ে বিষণ্ণ মনে মহারাজ শান্তনু ফিরে গেলেন প্রাসাদে। রাজকার্যে মন নেই। শয্যায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

অবশেষে বয়স্যারা জানতে পারলেন মহারাজের মনোবেদনার কারণ। এরপর কথাটি যুবরাজ দেবব্রতরও অবিদিত রইল না।

পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য দেবব্রত স্বয়ং দাশরাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। সবিনয়ে পিতার জন্য প্রার্থনা করলেন সত্যবতীকে।

দাশরাজের সেই একই শর্ত।

দেবব্রত বললেন, আপনার শর্ত আমার অবিদিত নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আমি কখনও উপবেশন করব না।

দাশরাজ ভারী সতর্ক। তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেও তুষ্ট হলেন না। বললেন, আপনার কথায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু...

আবার কিন্তু কেন দাশরাজ?

আপনি সিংহাসনের অধিকার ছাড়লেও, আপনার বংশধরেরা ছাড়বেন কেন। তখন সিংহাসন নিয়ে সৃষ্টি হবে ঘোরতর সংঘাত।

দেবব্রত উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি এখনও অবিবাহিত, প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে কখনও দারপরিগ্রহ করব না।

এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য সেদিন থেকে দেবব্রতর নাম হল ভীষ্ম।

তিনি জননীর সম্মানে মহাসমারোহে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন সত্যবতীকে। শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর মিলন-উৎসবও সম্পন্ন হল রাজকীয় মর্যাদায়।

গান্ধারী বললেন, এখন বুঝলাম মহামতি ভীষ্মের সিংহাসন গ্রহণ না করার কারণ।

ধৃতরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তিনি সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেছেন ঠিক কিন্তু তিনি আজও কুরুকুলের প্রাণপুরুষ, সমস্ত সাম্রাজ্যের চালিকাশক্তি।

গান্ধারী যোগ করলেন, তিনি নিঃস্বার্থ তাই সর্বজনবন্দিত এবং অসীম আত্মশক্তির অধিকারী।

সামান্য সময় বিরতির পর গান্ধারী জানতে চাইলেন, ঋষি দ্বৈপায়নকে পিতামহী সত্যবতী আপনার জন্মদাতা বলে পরিচয় দিলেন কেন? আমি যতদূর জানি, পরলোকগত মহারাজ বিচিত্রবীর্যই আপনার এবং দেবর পাণ্ডুর জনক।

ধৃতরাষ্ট্র অসংকোচে বললেন, যে অর্থে জন্মদাতাকে জনক বলা হয় সে অর্থে বিচিত্রবীর্য আমাদের জনক নন।

আর্যপুত্র, আপনার এই উক্তি রহস্যময়, কুহেলিকাচ্ছন্ন।

সমস্ত ঘটনাটি জানলে তুমি কুহেলিকা থেকে মুক্ত হতে পারবে প্রিয়তমা।

একটু থেমে আবার বললেন, বিরাট কোনও বংশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রাজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা নিয়োগ প্রথার বিধান দিয়ে গেছেন।

প্রথাটি কী ধরনের স্বামী?

অপুত্রক অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার বিধবা পত্নীর ক্ষেত্রে দ্বিজ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ অথবা দেবর প্রভৃতি স্বামীর ভ্রাতৃস্থানীয়দের নিয়োগ করে পুত্রোৎপাদনের বিধি আছে।

গান্ধারী বললেন, তা হলে তারা তো জন্মদাতারই পুত্র হিসেবে পরিচিত হবে।

না, তারা তাদের গর্ভধারিণীর পরলোকগত পতিরই পুত্ররূপে পিণ্ডদানের এবং সিংহাসনের অধিকারী হবে। শাস্ত্রপাঠে নিয়োগ প্রথার বহু কাহিনীই আমরা জানতে পারি।

আমি আপনাদের জন্মবৃত্তান্ত জানতে উৎসুক আর্যপুত্র।

ধৃতরাষ্ট্র তাকালেন অন্ধ দুটি আঁখি প্রসারিত করে। কালো পরদার ওপর ফুটে উঠল ছবি। তিনি সেই দৃশ্যের ঘটনাবলীকে বর্ণনা করে যেতে লাগলেন।

সবই আমার সত্যব্রতা স্নেহশীলা পিতামহীর মুখ থেকে শোনা।

মহারাজ শান্তনুর ঔরসে মহারানি সত্যবতী দুই পুত্র লাভ করেছিলেন। চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ ছিলেন দুর্ধর্ষ বলদর্পিত পুরুষ। তিনি কখনও কাউকে আপনার সদৃশ বীর বলে ভাবতে পারতেন না। তাঁর এই দর্প, ওই একই চিত্রাঙ্গদ নামের এক গন্ধর্বরাজের অহংকারে আঘাত হানল। তিনি মহারাজ শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন।

কুরুক্ষেত্র হল সেই রণভূমি। দুই বীর ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত রইলেন তিন বৎসরব্যাপী। অবশেষে গন্ধর্বরাজের হস্তে নিহত হলেন মহারাজ শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদ।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে তখন ভীষ্মই কুরু-সাম্রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। পরে কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা, অম্বালিকার সঙ্গে আমাদের পিতা মহারাজ বিচিত্রবীর্যের বিয়ে হয়।

তখন পিতৃদেব তরুণ। সাত বছর অসংযত বিবাহিত জীবন যাপনের ফলে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে অপুত্রক অবস্থাতেই কুরুরাজ বিচিত্রবীর্যের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

গান্ধারী মন্তব্য করলেন, বিচিত্রবীর্যের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে তা হলে ভরত-বংশীয়দের রক্তধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমার উক্তি আমার অন্তরকে আহত করলেও, আমি জানি ওটিই আসল সত্য।

গান্ধারী অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন আর্যপুত্র। আমি আপনাকে কোনও ভাবেই আঘাত দিতে চাইনি। যাঁকে আমি স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি, তিনি রাজকুলোদ্ভবই হোন, অথবা নামগোত্রহীন ভিক্ষাজীবীই হোন তিনি আমার হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর। একজন উচ্চকুলজাত ক্ষীণদেহী মানুষের থেকে এক শাস্ত্রজ্ঞ বলিষ্ঠ পুরুষ আমার কাছে অধিকতর কাম্য। আপনি শাস্ত্রসম্মত ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে সেই মহান ভারত-বংশের ধারারক্ষী। কিন্তু আমার কাছে সে পরিচয় মহামূল্য নয়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমার ওপর তোমার এই অসাধারণ আকর্ষণ আমাকে তৃপ্ত আর গর্বিত করেছে কল্যাণী। তবু তোমার জ্ঞাতার্থে বলি, ভারত-বংশধারাকে রক্ষার জন্য আমার পুত্রহীনা পিতামহী প্রথমে মহামতি ভীষ্মের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

কৌতূহলী গান্ধারী জানতে চাইলেন, কী রকম আর্যপুত্র?

আগেই বলেছি, মৃত স্বামীর ভ্রাতাদের দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের রীতি আছে। তাতে বংশধারা লুপ্ত হয় না।

মহাত্মা ভীষ্ম জননীকে কী উত্তর দিলেন?

বড় অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, আমি ত্রিভুবনের অধিকার, ইন্দ্রত্বপদ, এমনকী তার থেকেও আকাঙ্ক্ষিত পদ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে যে সত্যকে গ্রহণ করেছি, তাকে পরিত্যাগ করতে পারি না। যদি ধরিত্রীগন্ধ, জল রস, জ্যোতি রূপ, সমীর স্পর্শগুণ, সূর্য প্রভা, ধূমকেতু উত্তাপ আকাশ শব্দ, চন্দ্রমা হিমকিরণ, বাসব বিক্রম, ধর্মরাজ ধর্ম ত্যাগ করেন, তবু আমি আমার সত্যকে ত্যাগ করতে পারব না।

অভিভূত গান্ধারী বললেন, সর্ব দিক দিয়ে কুরুকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের উক্তিই প্রত্যাশিত।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাছে জননী সত্যবতী আহত হন সেজন্য ভীষ্ম তাঁকে কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের পরামর্শ দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিতামহী তাঁর কুমারী জীবনে ঋষি পরাশরের সঙ্গে সংযোগের ফলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্মকাহিনী বললেন।

ভীষ্ম বললেন, দ্বৈপায়ন যদি রাজি থাকেন তা হলে তিনিই প্রথম আহূত হবেন ধ্বংসের হাত থেকে কুরুকুল রক্ষার কাজে।

সেই মহাপুরুষের বীর্যেই আমাদের দুই ভ্রাতার জন্ম। দেবী অম্বিকা আমার জননী আর দেবী অম্বালিকার গর্ভে জন্ম আমার ভ্রাতা পাণ্ডুর। আমাদের আরও এক ভ্রাতা বর্তমান।

সে কী! বিস্ময়ের সুর বাজল গান্ধারীর কণ্ঠে।

তোমার মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু বিয়ের পর আমরা যখন সুসজ্জিত দুটি আসনে বসেছিলাম তখন রাজগৃহের বহু আত্মীয় আত্মীয়ারা আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ কুড়োই, অনুজরা প্রণাম জানিয়ে আমাদের শুভেচ্ছা নিয়ে যায়। ভ্রাতা পাণ্ডু আসার সময় নকিব নাম ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ভ্রাতা বিদুরের আগমনে নকিবের কণ্ঠ ছিল অনুচ্চারিত। তাই তার প্রায়-নীরব অভিবাদন আমি গ্রহণ করতে পারলেও তুমি সঠিক অনুমান করতে পারোনি।

গান্ধারী জানতে চাইলেন, দেবী অম্বিকার পুত্র আপনি, আর দেবী অম্বালিকা দেবর পাণ্ডুর জননী, তা হলে দেবর বিদুর এই দু'জনের ভেতরে কার পুত্র?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, জননী অম্বিকা কিংবা অম্বালিকা কেউ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের গর্ভধারিণী নয়।

তবে তিনি কীরূপ সম্বন্ধ বন্ধনে আপনাদের ভাই হলেন?

আমাদের একই জন্মদাতা কল্যাণী।

মহর্ষিদেব?

হ্যাঁ মহর্ষি দ্বৈপায়নই এই রাজগৃহে আমাদের তিনজনেরই জন্মদাতা।

তবে এ রাজগৃহে দেবর বিদুরের জননী কে?

ভ্রাতা বিদুর পারসব। তাই তাকে ক্ষত্তা বলা হয়।

এই শব্দগুলি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় উচ্চকুলোদ্ভব পুরুষ যদি কোনও শূদ্রা রমণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন তা হলে তাঁদের সৃষ্ট সন্তানকে পারসব বলা হয়। পারসব আর ক্ষত্তা একই অর্থ বহন করছে। ধর্মাত্মা বিদুরের জননী দাসী ছিলেন এ রাজগৃহে।

বিস্মিত গান্ধারী বলে উঠলেন, রাজরানিদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য আহূত হয়েছিলেন মহর্ষি দ্বৈপায়ন। সহসা তিনি দাসী-গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে গেলেন কেন? আর তিনি কীভাবেই বা আপনাদের ভ্রাতার পদ লাভ করলেন?

শুধু ভ্রাতার পদ নয়, আমাদেরই মতো বিদুর পাণ্ডুপুত্র বলে সর্বত্র পরিচিত হল। এবার শোনো, বিদুরের জন্মকাহিনী।

জননী সত্যবতীর আহ্বানে রাজ-অন্তঃপুরে নিশালগ্নে উপস্থিত হয়েছেন মহর্ষি দ্বৈপায়ন।

জননী সত্যবতী বধূ অম্বিকাকে সুসজ্জিত অবস্থায় রতিগৃহে পুত্র দ্বৈপায়নের জন্য প্রতীক্ষা করতে বললেন। দাসী সসম্ভ্রমে ঋষি দ্বৈপায়নকে লীলাকক্ষের পথ দেখিয়ে অন্তরালে সরে গেল। দ্বারের সম্মুখে প্রতীক্ষাকাতর রানি অম্বিকা দেখলেন কপিল বর্ণের জটাজালে আবৃত ঘোর কৃষ্ণকায়, সমুজ্জ্বল চক্ষু, পিঙ্গল শ্মশ্রু-বিশিষ্ট এক পুরুষ এগিয়ে আসছেন।

তাঁকে দেখামাত্রই শিহরিত হয়ে আঁখি বন্ধ করলেন রানি অম্বিকা। সেই আঁখিবন্ধ অবস্থায় মিলনের ফলে আমি আজ জন্মান্ধ।

এই অন্ধত্বের কথা আমার জন্মের পূর্বে মহর্ষি তাঁর জননী সত্যবতীকে জানিয়েছিলেন।

সত্যবতী এবার মহর্ষিকে বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদনের কথা বললেন। মহর্ষিও জননীর বাক্য শিরোধার্য করে দেবী অম্বালিকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

ঋষিবরকে দেখে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন রানি অম্বালিকা। তাই তিনিও জন্ম দিলেন এক পাণ্ডুবর্ণ পুত্রের, যার নাম হল পাণ্ডু।

মহর্ষির মুখে সত্যবতী অম্বালিকার পুত্রের কথা শুনে তাঁকে শেষবারের মতো অনুরোধ করলেন অম্বিকার গর্ভে আর একটি পুত্র সন্তানের জন্মদানের জন্য। মাতৃ আজ্ঞায় স্বীকৃত হলেন মহর্ষি।

আমার জননী সব শুনে কৌশলে পিতামহীর আদেশকে লঙ্ঘন করলেন।

কীভাবে?

জননী অম্বিকার স্মরণে ছিল মহর্ষির সেই বিকট মূর্তি ও তীব্র গাত্রগন্ধ। তাই তিনি নিজে না গিয়ে দাসীকে রানির পোশাকে সজ্জিত করে সেই অন্ধকার মিলনকক্ষে পাঠালেন।

দাসী কিন্তু মহর্ষিকে অন্তরের পূজার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হলেন। পরিতৃপ্ত মহর্ষি বললেন, তুমি প্রজ্ঞাবান ধর্মশীল এক পুত্র লাভ করবে। আর তুমি মুক্ত হবে দাসীত্ব থেকে।

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরও তাই মহারাজ বিচিত্রবীর্যের পুত্ররূপে স্বীকৃত। যদিও পারসব বলে এই কুরুরাজ্যে তার কোনও অধিকার নেই।

গান্ধারী বললেন, ভারত বিখ্যাত কুরুরাজ বংশের বহু অজ্ঞাত কাহিনীই আজ জানতে পারলাম আর্যপুত্র।

ব্যাসদেব একদিন এলেন রাজগৃহে। ক্লান্ত, পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ব্যাসদেব।

পরম শ্রদ্ধা আর সমাদরে গান্ধারী তাঁর শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হলেন।

বধূমাতার আন্তরিক সেবায় পরিতৃপ্ত হলেন ব্যাসদেব। প্রাসাদ ত্যাগের সময় গান্ধারী প্রণাম জানাতেই মহর্ষি বললেন, কিছু প্রার্থনা করো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে আমি তৃপ্ত হব।

গান্ধারী কোনওরূপ সংকোচ বা দ্বিধা না করেই বললেন, আশীর্বাদ করুন যেন আমি বহুপুত্রের জননী হই।

তথাস্তু, বলে মহর্ষি প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

নিশাকালে গান্ধারীকে বাহুবেষ্টনে টেনে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহর্ষির কাছে তুমি বহু পুত্র বর চাইলে কেন কল্যাণী?

কেবল মহর্ষির কাছেই নয়, পিতৃগৃহে থাকার সময় মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে আমি ওই একই বর প্রার্থনা করতাম।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহর্ষির বাক্য মিথ্যা হবার নয়।

সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার শয্যায় মহাবলশালী স্বামীর করচুম্বন করে আবেগমথিত গান্ধারী বললেন, মহাদেবই আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনার মতো পুরুষসিংহের সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারের স্বভাব-বলিষ্ঠ কন্যাটিকে নিবিড় বক্ষবন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

* * *

মহামতি ভীষ্ম তাঁর পরামর্শগৃহে ডাক পাঠালেন বিদুরকে। ভীষ্ম তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে পক্ষপাতশূন্য স্নেহযত্নে শস্ত্র আর শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানেন, তিন ভ্রাতার ভেতরে বিদুরই স্থির বুদ্ধির অধিকারী। রাজকার্য থেকে পারিবারিক প্রায় সকল বিষয়েই তিনি তাই বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করতে পছন্দ করেন।

প্রাজ্ঞ বিদুর পিতৃব্যের পরামর্শগৃহে প্রবেশ করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন করলেন।

ভীষ্ম তাঁকে পরম প্রীতিভরে উপবেশন করতে বললেন।

কোনও রকম ভূমিকা না করে ভীষ্ম বললেন, তোমার অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের সময় আমি একমাত্র তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করেছিলাম। তুমিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোনও রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হতে। তোমার যুক্তি ছিল, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে আত্মীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে। আমার মনে ধরেছিল তোমার এই দূরদৃষ্টি। তাই গান্ধার রাজ্যের সঙ্গে হস্তিনাপুরের বৈবাহিক-বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।

বিদুর বললেন, তা ছাড়া মিত্রতার পথই যে-কোনও রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করে। ক্রমাগত শত্রুতা তিলে তিলে ক্ষয় করে সাম্রাজ্যের শক্তি। ভবিষ্যৎ কোনও বিপদের কথা স্মরণ করে নিজেদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখতে হয়, কিন্তু অকারণ মদগর্ব বিনাশের কারণ হতে পারে। মৈত্রীর শক্তি শস্ত্রের শক্তি অপেক্ষা অনেক বড়।

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় অতি প্রসন্ন হলেন মহাশক্তিধর ভীষ্ম। বললেন, গান্ধার রাজকন্যা সুবলাত্মজা এরই মধ্যে হস্তিনাপুরবাসীর অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। স্বামীর জন্য তাঁর এই স্বেচ্ছা অন্ধত্ববরণে আমি অভিভূত হয়েছি।

বিদুর বললেন, তিনি ধর্মশীলা, পবিত্র ও বিচক্ষণ। প্রতিদিন তিনি মহেশ্বরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। তারপর বন্দনা করেন রাজগৃহে গুরুজনদের চরণ। অন্তঃপুরে দাসদাসীরা তাঁর ব্যবহারে অতীব তুষ্ট। তিনি তাদের ভালবাসার উত্তাপে ঘিরে রাখেন, তাই তারাও তাঁর চরণে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে ধন্য হয়।

ভীষ্ম অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, রাজগৃহের সবকিছুকেই তুমি দেখছি দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো ধরে রেখেছ।

একটু থেমে বললেন, এবার পাণ্ডুর বিবাহের আয়োজন করতে চাই। তোমার এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ আছে?

আপনি কিছু ভেবেছেন কি?

তোমার পথ অনুসরণ করে আর একটি শক্তিশালী রাজ্য বাহ্লীকের (মদ্রদেশ) রাজকন্যা রূপবতী মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দেব মনস্থ করেছি।

বিদুর বললেন, উত্তম প্রস্তাব, তবে কিছুকাল বিলম্ব করতে হবে মনে হয়।

কারণ?

মহারাজ কুন্তীভোজ নাকি কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করছেন, ভ্রাতা পাণ্ডু সংবাদ শুনে মহা উত্তেজিত।

তিন

অমারাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অন্তরীক্ষ থেকে সহস্র সহস্র চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে হীরকদ্যুতি নক্ষত্রপুঞ্জ।

অশ্ব নদীর কূল বরাবর এগিয়ে আসছে দুটি ছায়ামূর্তি। একজন সপ্তদশী যুবতি অন্যজন প্রৌঢ়া। প্রবীণা রমণীর কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু। তরুণী যুবতির কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে একটানা ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি।

কিছু পরেই শোনা গেল অশ্ব নদীর কলকল শব্দ। ওরা সেই নদীর কূলে এসে পৌঁছোল। এবার উচ্ছ্বসিত হল যুবতির ক্রন্দন।

প্রবীণা দাসী তীরে নামিয়ে রাখল একটি পেটিকা। সঙ্গে সঙ্গে যুবতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। পেটিকা থেকে তুলে নিলেন শিশুটিকে। চুম্বনে ভরে দিলেন তাকে, আঘ্রাণ নিতে লাগলেন তার কচি দেহের।

দাসী বলল, প্রভাতের বড় বেশি বিলম্ব নেই রাজকুমারী। দ্রুত আমাদের কাজ সেরে রাজগৃহে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ কুন্তীভোজ আপনার খোঁজ করলে আমরা সম্পূর্ণ বিপদে পড়ে যাব।

তরুণী জননীর বুক থেকে শিশুটিকে প্রায় ছিনিয়ে নিল দাসী। ঘুমন্ত শিশুটিকে পেটিকায় শুইয়ে দিয়ে তার ডালা বন্ধ করা হল। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে গালানো হল তাল তাল মোম। সেই মোমের প্রলেপে নিশ্ছিদ্র করা হল পেটিকা।

প্রবীণা বলল, এটিকে নদীর জলে তুমিই ভাসাও রাজকুমারী।

আমি মা হয়ে...

এবার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনধ্বনি।

রূঢ় হলেও রাজকুমারী এটি সত্য, আমি ভাসালে মায়ের মমতা দিয়ে তো ভাসাতে পারব না, তাতে জাতকের অকল্যাণ হতে পারে কিন্তু তুমি মমতাময়ী মা, তোমার ছোঁয়ায় শিশুর সব বিপদই কেটে যাবে।

রাজকন্যা কুন্তী পেটিকাটিকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় সাশ্রুনয়নে বলতে লাগলেন, বৎস, অন্তরীক্ষলোক, পৃথ্বীলোক, দেবলোক তোমার সহায় হোন। জলচর প্রাণিগণ তোমার কল্যাণ করুন। মঙ্গলযুক্ত হোক তোমার যাত্রাপথ, তোমার ওপর যেন কারও হিংসাদৃষ্টি না পড়ে। জলাধিপতি বরুণদেব ও অন্তরীক্ষপতি পবনদেব তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার জন্মদাতা পিতা জ্যোতির্ময় সূর্যদেব তোমাকে সর্বত্র সকল বিপদে অভয় দান করুন।

পিতার দেওয়া কবচ কুণ্ডল তোমারই অঙ্গে শোভা পাচ্ছে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একদিন হয়তো আমি তোমাকে ওই চিহ্ন থেকে চিনে নিতে পারব।

হে আমার দ্যুতিমান পুত্র, যে সৌভাগ্যবতী নারী তোমার মতো কুমারকে লাভ করবেন, না জানি তিনি কতই না পুণ্যবতী।

আমি জানি যৌবনে তুমি পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বিক্রমশালী হবে।

বলতে বলতে কুমারী জননী কুন্তী হাতের বন্ধন থেকে পেটিকাটিকে জলস্রোতে মুক্ত করে দিলেন।

আবেগ আকুল রাজকন্যাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল প্রবীণা দাসীটি।

আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা, গোপন পথে প্রাসাদে আপনকক্ষে প্রবেশ করলেন মহারাজ কুন্তীভোজের প্রিয়দর্শিনী কন্যা কুন্তী।

শেষরাত্রে আর নিদ্রার প্রশ্নই ছিল না, বাতায়নে দাঁড়িয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কুন্তী। প্রথম মাতৃত্বের শিহরণ তখনও তাঁর দেহমনকে আলোড়িত করছে। সঙ্গোপনে, সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে যে শিশুটি দশমাস দশদিন সংবর্ধিত হয়েছে, আজ তাকে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মধ্যে নির্মম নিষ্ঠুর ভাগ্যের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সমস্ত মাতৃহৃদয়।

ঊষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়ে এল কুন্তীর। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণ আদিত্যদেবকে দেখে প্রশান্ত হল তাঁর অশান্ত হৃদয়। কুন্তী এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন, পিতা এতক্ষণে তাঁর পুত্রের নির্বিঘ্ন যাত্রার ভার নিলেন।

সারাদিন নানা কলরবে রাজগৃহ মুখরিত। রাত্রে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তী স্বপ্ন দেখলেন।

অশ্ব নদীর জলস্রোত যেন জ্যোতির্ময় আলোর প্রবাহ। তারই ওপর ভেসে চলেছে একটি সুবর্ণনির্মিত আধার, যার মধ্যে উদ্ভাসিত একটি শিশুর অবয়ব। বীর্যবান পিতা তাঁর পুত্রকে যেন দুই দিব্যহস্তে বেষ্টন করে তাকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করে নিয়ে চলেছেন।

স্বপ্নের পট পরিবর্তিত হল।

কুন্তী দেখলেন তাঁর সেবায় পরিতুষ্ট দুর্বাসা তাঁকে বলছেন, তোমার সেবায় আমি তৃপ্ত, তোমাকে একটি বর দিয়ে যেতে চাই সুকল্যাণী।

মহর্ষির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন কুন্তী।

যে পুরুষকে তুমি অন্তর দিয়ে কামনা করবে সে তোমার আঁখিসম্পাতে শিখামুখী পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারই সঙ্গে মিলনে তুমি পাবে অনিন্দ্যসুন্দর বীর্যবান একটি সন্তান।

ঋষি তাঁকে সম্মোহন আর আকর্ষণী বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বিদায় নিলেন।

এক অসাধারণ সূর্যোদয় হল পরদিবস। রক্তারুণরাগে রঞ্জিত হল আকাশ। পরক্ষণেই সুবর্ণ জ্যোতি বিচ্ছুরণ করে পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূত হলেন দেব দিবাকর। ঠিক যেন জ্যোতির্ময় এক যুবা পুরুষ। সেদিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল, কে যেন কনক-করাঙ্গুলি ছুঁইয়ে স্পর্শ করল তাঁর কুমারী কায়াকে।

পরক্ষণেই রাজ উদ্যানের পথে এক দিব্যকান্তি পুরুষকে যেতে দেখলেন কুন্তী। একটি পুষ্পিত বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখছিলেন সেই বীর্যবান পথচারীকে।

হঠাৎ দু'জনের চোখাচোখি হল। সম্মোহনী বিদ্যা খেলা করে গেল তাঁর দৃষ্টিতে।

অনুচ্চারিত করুণ আমন্ত্রণ সে চোখে।

বীর্যবান পুরুষ সে আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। এগিয়ে এলেন রাজকন্যা কুন্তীর কাছে।

অতিথিকে নমস্কার করলেন কুন্তী। এই মুহূর্তটি ছিল কুমারী কুন্তীর কাছে সিদ্ধিলগ্ন। সফল হয়েছে তাঁর সম্মোহনী শক্তি।

দীর্ঘ আয়তনেত্রে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে কান্তিমান পুরুষের দিকে তাকালেন কুমারী কুন্তী।

স্মিতহাস্যে আপন পরিচয় দিয়ে পুরুষ বললেন, আমি সূর্য।

সম্মোহিত কুন্তী বললেন, তুমি জ্যোতির্ময় পুরুষ, তুমি আমার প্রার্থিত। যেন জন্ম-জন্মান্তর তোমার পথ চেয়ে আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম।

তোমার অভীষ্ট পূরণের জন্য আমি ধরা দিয়েছি কন্যা। তোমার সম্মোহনী দৃষ্টি, তোমার ওই মধুর হাসি আমাকে আকর্ষণ করে এখানে নিয়ে এসেছে।

সেই পুষ্পিত বৃক্ষের তলায় জ্যোতির্ময় সূর্য, চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ ও মায়াময় হয়ে দেখা দিলেন। আর সেই স্বপ্নময় জ্যোৎস্নার আলিঙ্গনে ধরা দিলেন কুন্তী।

বিদায়ের সময় সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বলে গেলেন, আমার বীর্য ব্যর্থ হওয়ার নয়, তুমি আমারই মতো কান্তিমান, বীর্যবান এক পুত্র লাভ করবে।

স্বপ্নভঙ্গে শয্যায় উঠে বসলেন কুন্তী। সমস্ত দেহমন পুলকে রোমাঞ্চিত। ঠিক সেই মুহূর্তে কুন্তীভোজের প্রাসাদ বাতায়ন থেকে সূর্যোদয় দেখলেন কুন্তী। সুবর্ণকিরণে পরিতৃপ্ত সূর্যের হাসি।

* * *

মহারাজ কুন্তীভোজ কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। সেই শুভ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। কুন্তীভোজের অপরূপ রূপ, গুণ ও লাবণ্যবতী কন্যাকে পাওয়ার জন্য দিকে দিকে প্রস্তুত হলেন রাজকুমার ও রাজন্যবর্গ।

কুন্তী কি বিস্মৃত হলেন তাঁর সূর্য-সান্নিধ্য, তাঁর নিভৃত লীলা-সঙ্গম! ভুলে গেলেন নির্জনে, একান্ত গোপনে লালিত একটি মহাদ্যুতিমান শিশুর মুখ!

সম্ভবত গোপনতা একটা আবরণে আবৃত করে মানুষের স্মৃতিকে।

কুন্তী সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হলেন তাঁর অতীতকে। সুসজ্জিত স্বয়ংবরসভায় এলেন প্রিয় সখীর হাত ধরে।

স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সারিবদ্ধভাবে বসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবর্গ। কুন্তীর রূপের খ্যাতি তখন প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। তাঁকে দেখবার জন্য চকোরের প্রতীক্ষা নিয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন তাঁরা। এখন রাজগৃহ থেকে সেই প্রার্থিতাকে মঞ্জীর-ধ্বনি তুলে সভাগৃহে আসতে দেখে কম্পন শুরু হয়ে গেল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হৃদয়ে।

কমলদলের মতো উন্মীলিত দীর্ঘ নয়ন, অচ্ছোদ-সরসীর মতো স্বচ্ছ সুগভীর নিটোল যৌবন, ধর্মশীলা পূজারিণীর মতো বিনম্র কুন্তীভোজের প্রিয়দর্শিনী কন্যা সবার উদ্দেশে নত নমস্কার নিবেদন করলেন।

বাতায়নপথে দিগন্ত দর্শনের মতো ক্ষুদ্র দুটি নয়নের তারায় একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হল প্রতীক্ষা-কাতর মুখচ্ছবিগুলি।

মধুকর যেমন প্রস্ফুটিত পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হল ঠিক তেমনই কুন্তীর দৃষ্টিও মুহূর্তে ধাবিত হল একটি পরম রূপবান পুরুষের দিকে। অলক্ষ্যে প্রজাপতি নিবিড় বন্ধনডোরে বেঁধে দিলেন দুটি হৃদয়।

মহারাজ কুন্তীভোজের কন্যার বরমাল্য লাভ করলেন হস্তিনাপুরের তরুণ নৃপতি কান্তিমান পাণ্ডু। মহাসমারোহে বর-বধূকে বরণ করল সমস্ত হস্তিনাপুরবাসী। নববধূ পাদস্পর্শ করে প্রণাম করামাত্রই গান্ধারী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আজ থেকে আমরা অভিন্ন, জীবনপথে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী।

মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ভীষ্ম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যদের সখ্যসূত্রে বেঁধে নিতে চেয়েছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী গান্ধার প্রদেশের সঙ্গে কিছু পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক। এবার মহারাজ কুন্তীভোজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতুলপুত্র যদুবংশীয় শূরও কুরুকুলের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কারণ পৃথা ছিলেন যদুবংশীয় শূরেরই কন্যা। কুন্তীভোজ অনপত্য থাকায় পৃথাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, আর তাঁর নতুন নাম হয়েছিল কুন্তীভোজের নামানুসারে কুন্তী।

এবার বাহ্লীক বা মদ্র দেশের অধিপতির সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলেন দূরদর্শী ভীষ্ম। তিনি মদ্রাধিপতি অর্তায়নের কন্যা মাদ্রীকে পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে হস্তিনাপুরে কুলবধূ করে আনতে চাইলেন।

এই উপলক্ষে স্বয়ং ভীষ্ম উপস্থিত হলেন মদ্রদেশে।

অতি শৈশবেই মাদ্রী হারিয়েছিলেন তাঁর পিতাকে। ভীষ্ম যখন বাহ্লীক দেশে যান তখন সেখানে রাজত্ব করছিলেন মাদ্রীরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শল্য।

ভীষ্মের আগমনে তিনি বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করলেন। মহাসমাদরে ভারত-বন্দিত বীরকে দান করলেন উপযুক্ত পাদ্যার্ঘ্য।

ভীষ্ম তাঁর অভিপ্রায় জানাতেই শল্য করজোড়ে বললেন, কুরুবংশীদের সঙ্গে আত্মীয়তা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষেরা বংশে একটি নিয়ম স্থাপন করে গিয়েছেন। পাত্রপক্ষকে পণ দিয়ে কন্যাকে নিয়ে যেতে হয়। আপনাকে পণদানের কথা বলতে সংকোচ বোধ করছি কিন্তু আমি নিরুপায়। কুলধর্মের জন্য বাকদানও করতে পারছি না।

ভীষ্ম মদ্ররাজের কথায় যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে কন্যাপণরূপে প্রভূত মূল্যবান রত্ন দান করলেন। এরপর মাদ্রীকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন হস্তিনায়। শুভলগ্নে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহোৎসব সুসম্পন্ন হল।

দুই ভার্যার সঙ্গে পাণ্ডু একমাসকাল অতিবাহিত করে বের হলেন দিগ্বিজয়ে। দর্শাণ, মগধ, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি দেশ জয় করে আহরণ করলেন প্রচুর ধনরত্ন। রাজধানীতে ফিরে এসে পূর্ণ করলেন রাজকোষ।

কিছুকাল যেতে না যেতেই দুই ভার্যাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন অরণ্যে।

তপস্যার জন্যে কিন্তু পাণ্ডু ভার্যাসহ অরণ্যের প্রবেশ করেননি, তিনি মৃগয়ার আনন্দেই মত্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ওই অরণ্যেই পাঠাতেন তাঁদের জন্য ভোজ্যদ্রব্য সামগ্রী, উত্তম বেশবাস।

সিংহাসনের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করছিলেন না পাণ্ডু। পুত্রোৎপাদনে তাঁর অক্ষমতার বিষয়টি ধীরে ধীরে অনুভব করছিলেন তিনি। তাই ভরা যৌবনেই এসে গেল তাঁর সংসার-বৈরাগ্য। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়ে তপস্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন দুই ভার্যার কাছে। তাঁদের তিনি ফিরে যেতে বললেন হস্তিনাপুরে।

কুন্তী বললেন, মহারাজ আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন না, বরং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করুন। আমরা তিনজনে তা হলে কামসুখ পরিত্যাগ করে একই সঙ্গে ঈশ্বরের অনুধ্যান করতে পারব।

শতশৃঙ্গ পর্বত ঋষিকুলের নিবাসস্থল, দেবগণেরও বিচরণক্ষেত্র।

পাণ্ডু সমস্ত রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে বাহকের হাতে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনাপুর রাজপুরীতে। এখন তপস্যাই হল পাণ্ডুর একান্ত আশ্রয়।

তবু চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। পুত্রলাভের জন্য আকুল হয় প্রাণ। অপুত্রক পিণ্ডলাভ করতে পারে না, নিরয়গামী হয়।

এই শঙ্কা একদিন প্রবল হল পাণ্ডুর মনে। তিনি কুন্তীকে কাছে ডেকে তাঁর এই মনোবেদনা ব্যক্ত করলেন।

কুন্তী বললেন, এ অবস্থায় কীভাবে আপনি পুত্রলাভ করতে চান?

বিষণ্ণ পাণ্ডু উত্তর করলেন, একটিমাত্র পথ খোলা আছে।

কী সে পথ আর্যপুত্র?

তুমি জানো কল্যাণী, আমরা দুই ভ্রাতা ক্ষেত্রজ পুত্র। মহারাজ বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে আমরা দু'জনে জন্মগ্রহণ করেছি। ঋষি দ্বৈপায়নই আমাদের জন্মদাতা পিতা।

কুন্তী বললেন, এ তথ্য আমার অজানা নয় স্বামী। এখন আপনার কী অভিপ্রায় তা বিশদভাবে বলুন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাণ্ডু বললেন, আমি যে সন্তানের জন্মদানে অক্ষম তা তোমরা দু'জনেই উপলব্ধি করেছ। কিন্তু তোমরা দু'জনেই যে জননীপদ লাভ করতে পারো, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই তোমরা আমার বংশরক্ষা এবং নরকগমনের পথ রুদ্ধ করার জন্য ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করো।

কুন্তী নীরব হয়ে রইলেন। তিনি জানতেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে দিয়ে কীভাবে সম্মোহনী বিদ্যার প্রভাবে প্রার্থিত পুরুষদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসা যায়।

এই বিদ্যা প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য ও পূর্ব সিদ্ধির কথা পাণ্ডুকে না জানিয়ে শুধু বললেন, আপনি এজন্য চিন্তিত হবেন না। আমার ওপর সমস্ত ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দিন। কী ধরনের সন্তান আপনি কামনা করেন?

একটি ধর্মজ্ঞ পুত্র।

কুন্তী বললেন, আপনার ইচ্ছাপূরণের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমি।

একটু থেমে আবার বললেন, আমার পিতৃগৃহে একসময় অবস্থান করছিলেন মহর্ষি দুর্বাসা। পিতার আদেশে আমি সেই কোপনস্বভাব মুনির সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতিটি আদেশ যথাসম্ভব পালনের চেষ্টা করতাম। অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটলেও আমার নিষ্ঠা বিচলিত হত না।

আমি সে সময় নবযৌবনের স্পর্শে শিহরিত এবং অন্যের দৃষ্টিতে পরম আকর্ষণীয়া ছিলাম। মহর্ষি কখনও কখনও তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমার দেহমনকে স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে যেন অবলোকন করতেন।

একদিন বললেন, তোমার ভেতর আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। তুমি ইচ্ছামাত্র দেবতা, ঋষি এবং মানবকে তোমার দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে পারো। এখনও তোমার ভেতর সে বাসনা জাগ্রত হয়নি। সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হলে তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

এই উক্তির পর ঋষিবর আমাকে পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরে পাঠ দান করলেন।

অতিথিশালা ত্যাগ করে চলে যাবার পূর্বে বললেন, যে বিদ্যার চর্চা হল তা প্রয়োগ করলে তোমার সিদ্ধি সুনিশ্চিত। যাঁকে তোমার সম্মোহনী ক্ষমতার দ্বারা কাছে আকর্ষণ করবে, তিনি তোমাকে অবশ্যই তোমার প্রার্থনা মতো একটি পুত্র দান করবেন।

দেবী কুন্তীর কথা শুনে পরম উল্লসিত হলেন অরণ্যবাসী পাণ্ডু।

চার

শতশৃঙ্গ পর্বতের উত্তরে তুষারধবল পর্বতশ্রেণি দেখা যায়। তারই সানুদেশ থেকে পশ্চিমে জনপদের দিকে এগিয়ে গেছে উচ্চাবচ অরণ্য-আচ্ছাদিত পর্বতমালা।

শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে ওই অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে জনপদবাসীদের মাঝে মাঝে বিচরণ করতে দেখা যায়। অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণ থেকে পশুশিকার পর্যন্ত সমস্ত কর্মই করে থাকে জনপদবাসীরা।

একটি অপরিসর গিরি তরঙ্গিণী শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে এই অরণ্যভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

কোনও কোনও দিন আপনমনে বিচরণ করতে করতে নদীতীর পর্যন্ত পৌঁছে যান কুন্তী। সে সময় স্বামীসেবায় নিযুক্ত থাকেন মাদ্রী।

কুন্তী উপভোগ করেন এই দ্বিপ্রহরের নিঃসঙ্গতা। কুটির থেকে কুন্তী দেখতে পান মধ্যাহ্ন স্নানের জন্যে ঋষিরা চলেছেন নদী লক্ষ করে। তিনি তাঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁদের অবয়বের মধ্যে তিনি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন কোনও একজন ধর্মজ্ঞ পুরুষকে। যাঁর মুখমণ্ডলে এক দিবজ্যোতির আভা থাকবে। কিন্তু সারিবদ্ধ ঋষিদের পর্যবেক্ষণের শেষে হতাশায় ভরে যায় তাঁর অন্তর। তিনি কোনও একজন ঋষিকেও তাঁর প্রার্থিত যোগ্য পুরুষ বলে মনে করতে পারেন না। যদিও ঋষি, ঋষিপত্নীদের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

কয়েকদিন এমনই বৃথা অন্বেষণের পরে কুন্তী একদিন দ্বিপ্রহরে চলে গেলেন নদীতীরে। তিনি এই প্রথম লক্ষ করলেন দুটি বৃক্ষের আড়ালে নদী-পারাপারের একটি কাষ্ঠনির্মিত সেতু। মনে হল শতশৃঙ্গ পর্বতে ঋষিদের দর্শনের জন্য জনপদবাসীরা ওই সেতুটি ব্যবহার করে।

দ্বিপ্রহরের অখণ্ড নির্জনতা, সুদূর দিগন্তে মিশে যাওয়া নীল আকাশ তাঁকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। কুন্তী অনুভব করলেন, নদীপারে অদূর বনস্থলীর এক মায়াময় হাতছানি। ভোজরাজকন্যা এড়াতে পারলেন না সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

বৃক্ষের কাণ্ডনির্মিত সেতুটি পার হয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এতদিনের অনাবিষ্কৃত অরণ্যভূমিতে। যদিও আকাশে দীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য, তবুও অরণ্যভূমির অভ্যন্তরে আলোছায়ার এক আশ্চর্য মায়াময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

কুন্তী মন্ত্রমুগ্ধের মতো পুষ্পিত বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করে বেড়াতে লাগলেন। স্বপ্নের পরিমণ্ডলে তখন তিনি বন্দি। কতক্ষণ এইভাবে তিনি অরণ্যলোকে বিচরণ করছিলেন তা তাঁর চেতনার মধ্যে ছিল না। সহসা কোনও পশুর পদশব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন।

অদূরে দেখলেন একটি হরিণ বনের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পার হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনান্তরের অভিমুখে চলে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই দেখলেন বন চিরে বেরিয়ে এল এক ব্যাধ। প্রায়-নগ্ন অতি সুগঠিত দেহ। কেশপাশে একটি রক্তপালক গোঁজা। হাতে ধনুঃশর, শিকার সন্ধানে উদ্যত।

পলাতক হরিণ হঠাৎ একটি পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

কুন্তী লক্ষ করলেন, ব্যাধ দ্রুতবেগে হরিণের সমীপবর্তী হচ্ছে। ব্যাধও প্রায় হরিণের কাছাকাছি গিয়ে থমকে থেমে গেল। শিথিল হয়ে গেল তার হাতে ধরা উদ্যত ধনু।

কুন্তী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি হরিণ শিশু আর তাকে লেহন করছে মা-হরিণীটি। সে তখন ভুলে গেছে তার প্রাণের মায়া। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে ছেড়ে যেতে পারল না তার শাবকটিকে।

আরও আশ্চর্য হলেন কুন্তী, নিজের নাগালের মধ্যে শিকারটি পেয়েও স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যাধ। শাবকটিকে নিয়ে হরিণী একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরে গেল শিকারি।

কুন্তী দেখলেন, বনান্তরাল থেকে একঝলক আলো এসে পড়ল শিকারির সুঠাম লাবণ্যময় দেহের ওপর। মুগ্ধ হলেন কুন্তী। একজন হত্যাকারী ব্যাধের মুখে করুণার ছবি ফুটে উঠতে দেখে কুন্তী যথার্থ এক ধার্মিকের সন্ধান পেলেন।

সেদিন ব্যাধ চলে গেল কিন্তু কুন্তীর হৃদয় থেকে সে মুছে গেল না। কুন্তী মোহগ্রস্তের মতো সেই অরণ্যভূমিতে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আসতে লাগলেন।

সপ্তদিবস এমনই বিচরণের পর আবার তাঁর লক্ষের মধ্যে এল সেই ধার্মিক ব্যাধ।

সেদিনও পূর্বের মতো একটি ঘটনা কুন্তীর দৃষ্টির সামনে অভিনীত হল।

তিনি দেখলেন, ব্যাধের চক্ষু স্থির হয়ে আছে আকাশের দিকে, উর্ধ্বে উদ্যত তার শর।

কুন্তীর দৃষ্টিও নিবদ্ধ হল আকাশে। তিনি দেখলেন, ভীত সন্ত্রস্ত একটি কপোত গগনপথে উড়ে আসছে। তারই দিকে লক্ষ স্থির করে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাধ। তার সীমার মধ্যে এলেই শরসন্ধান করবে।

এ কী! আবার ব্যাধ নামিয়ে নিল তার হাতের ধনুক, দৃষ্টি কিন্তু এখনও তার উর্ধ্বমুখী।

ব্যাধের দৃষ্টি অনুসরণ করে কুন্তী দেখলেন, একটি বাজ কপোতকে তাড়া করেছে। দেখতে দেখতে ভীষণ চঞ্চু আর নখরযুক্ত বেগবান বাজ ভীরু কপোতটিকে গ্রাস করল। সে তাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল একটি সুউচ্চ বৃক্ষের শাখায়।

সেদিনও সেই ধর্মাত্মা ব্যাধ ফিরে আসছিল, সহসা কুন্তীর সঙ্গে হয়ে গেল তার দৃষ্টি-বিনিময়।

বিস্মিত কুন্তী বললেন, আপনি শিকারকে শরবিদ্ধ না করে ফিরে এলেন কেন?

ব্যাধ কুন্তীকে নমস্কার নিবেদন করে বলল, আমার অনুমান, আপনি এই বনের দেবী।

কুন্তী বললেন, সঠিক নয় আপনার অনুমান, আমি সামান্য নারী। অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

ব্যাধ বলল, ওই কপোত আমার নয়, পূর্বেই ও অন্য এক শিকারির লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

কে সে?

বৃক্ষশীর্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ব্যাধ বলল, ওই বাজপক্ষীটি। ক্ষমতা থাকলেও অন্যের ভোগ্যবস্তুকে কেড়ে নেবার কোনও অধিকার কারও নেই।

কুন্তী দ্বিতীয়বার দর্শনেও অভিভূত হলেন ব্যাধের আচরণে।

এদিন বিদায় নেবার সময় নতজানু হয়ে কুন্তী ব্যাধের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।

সংকুচিত ব্যাধ করজোড়ে বলল, আমাকে অপরাধী করবেন না সুভদ্রে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি সম্ভ্রান্ত কুলবধূ। এভাবে প্রণত হয়ে একজন অন্ত্যজ ব্যাধের অপরাধকে আপনি আর বাড়াবেন না।

কুন্তী বললেন, যে মানুষ ধর্মে স্থিত তিনি সামাজিক দৃষ্টিতে অন্ত্যজ হলেও দ্বিজোত্তম। আপনার ধর্মবোধ, আপনাকে আপনার জন্মকর্ম সংস্কার এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অনুশাসনের উর্ধ্বে নিয়ে গেছে, তাই আপনি আমার নমস্য।

ব্যাধ বলল, আপনার চিন্তা পরিচ্ছন্ন, আপনার বুদ্ধি মুক্ত, আচরণ শুদ্ধ। আপনি আমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে যে সম্মান দেখালেন, বলুন, তার প্রতিদানস্বরূপ আমি আপনার কীরূপে সেবা করতে পারি?

তখন শেষ অপরাহ্নের রাঙা আভা এসে পড়েছে কুন্তীর সুডৌল মুখমণ্ডলে। লজ্জায়, সংকোচে, প্রত্যাশায় সে এক অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি।

সেই মুহূর্তে কুন্তীর শ্রবণে দূরাগত ধ্বনির মতো ভেসে এল একটি কাতর অনুনয়, তুমি আমার নরকগমনের পথ রুদ্ধ করে দাও। আমার জন্য এনে দাও ধর্মজ্ঞ, ক্ষেত্রজ এক পুত্র।

* * *

বৎসরান্তে পাণ্ডু পরম পরিতৃপ্ত হলেন পুত্রমুখ দর্শনে।

স্বল্পকাল পরেই তাঁর মনে হল, আমি ধর্মজ্ঞ পুত্রলাভ করে ধন্য হয়েছি। এখন প্রয়োজন পরম বিক্রমশালী এক পুত্রের, যে আমার বংশকে সমস্ত আপদ, উপপ্লব থেকে রক্ষা করবে।

অন্তরের বাসনা পাণ্ডু এবারও জানালেন কুন্তীকে।

কুন্তী স্বামীর প্রার্থনায় কোনও রকম প্রতিবাদ করলেন না, তাতেই বোঝা গেল তাঁর নীরব সম্মতি।

মুখে আরও বললেন, আপনার অভিলাষিত পুত্রের জন্য আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব স্বামী।

আবার সেই বিচরণ, সেই সন্ধান।

একদিন প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল সমস্ত চরাচর জুড়ে। প্রবল ঝটিকাপ্রবাহে শাখামূলসহ উৎপাটিত হতে লাগল অরণ্যের বৃক্ষরাজি। আকাশপথে বায়ুতাড়িত হয়ে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে যেতে লাগল ছিন্নপত্রের মতো।

অরণ্যভ্রমণে এসে কুন্তী সেই ঝটিকার মধ্যে পড়ে গেলেন। কোনও রকমে একটি বৃক্ষের আশ্রয়ে সেই ঝড়ের তাণ্ডব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

যখন দেখলেন ওই বলিষ্ঠ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ছিন্নভিন্ন ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি নিজেকে বড় অসহায় বোধ করলেন। বায়ুতে বস্ত্র, কেশপাশ সংবৃত রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল।

ধূলিঝড়ের মধ্যে যখন কুন্তী নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পরম ত্রাতার ভূমিকায় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বিশালদেহী বীর্যবান পুরুষ।

প্রায় ভূলুণ্ঠিত কুন্তীকে তিনি দুই বাহুতে তুলে ধরে বললেন, নির্ভয়ে থাকো। বলো, কোন আশ্রয়ে তোমাকে পৌঁছে দেব?

কুন্তী কম্পিত কণ্ঠে বললেন, অদূরে শতশৃঙ্গ পর্বতে আমার নিবাস। এই অরণ্যভূমিতে এসে আজ আমি বড় বিপর্যয়ের মাঝখানে পড়েছি। সামনের মুক্ত প্রান্তর পেরিয়ে আমাকে যেতে হবে ওই পর্বতের আশ্রয়ে, যা একেবারেই দুঃসাধ্য।

এই প্রবল ঝড় মনে হল সেই পুরুষের মধ্যে কোনওরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন, তুমি নির্ভয়ে আমাকে অবলম্বন করো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব তোমার আশ্রয়ে।

সেই বলিষ্ঠ পুরুষ দুই বাহুতে শূন্যে তুলে নিলেন কুন্তীকে। একটি ভীরু পক্ষিণীর মতো কুন্তী সেই বলশালী পুরুষের বক্ষলগ্না হয়ে রইলেন।

ঝটিকার প্রবল প্রবাহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনায়াসে সেই পুরুষ অতিক্রম করলেন মুক্ত প্রান্তর।

আশ্রয়ে পৌঁছে কুন্তী বললেন, আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার কুটিরে পদার্পণ করবেন?

তোমার আহ্বানে আমি প্রীত কিন্তু একটি বিশেষ স্থানে আজ আমাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে, তাই পারলাম না তোমার এই আহ্বানে সাড়া দিতে।

কুন্তী করজোড়ে বললেন, প্রতিদিন অপরাহ্ণে আমি নদী পার হয়ে ওই বনস্থলীতে পরিভ্রমণ করি। আজ তিথি দ্বাদশী, আগত পূর্ণিমা তিথিতে আমি কি ওই বনভূমিতে আপনার সাক্ষাৎ পেতে পারি?

ক্ষণকাল নীরব থেকে অপরিচিত পুরুষ বললেন, সেদিন সন্ধ্যালগ্নে আমার সাক্ষাৎ তুমি অবশ্যই পাবে সুকল্যাণী।

তিনটি সন্ধ্যালগ্ন অতিক্রম করে শুভ পূর্ণিমা তিথিতে নির্দিষ্ট সেই অরণ্যে প্রবেশ করলেন কুন্তী।

একসময় তাঁর প্রতীক্ষার পথ বেয়ে এলেন সেই পুরুষ।

আবরণহীন ঊর্ধ্ব অঙ্গে জ্যোৎস্না যেন জড়িয়ে দিল একখানি উত্তরীয়। সেদিন জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকে দু'জনে দেখলেন দু'জনকে। সেই সন্ধ্যা, সেই বনস্থলী, সেই চন্দ্রালোক রূপমুগ্ধ দুই নারীপুরুষের মিলনের আকাঙ্ক্ষিত এক আবহ সৃষ্টি করল।

* * *

প্রথম পুত্রের জন্মের এক বছর পরে কুন্তীর কোলে এল অত্যন্ত শক্তিমান, সুপুষ্ট এক শিশু।

পুত্রমুখ দর্শন করে আত্মহারা হলেন পাণ্ডু।

প্রথম জাতকের নামকরণ করা হয়েছিল যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয় জাতকের নাম রাখা হল ভীমসেন।

এমনি করে বাড়তে লাগল পাণ্ডুর পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা।

এক আশ্চর্য মানসিকতা তখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল পাণ্ডুর শুভচেতনাকে।

প্রথম যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাণ্ডু ক্ষেত্রজ পুত্র কামনা করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। পিতৃপুরুষকে উদকদান, আর মৃত পিতাকে পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধারের জন্য পুত্রের প্রয়োজন হয় যা মিটে গিয়েছিল একটি ক্ষেত্রজ পুত্রের আগমনে। তার পরেও পুত্র-বাসনা!

বলবান এক পুত্র চাই।

তাও পূর্ণ করলেন কুন্তী।

কিন্তু তার পরেও প্রদীপ্ত হল পাণ্ডুর পুত্র-কামনা। ইন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান অমিত বিক্রম এক পুত্র চাই।

বারবার এই কামনার ভেতর দিয়ে পাণ্ডুর অবদমিত, অক্ষম দেহবাসনারই বিকৃত প্রকাশ দেখা দিতে লাগল। পরপুরুষের দ্বারা আপন স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার!

তৃতীয়বারও স্বামীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সচেষ্ট হলেন কুন্তী।

কিন্তু প্রবল খরায় সে বছর শস্যহানি ঘটল। দগ্ধ হয়ে গেল পায়ের তলার সবুজ, শ্যামল শষ্পগুচ্ছ। তৃণভোজী গৃহপালিত পশুরা মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগল। প্রায় শুকিয়ে গেল একমাত্র স্রোতস্বিনীর স্রোতধারা। অতিকষ্টে ঋষিপত্নীরা সেই ক্ষীণ ধারা থেকে সঞ্চয় করতে লাগলেন জীবন ধারণের মতো সামান্য পানীয়। অতৃপ্ত থেকে গেল অবগাহন স্নানের প্রবল বাসনা। তৃপ্ত থাকতে হল তপ্ত দেহে সামান্য জলসিঞ্চনেই।

সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে মেঘ-সঞ্চার হল, কিন্তু প্রবল বায়ুতে পাখা মেলে যেন উড়ে যেতে লাগল গগনবিহারী বিপুল বিহঙ্গের দল।

স্বামীর পরিচর্যায় নিযুক্ত মাদ্রী। অরণ্যের কন্দ-মূল-ফল আহরণে নিযুক্ত রইলেন কুন্তী। বহু শ্রমে পানীয় জলের সংগ্রহও করতে হত তাঁকে।

একদিন বুম্ বুম্ বুম্, দূরাগত ভয়ংকর ধ্বনিতে শব্দিত হতে লাগল শতশৃঙ্গ পর্বত।

সচকিত হলেন ঋষিকুল। ভোরের নিদ্রা ভেঙে শয্যায় উঠে বসলেন সস্ত্রীক পাণ্ডু।

মাদ্রী প্রশ্ন করলেন, কীসের শব্দ আর্যপুত্র!

উত্তর শোনার জন্য কান পেতে রইলেন কুন্তী। তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

পাণ্ডু বললেন, আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আকাশে উষার আবির্ভাব হচ্ছে। বাতায়নপথে যতদূর দেখা যায় মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। তবে বজ্রগর্ভ মেঘের ধ্বনি আসে কোথা থেকে!

কুন্তী বললেন, চলুন, ঋষিদের সমীপে যাই, তাঁরা পুরুষানুক্রমে এই পর্বতে বসবাস করছেন। তাঁদের পক্ষে এই শব্দের কারণ জানা অসম্ভব নয়।

মাদ্রী বললেন, প্রতিদিনের মতো আজও আমরা ঋষিদের প্রণাম জানাতে যাব, তখনই সব কিছু জানা যাবে।

যথাকালে কুটির থেকে ঋষিদের আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন তিনজন।

তাঁরা আশ্রমে পৌঁছে দেখলেন, দূরে তুষারপর্বতের দিকে তাকিয়ে আছেন ঋষিকুল। ক্ষণবিরতির পরেই নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে সেই শব্দ।

ঋষিদের মাঝখানে পরিচ্ছন্ন, মসৃণ এক শিলাসনে বসে আছেন শতবর্ষ অতিক্রান্ত ঋষি দিবদাস।

পাণ্ডু সস্ত্রীক আভুমি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করলেন ঋষিদের উদ্দেশে।

এবার কৌতূহলী হয়ে পাণ্ডু জানতে চাইলেন, কোথা থেকে আসছে এই কর্ণবিদারী ভয়ংকর শব্দ?

ঋষি দিবদাস ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এইমাত্র ঋষিকুলের কাছে এই শব্দের উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছি, তারই পুনরুক্তি করছি এখন।

আমায় শৈশবে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমি সে সময়কার প্রবীণ ঋষিদের মুখ থেকে জেনেছিলাম, এই শব্দ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রধ্বনি।

আবার প্রশ্ন করলেন পাণ্ডু, এর কারণ?

ওই যে অদূরে তুষারপর্বত দাঁড়িয়ে আছে, তারই কোলে দেবলোক। ওখানকার রাজা ইন্দ্র। নিজের কাজের বাধাগুলি দূর করবার জন্য তিনি কখনও কখনও বজ্রনিক্ষেপ করেন, তার ফলে সৃষ্টি হয় এই মহাশব্দ।

পরপর তিন দিবস এই প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হল চরাচর। চতুর্থ দিবসে প্রভাত থেকেই প্রশান্তি। নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল ধরিত্রী আর নভোমণ্ডলে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও দ্বিপ্রহরে কন্দমূলের সন্ধানে কুন্তী বেরিয়েছিলেন নদীপারের অরণ্য অভিমুখে।

শতশৃঙ্গ পর্বত সানুদেশের অরণ্যটি ছিল ঋষিদের জন্য সংরক্ষিত। তাই ভ্রমক্রমেও সেই বনভূমিতে প্রবেশ করতেন না পাণ্ডু কিংবা কুন্তী। নদী তীরে শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণী আর গগনচারী পক্ষীদের শরবিদ্ধ করে আনতেন পাণ্ডু। আর দূর অরণ্য থেকে কুন্তী সংগ্রহ করে আনতেন ফলমূলাদি।

তিন দিবস শব্দের জন্য কুন্তী একাকী অরণ্যে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। তাই শব্দ থামতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন অরণ্যে আহার সন্ধানে।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন নদীতীরে পৌঁছে।

বিশুষ্ক নদী জলভারে পূর্ণ। নগর নটিনীর মতো লীলাভরে চলেছে কুলুকুলু রুনুঝুনু মঞ্জীর ঝংকারে।

আনন্দে আত্মহারা কুন্তী একবার ভাবলেন কুটিরে ফিরে গিয়ে মাদ্রী আর পাণ্ডুকে আনন্দ-সংবাদটা দিয়ে আসবেন। কিন্তু কয়েকদিন প্রায় অস্নাত অবস্থায় কাটিয়ে এখন পূর্ণ সলিলে অবগাহন স্নান না করে ফিরে যেতে প্রাণ চাইল না। তিনি প্রথমে সেতু পার হয়ে এগিয়ে গেলেন বনভূমির দিকে।

কিছু সময় সন্ধানের পর ফলে ফুলে পূর্ণ হল সঙ্গে নিয়ে আসা ঝুড়িটি। এখানে অরণ্যকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে নদী বয়ে গেছে। কুন্তী বনপথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অরণ্য-সংলগ্ন নদীকূলে এসে পৌঁছোলেন। এখন সমস্ত দেহ যেন জলপান করতে চাইছে।

কুন্তী করধৃত ঝুড়িটি নামিয়ে রাখলেন নদীতীরে। এবার বস্ত্রাবৃত শরীরেই নেমে গেলেন প্রবহমান নদীর স্নিগ্ধ শীতল সলিলে।

আপন মনে বহুক্ষণ জলকেলি করলেন কুন্তী। জ্যোতির্ময় সূর্য তাঁর কিরণ-করাঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করলেন প্রিয়তমার কমলানন।

স্নান সমাপন করে সিক্ত বসনে কূলে উঠলেন বিশ্ব বিমোহিনী কুন্তী। সেই মুহূর্তে দেহে লিপ্ত সূক্ষ্ম অঙ্গাবরণীটি যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। একটি শুভ্র সুন্দর প্রস্তর প্রতিমার মতো দাঁড়িয়েছিলেন কুন্তী লীলাভরে বয়ে যাওয়া তটিনীর দিকে তাকিয়ে। তাঁর সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে যাচ্ছিল অপরাহ্ণ সূর্যের স্বর্ণরশ্মিলেখা।

সহসা অরণ্যের অন্তরালে পদশব্দ শুনে সচকিত হলেন কুন্তী।

অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, অনিন্দ্যসুন্দর এক পুরুষ মুগ্ধচোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন।

কুন্তী ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ ভঙ্গিমায় নতজানু হলেন। করজোড়ে আবৃত করলেন মানস সরসীর প্রস্ফুটিত দুটি লীলাকমল। পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, এতদিন পরে নদীধারাজলে স্নান সমাপন করে তৃপ্ত তো বরবর্ণিনী?

মুখে কোনও কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না কুন্তী, শিরসঞ্চালনে জানিয়ে দিলেন তাঁর পরম পরিতৃপ্তির কথা।

তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন! কে এই অলৌকিক দ্যুতিসম্পন্ন পুরুষ!

আবার শোনা গেল সেই দিব্য পুরুষের কণ্ঠস্বর, কোন কুল উজ্জ্বল করে তুমি বিরাজ করছ বিমোহিনী? কোন ভাগ্যবান পুরুষ তোমাকে লাভ করে দেবরাজ ইন্দ্রের ঈর্ষার পাত্র হয়েছেন?

জগৎ বিখ্যাত কুরুকুলের প্রদীপ, ইদানীং শতশৃঙ্গ পর্বতবাসী গৃহীসন্ন্যাসী পাণ্ডু আমার ভর্তা।

পুরুষের কণ্ঠে বিস্ময়, মহর্ষি কশ্যপের পুত্র ইন্দ্রাদি দেবকুল। তাঁর অন্যতম পুত্র বিবস্বান। এই বিবস্বান থেকে জন্ম নিয়েছেন বৈবস্বত মনু। তাঁর সৃষ্ট বংশধারায় মহারাজ কুরুর আবির্ভাব। সেই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাপরাক্রমী, সত্যধর্মে স্থিত মহাত্মা ভীষ্ম।

এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন কুন্তী। বললেন, আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার মুখ থেকে কুরুকুলের আদি পুরুষের কথা শুনে। কে আপনি সর্বজ্ঞ পুরুষ? বড় বাসনা জাগছে আপনার পরিচয়টি জানার জন্য।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল পুরুষের মুখে। বললেন, তিন দিবসব্যাপী কোনও শব্দ কি তোমার শ্রবণকে পীড়িত করেছে সুন্দরী?

কুন্তী বললেন, শতশৃঙ্গ পর্বতবাসী ঋষিকুলই কেবল নয়, মৃগ পক্ষী পর্যন্ত তটস্থ ছিল সেই শব্দে।

আমি জানতাম, বজ্রের শব্দ দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করবে, কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে আমাকে সঙ্গী দেবকুলসহ তিন দিবসরজনী ক্রমাগত বজ্র নিক্ষেপ করতে হয়েছে।

বুদ্ধিমতী কুন্তী অনুমানে বুঝে নিলেন, ইনিই দেবসমাজের অধীশ্বর বজ্রধারী ইন্দ্র। চিন্তামাত্র রোমাঞ্চিত হল সারা দেহ। যাঁকে মনে প্রাণে কামনা করছেন নিশিদিন, তিনিই স্বয়ং ধরা দিয়েছেন আজ।

কুন্তী নিজের উত্তেজনাটুকু দমন করে জানতে চাইলেন, কী কারণে আপনাকে বজ্র নিক্ষেপ করতে হয়েছিল দেবরাজ?

তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমার সামান্য একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করো।

কুন্তী প্রশ্নটি শোনার জন্যে দেবরাজের মুখের দিকে তাকালেন।

আমি যে দেবলোকনিবাসী ইন্দ্র সেকথা তুমি জানলে কী করে?

কুন্তী এবার বললেন, দেবতাদের নিয়ে আপনি তিন দিবস বজ্র নিক্ষেপ করেছেন। বজ্রধারী ইন্দ্র ছাড়া এ কাজ অন্য কার পক্ষেই বা সম্ভব! তা ছাড়া...।

ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন, তা ছাড়া কী?

আপনার দিব্যকান্তিই আমার এই অনুমানের কারণ।

ইন্দ্র সাগ্রহে বললেন, তোমার অনুমান সঠিক সুন্দরী। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে যাবে শুষ্ক নদীর বুকে ওই জলপ্রবাহ দেখে।

বিস্ময়মাখা কৌতূহল নিয়ে কুন্তী বলল, কোথায় ছিল এত জলের সঞ্চয়।

ওই যে তুষারপর্বত দেখছ, তারই কোলে আমাদের দেবলোক। তুষারনির্গত জলধারা সারা বছর বন্দি থাকে সুউচ্চ পাহাড়ঘেরা সরোবরে। বজ্রনিক্ষেপে ওই পাহাড়ের বিশেষ একটি অংশ বিদীর্ণ করে সরোবরের সঞ্চিত জলকে মুক্ত করে দিয়েছি, যার ফলে সঞ্জীবিত হয়েছে বিশুষ্ক নদী।

সরোবরের জল ফুরিয়ে গেলে তখন কোন উৎস থেকে নদী তার জলের জোগান পাবে?

এখানে বরফগলা জলের তিনটি সরোবর আছে। বরফ থেকে ঝরে-পড়া অনিঃশেষ ধারায় প্রায় সারাক্ষণ পূর্ণ থাকে ওই সরোবর। তার থেকে সারা বছর জলের ধারা বইবে এই নদীর বুকে। তাই বজ্রনিক্ষেপ করে একটি বিশেষ জায়গায় ছিদ্র করে দেওয়া হল।

কুন্তী এবার উঠে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে নেমে গেলেন। অঞ্জলি পূর্ণ করে নিয়ে এলেন জল। সেই জল নিবেদন করলেন ওই দিব্যপুরুষের চরণে। পরক্ষণেই পাশে রাখা ফল-পুষ্পাধার থেকে কিছু অরণ্য-কুসুম তুলে নিয়ে ইন্দ্রের চরণে অর্ঘ্য দিতে গেলেন কুন্তী।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই করে ধারণ করলেন কুন্তীর কুসুমপূর্ণ দুটি কোমল কর।

মুখে বললেন, এর স্থান চরণে নয়, আমার বক্ষে।

সমস্ত দেহ কম্পিত হল কুন্তীর। অসাধারণ আয়ত দুটি মায়াময় নেত্র স্থির হয়ে রইল রমণীমোহন ইন্দ্রের মুখের ওপর।

* * *

(ইন্দ্রের ন্যায় অমিতবিক্রম পুত্রলাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন পাণ্ডু। পুত্রের নাম রাখা হল অর্জুন) অন্যদিকে কুন্তীর সৌভাগ্যলাভে অন্তরে বেদনাবোধ করতে লাগলেন মাদ্রী।

তিনি স্বামীর কাছে একান্তে গিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, আমরা দু'জনেই আপনার কাছে তুল্যমূল্য। কিন্তু তিনপুত্রের জননী হয়েছে কুন্তী. আমি এখনও পুত্রহীনা, আর কখনও পুত্রলাভের

সম্ভাবনাও নেই। আপনার অনুরোধে কুন্তী যদি আমাকে সাহায্য করেন তা হলে আমিও ক্ষেত্রজ পুত্র লাভে কৃতার্থ হই।

পাণ্ডু মাদ্রীর পুত্র লাভের জন্যে কুন্তীকে অনুরোধ জানালেন।

কুন্তী সম্মতি প্রকাশ করে মাদ্রীকে শিখিয়ে দিলেন পুরুষ আকর্ষণের মোহসঞ্চারী বিদ্যা।

মাদ্রীও কুন্তীর ন্যায় অরণ্যভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন।

একদিন তিনি দেখতে পেলেন দুই দিব্যপুরুষকে, মনে হল তাঁরা যমজ। অরণ্যের লতাগুল্ম সংগ্রহের কাজে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের দৃষ্টি পড়ল পরম কান্তিময়ী রূপসি এক নারীর দিকে। নারীর মুখে বিশ্ববিমোহিনী হাসি, দৃষ্টিতে সকরুণ আমন্ত্রণ।

তাঁদের একজন এগিয়ে এসে বললেন, কে তুমি কন্যা? একাকিনী অরণ্যে বিচরণ করছ?

মাদ্রী তাঁর পরিচয় দিলেন। এবার তিনি নিজেও জানতে চাইলেন, যমজ কুমারদ্বয়ের পরিচয়।

ওঁদের ভেতর একজন বললেন, আমরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভেষজ সংগ্রহের কাজে এই অরণ্যে বিচরণ করছি।

মাদ্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না, আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলে উঠলেন, অবশ্যই, অবশ্যই, তুমি অসংকোচে আমাদের কাছে যে-কোনও প্রশ্ন করতে পারো।

মুখে মধুর সলাজ হাসিটি ফুটিয়ে মাদ্রী বললেন, আমি পুত্রার্থিনী। কিন্তু আমার স্বামী পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। আপনাদের ভেষজ পান করে আমি কি পুত্রবতী হতে পারি?

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন, এতাবৎ এ ধরনের কোনও ভেষজ আবিষ্কৃত হয়নি।

মাদ্রী আক্ষেপ করে বললেন, তা হলে আমার সকল আশাই অপূর্ণ থেকে গেল।

মাদ্রীর বাক্যে এমন একটি খেদের সুর ধ্বনিত হল, যা বিচলিত করল দেববৈদ্যদের। তাঁরা প্রার্থিনীর অভিলাষ বুঝে অবশেষে পূর্ণ করলেন তাঁর মনস্কাম।

বৎসরান্তে মাদ্রী লাভ করলেন অতিসুদর্শন প্রাণোচ্ছল যমজ সন্তান।

এঁদের নাম রাখা হল নকুল ও সহদেব।

পঞ্চপুত্র নিয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন পাণ্ডু।

ষড়রিপুর মধ্যে প্রথম রিপুটিই হল প্রবলতম। সেই রিপুর তাড়নায় পাণ্ডু এক বসন্তের প্রস্ফুটিত সমারোহে নির্জন বনস্থলীতে বক্ষলগ্ন করলেন মনমোহিনী মাদ্রীকে।

তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মাদ্রীকে মুক্তি দিলেন না পাণ্ডু। তাঁর প্রবল উত্তেজনাই মহাকাল হয়ে তাঁকে গ্রাস করল। গভীর বেদনায় স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলেন মাদ্রী।

* * *

হস্তিনাপুরের রাজসভায় বসে ছিলেন মহামতি ভীষ্ম। সিংহাসনে উপবিষ্ট অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর পার্শ্বে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা বিদুর। অন্যান্য সভাসদেরা যথাযোগ্য আসনে সমাসীন।

সভা শুরুর মুহূর্তে দৌবারিক সভায় প্রবেশ করে নত নমস্কার নিবেদন করল।

বিদুর বললেন, কী সংবাদ দৌবারিক?

অন্ধরাজা উৎকর্ণ হলেন।

কুরুপ্রবীণ ভীষ্ম ও সমবেত সভাসদদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দৌবারিকের ওপর।

দৌবারিক বলল, ধরিত্রীপতি, মহাবিক্রমশীল রাজাধিরাজের কাছে নিবেদন এই যে, শতশৃঙ্গ পর্বতবাসী ঋষিকুল প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছে শবাধারে শায়িত দুটি মৃতদেহ।

উদ্বিগ্ন বিদুর জানতে চাইলেন, কার মৃতদেহ?

মহাধনুর্ধর পাণ্ডু ও তাঁর দ্বিতীয়া সহধর্মিণীর।

সভাগৃহমধ্যে সহসা উত্থিত হল এক আর্ত কোলাহল। বুকে করাঘাত করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হায় ভ্রাতা, হায় ভ্রাতা, বলে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল বিদুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এবার তাঁর প্রশ্ন, ঋষিদের সঙ্গে ওই শবাধার ছাড়া রাজগৃহের অন্য কেউ এসেছেন কি?

জননী কুন্তী তাঁর তিন সন্তান ও দেবী মাদ্রীর দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সভাসদদের বললেন, আগে ঋষিকুলকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে আসি চলুন। তাঁদের পাদ্য অর্ঘ্যদানের পর ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।

ভীষ্মকে অগ্রবর্তী করে সভাসদেরা প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হলেন। পার্শ্ববর্তী অতিথিভবনে ঋষিদের দান করা হল পাদ্য-অর্ঘ্য। ব্যবস্থা করা হল তাঁদের পানভোজন বিশ্রামাদির।

প্রাসাদ-রমণীরা জননী কুন্তী ও তাঁর পঞ্চপুত্রকে অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। তখন প্রাসাদ-অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল।

উদ্যোগ চলল উপযুক্ত শবদাহের। রাজকীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল পাণ্ডু ও মাদ্রীর ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া।

* * *

মহামতি ভীষ্ম কুরুকুল রক্ষার অলিখিত দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজ স্কন্ধে। সিংহাসন ত্যাগ করেও সিংহাসন রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী।

দাশরাজকন্যা সত্যবতীকে তিনি সমাদরে কুরুকুলে নিয়ে এসেছিলেন জননীর মর্যাদায়। সত্যবতীর পুত্র চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্যকে তিনি সংবর্ধিত করেছিলেন অগ্রজের ভূমিকায়।

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরে মহাবিক্রমী ভীষ্মদেব স্বয়ংবর সভা থেকে কাশীরাজ কন্যাদের তুলে নিয়ে এলেন নিজ রথে। সভায় আগত সমবেত রাজন্যদের আক্রমণ একাই প্রতিহত করলেন মহাবিক্রমে।

দুই ভগ্নী অম্বিকা, অম্বালিকাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে তিনি বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আবার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের অকাল বিয়োগের পর যখন কুরুকুল ধ্বংসের মুখে তখনও তিনি বংশধারা আর সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য দুই রানির গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের সম্মতি দান করলেন।

রানি অম্বিকা-অম্বালিকার গর্ভে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্ম নিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। আর দাসীর গর্ভে জন্ম লাভ করলেন ধর্মজ্ঞ বিদুর। এই তিনজনকেই শস্ত্র আর শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুললেন মহামতি ভীষ্ম।

পরবর্তী প্রজন্মে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনাদি কৌরবেরা আর পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র পঞ্চপাণ্ডব।

সমদর্শী ভীষ্ম রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেন উপযুক্ত গুরু।

নিরাসক্ত, সর্ববিদ্যা বিশারদ স্বার্থত্যাগী এক মহান পুরুষ সত্যধর্মকে আশ্রয় করে সুমহান ভরতবংশ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন।

কুরুকুলের রক্তধারায় শেষ পুরুষ মহামতি ভীষ্ম। তিনি সিংহাসনের অধিকারই শুধু ত্যাগ করেননি, পশ্চাতে তাঁর বংশধরেরা যদি সিংহাসনের অধিকার চায়, তাই আজীবন রইলেন ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে।

মহামতি ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মৃত্যু হয়েছিল অপরিণত বয়সে। তারপর থেকেই কুরুবংশে শুরু হল রক্ত সম্পর্কহীন ক্ষেত্রজ পুত্রের আবির্ভাব।

কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকারহীন পুরুষ কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম।

বিরাট এক নদী বিপুল জলসম্ভার নিয়ে বয়ে চলেছে এক সুমহান দেশের ওপর দিয়ে। তার জলসম্ভারে সঞ্জীবিত হয়েছে আদিম অরণ্যভূমি। পুষ্ট হয়েছে বহুদূর প্রসারিত দুই কূলের জনসমষ্টি।

তারপর একদিন লুপ্ত হয়ে গেল সে নদীর মূলধারা। সেই লুপ্তস্রোত নদীর নামটুকু বেঁচে রইল পরপর দুটি উপনদীর সংযোগের ফলে।

সেই নদীর কী অপার নাম-মহিমা। এক পুরাণ-পুরুষ সেই নবীন ধারাকেই দান করলেন পুরাতনের গরিমা।

* * *

দুই পরমাত্মীয় কৃপাচার্য আর দ্রোণাচার্য কুরু-পাণ্ডব কুমারদের শস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ভার গ্রহণ করলেন।

ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের সূত্র ধরে অখিল বিশ্বজ্ঞানের রত্নাকর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুক্ত হয়ে রইলেন মহান কুরুবংশধারায়।

মূল ভরত বংশের শোনিতধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি ভ্রাতৃগোষ্ঠী মহাত্মা ভীষ্ম ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আন্তরিক আনুকূল্য লাভ করে ধন্য হল।

বিচিত্রবীর্যের পর থেকে ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে উৎপন্ন কৌরবদের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল পুরুষোত্তম ভীষ্মের। আবার দুর্যোধনাদির সঙ্গে রক্ত-সংযোগ থাকলেও পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক ছিল না মহর্ষি দ্বৈপায়নের।

তবু এই দুই মহাপুরুষই ছিলেন কুরুপাণ্ডবের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

তৎকালে রাজপরিবারের বিশুদ্ধ বংশধারাকে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শাস্ত্রকারেরা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের একটি সম্পূর্ণ অসংস্কৃত বিধান সৃষ্টি করেছিলেন।

বংশরক্ষার জন্য দত্তক পুত্র গ্রহণ বিধান অনেক বেশি মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য। ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেহজ ভোগ একটি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। সে ব্রহ্মর্ষির দ্বারাই হোক কিংবা অন্য কোনও উচ্চ কুলোদ্ভবের দ্বারাই হোক।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের সময় কেবলমাত্র মাতৃ আজ্ঞা পালন করেছিলেন কামভাব বিরহিত অবস্থায়, একথা কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দ্বৈপায়ন যে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, তার প্রমাণ স্বর্গের অপ্সরা ঘৃতাচীর দর্শনমাত্র তাঁর রেতঃস্খলন হয়েছিল।

ধ্যান-ধারণা, যোগ-তপস্যার সঙ্গে মানুষী কামনা-বাসনা যুক্ত ছিল বলে সৃষ্টি ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর পুরুষরূপে সর্বলোকে সর্বকালে চিহ্নিত।

* * *

অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন ও দুঃশাসন ছিল পরম দুর্বিনীত ও দুরাচারী। তারা ভ্রাতা ও বন্ধুদের সঙ্গে মহাদর্পে চষে বেড়াত রাজধানী। পরবর্তীকালে দুর্যোধনই যে ভোগ করবে কুরুকুলের বিশাল সাম্রাজ্য সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিল ধৃতরাষ্ট্ররা। কিন্তু সহসা তাদের চিন্তায় প্রবেশ করল বিষাক্ত এক কীট। সে কীটের দংশনে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল তারা।

এই বিষ-জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্য তারা খুঁজতে লাগল নানা উপায়।

সদ্য আগত পাণ্ডবেরা যত প্রশ্রয় পেতে লাগল কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্যের কাছে, ততই ক্রোধে উন্মত্ত হল দুর্যোধনাদি কৌরব ভ্রাতারা।

মহারাজ পাণ্ডু যৌবনেই ছিলেন সিংহাসনে অনাসক্ত এবং অরণ্যচারী। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ এবং বিদুর পারসব বলে সিংহাসনে ছিল না তাঁদের অধিকার। কিন্তু হস্তিনাপুরের সিংহাসন তো শূন্য থাকতে পারে না। তাই অন্ধ হলেও সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকেই।

এই পরিস্থিতিতে সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী পাণ্ডু অরণ্যবাস কালেই হলেন লোকান্তরিত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব থেকেই হস্তিনাপুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাঁর সম্পর্ক। কিন্তু সহসা পঞ্চপুত্রসহ কুন্তীর আবির্ভাবে পরিবর্তিত হতে লাগল রাজগৃহের দৃশ্যপট।

ঈর্ষার বিষবাষ্পে পূর্ণ হয়ে গেল রাজপুরী। পরম ধর্মাশ্রিতা রাজ্ঞী গান্ধারীর সহোদর ভ্রাতা চরম অধর্মাচারী শকুনি মহাবেগে ব্যজন করতে লাগল সেই প্রাণহরণকারী বাষ্প।

মাতুল শকুনির কপট বুদ্ধিতে পরিচালিত হতে লাগল দুর্যোধনাদি ভাগিনেয় কুল। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করে পাণ্ডবকুমারদের পর্যুদস্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে লাগল কৌরব রাজপুত্রেরা।

মহামতি ভীষ্ম, ধর্মাত্মা বিদুর ও অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যাদির হৃদয় হরণ করল পাণ্ডবেরা তাদের বিনয়নম্র সদাচার প্রদর্শনে। অস্ত্র চালনায় অচিরেই পাণ্ডুপুত্রগণ অতিক্রম করে গেল কৌরব-কুমারদের।

অসূয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুর্যোধনেরা যতই উদ্ধত হল ততই তারা ধিকৃত হতে লাগল প্রাসাদে গুরুজন আর বাইরে জনপদবাসী প্রজাপুঞ্জের কাছে।

* * *

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সত্যবতী-সূত দ্বৈপায়ন। তপোবনের শান্ত সমাহিতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। মগ্ন চৈতন্যে শুরু হয়েছে মানস-দর্শন।

তাঁর ঔরসজাত অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্বিনীত দুর্যোধনেরা কুরুক্ষেত্রে মহারণে প্রবৃত্ত। তাদের ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে দেব-বীর্য-সম্ভূত সদাচারী যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা। সারা ভারতভূমির রাজন্যবর্গ তাদের বিপুল যুদ্ধসম্ভার আর চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে যে-কোনও এক পক্ষ অবলম্বন করে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রমত্ত।

রক্তস্নান করছে রণভূমি। তূর্য নিনাদ, শঙ্খধ্বনি, ভেরীপটহের কর্ণবিদারী শব্দ, হ্রেষা, বৃংহণ, আহতের প্রাণফাটা আর্তনাদ সংক্ষুব্ধ করছে বায়ুমণ্ডল।

রাত্রে সারি সারি বিশ্রাম-শিবিরে রণক্লান্ত সৈন্যেরা হতচেতন। সারা রাত আহতের গোঙানি। স্বল্প চন্দ্রালোকে ক্ষুধার্ত শৃগাল, সারমেয় আর গৃধিনীর দল ছিঁড়ে খাচ্ছে শবদেহের মাংস।

গভীর রাত্রে সর্ব-বিধ্বংসী এক রাক্ষসী ক্ষণে ক্ষণে হেসে উঠছে অট্টহাসি। বিক্ষিপ্ত নরকরোটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ঝঞ্ঝা ছড়িয়ে দিচ্ছে সে বীভৎস হাসি দিগ্‌দিগন্তে।

কে কাঁদে! গভীর নিশীথে কাঁদছে ভারত-সাম্রাজ্যলক্ষ্মী।

আর এক ক্ষীণ কান্নার ধ্বনি বুকে এসে বাজল ত্রিকালদর্শী ঋষি দ্বৈপায়নের। কে কাঁদে!

দিব্যদৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল হস্তিনাপুর রাজ-অন্তঃপুরে জননী সত্যবতীর অসহায় অশ্রুবিগলিত মুখচ্ছবি।

* * *

মাতা—(সত্যবতীকে প্রণাম নিবেদন করলেন দ্বৈপায়ন)।

এসো বৎস। (উপবেশনের আসন দিলেন ঋষিপুত্রকে)। আশ্রমের কুশল তো?

সর্বমঙ্গলময়ের করুণায় শান্তি বিরাজ করছে তপোবনে। পর্যাপ্ত ফল, পুষ্প দান করছে আশ্রমতরু। কুমুদ কহ্লার ফুটে আছে আশ্রমের অচ্ছোদ সরোবরে।

বেদধ্বনি, পক্ষীর কূজন, মধুকরের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ সেখানে প্রায়ই শোনা যায় না।

সেই শান্ত রসাস্পদ তপোবনে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি জননী।

অন্যমনা হলেন সত্যবতী। অন্তঃপুরে সর্বাধ্যক্ষার মহিমায় বিরাজ করছেন তিনি। জননীর মর্যাদায় রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন কুরুকুল শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম। বধূরা, পুরাঙ্গনারা প্রভাতে সন্ধ্যায় প্রণাম নিবেদন করে যান তাঁকে। এই পরিণত বয়সেও অন্ধ পৌত্রের সঙ্গে পরিহাস করেন তিনি, তাঁর শতপুত্রের জনক হবার জন্য।

প্রপৌত্রদের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা সাধ্যমতো পূরণের চেষ্টা করেন তিনি।

ভারতেশ্বর শান্তনুর সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝে সংবর্ধিত হয়ে তিনি আজও অবস্থান করছেন কুরুকুলের রাজলক্ষ্মীর আসনে।

তবু পুত্র দ্বৈপায়নের আহ্বান সহসা উপেক্ষা করতে পারলেন না সত্যবতী। তাঁর মনে চিরদিনই একটা শূন্যস্থান থেকে গেছে এই পুত্রটির জন্য। যে দশটি মাস মাত্র ছিল মাকে আশ্রয় করে, লোকচক্ষুর আড়ালে যাকে গোপন করে রাখতে হয়েছিল নানা ছলে, দ্বীপে জন্ম দিয়েই যাকে ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল বিশ্বস্ত এক দাসীর কোলে, সেই পুত্রের জন্য মাতৃহৃদয়ের অনুচ্চারিত হাহাকার থাকাই তো স্বাভাবিক।

যে ঋষিপুত্র আবাল্য পিতার তত্ত্বাবধানে সংবর্ধিত, তিনি আজ স্বয়ং সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহর্ষি হয়েও ভুলতে পারেননি তাঁর ধীবরকন্যা জননীকে। আহ্বানে, বিনা আহ্বানে তিনি চলে আসেন জননীর যে-কোনও কল্যাণকর্ম সম্পাদনে।

আজ পুত্রের এই আহ্বান তাই তাঁর কাছে অনিবার্য এবং অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হল। তবু তিনি পুত্রকে একটি প্রশ্ন করলেন, শৈশবে যে স্নেহ থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ, তাই কি পেতে চাইছ তপোবনে আমাকে আহ্বান করে?

দ্বৈপায়ন বললেন, আমি যেখানেই থাকি, বঞ্চিত পুত্রের কথা ভেবে যে তোমার স্নেহ উৎসারিত হয় তা আমি বহু দূর-দুর্গম বনপ্রদেশে থাকলেও অনুভব করতে পারি। কিন্তু আজ আমার এই আহ্বান সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে জননী।

পুত্রের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন সত্যবতী। ঋষি দ্বৈপায়ন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার ভূমিকায় বলে চললেন, জননী, আমি দেখতে পাচ্ছি সামনের দিনগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে চারদিক শোকস্তব্ধ। সুখের লেশমাত্র নেই কোথাও। ধরিত্রী দিনে দিনে শস্যশূন্যা, ফলবিহীনা হয়ে যাচ্ছে। কালে কালে মায়াজালে জড়িত হয়ে নানা দোষদুষ্ট ও সংকীর্ণ হয়ে উঠবে মন। সকলেই নিরত হবে কুকর্মে, দেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে ধর্মকর্ম। কুরুকুলের দুর্নীতিতে রাজশ্রী পরিত্যাগ করবে তাদের। অল্পকালের মধ্যেই ঘটবে মহাসংগ্রাম। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সবংশে নিহত হবে কৌরবরা।

এই ভয়ংকর চিত্র আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মহাকালের প্রেক্ষাপটে।

নীরব হলেন মহর্ষি।

নতুন কোনও প্রশ্নের অবতারণা না করে সত্যবতী বললেন, আমি তপোবন-যাত্রার জন্য প্রস্তুত পুত্র, তুমি আমাকে এ রাজপুরীর মোহ থেকে মুক্ত করে নিয়ে চলো।

* * *

কতকাল পরে যমুনার পারঘাটে এসে দাঁড়ালেন সত্যবতী। অদূরে সেই ধীবরপল্লি। বাল্য কৈশোরের লীলাভূমি। তেমনই বয়ে চলেছে কান্তিময়ী যমুনা। স্রোতে দোল খাচ্ছে ঘাটে বাঁধা তরণী।

অতি প্রত্যূষ। এখনও আসেনি পারঘাটের নাবিক। যমুনার বুকে তেমনই জেগে আছে বনাচ্ছাদিত দ্বীপভূমি।

সত্যবতীর মনে হল তিনি রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এক তরুণী কন্যায়। তাঁর হাত ধরে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন যৌবনের পরিণত মহিমায় লাবণ্যময় সুদর্শন এক ঋষি। পশ্চাতে পুষ্পিত এক বৃক্ষশাখায় সোহাগ-মগ্ন পক্ষীমিথুন। নূপুরের ধ্বনি তুলছে যমুনার জলতরঙ্গ।

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল।

এক পঞ্চবর্ষীয় বালকের হাত ধরে তপোবনের পথে নিয়ে চলেছেন তার ঋষি পিতা। সেদিকে অশ্রু বিগলিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এক তরুণী জননী।

দ্বৈপায়নের কথায় ফিরে তাকালেন সত্যবতী।

দেব দিবাকরের দীপ্ত বিভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে। সেদিকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলে চলেছেন, এই সেই ভারতভূমি, যেখানে আর্য অনার্যের রক্তমিশ্রণে গড়ে উঠছে এক মহান শক্তিশালী জাতি। আর্যের প্রজ্ঞা, প্রকৌশল, অনার্যের সেবা, সারল্য মিলিত হয়েছে এই জাতির মধ্যে। আমি সেই মহান জাতির সন্তান। হে পূষণ, তুমি আমাকে শক্তি দাও, উদ্বোধিত করো আমার অন্তরের প্রজ্ঞা যাতে আমি আর্য অনার্যের ভাব সম্মিলনে এক মহান ভারতকথা রচনা করতে পারি।

সূর্য প্রণাম শেষে জননীর পাদবন্দনা করলেন দ্বৈপায়ন।

পরম স্নেহে সন্তানের মস্তক চুম্বন করলেন জননী সত্যবতী।

মহাভারতের চরিতাবলী অবলম্বনে এই কাহিনীটি রচিত। এটিকে মহাভারতের অন্ধ অনুকরণ বলে কেউ যেন মনে না করেন।

পত্রলেখা

পত্রলেখা

ত্বরিততুরঙ্গপরিচারকোপনীতমিন্দ্রায়ুধমারুহ্য,
পশ্চাদারোপ্য পত্রলেখাম্, ... অধ্যাসিতান্তরাসনাম্।

—কাদম্বরী

[পরিচারকেরা ইন্দ্রায়ুধ নামক অশ্বটি নিয়ে এলো। চন্দ্রাপীড় কালক্ষেপ না করে অশ্বে আরোহণ করলেন। সেই একই অশ্বপৃষ্ঠে তিনি পত্রলেখাকেও গ্রহণ করলেন।]

শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অনতিদূরে শয়ননিষণ্ণ পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

[কাব্যের উপেক্ষিতা]—রবীন্দ্রনাথ

প্রসঙ্গকথা

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় জননী বিলাসবতীর কাছ থেকে পরিচর্যার জন্য পেয়েছিলেন পরাজিত কুলুতেশ্বরের বন্দিনী কন্যা পত্রলেখাকে। পত্রলেখা রাজকন্যা হয়েও ভাগ্যদোষে নিযুক্ত হল চন্দ্রাপীড়ের **তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী**। বিলাসবতীর নির্দেশ অনুযায়ী রাজকুমার চন্দ্রাপীড় তরুণী পত্রলেখাকে দাসীভাবে না দেখে বিশ্বস্ত সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলেন।

পত্রলেখা যুবরাজের ভ্রমণে, মৃগয়ায়, এমনকী দিগ্বিজয়েরও সঙ্গিনী হল। যুবরাজ অশ্বে, হস্তিপৃষ্ঠে, রথে পত্রলেখাকে একাসনে বসবার সম্মান ও সুযোগ দান করলেন।

চন্দ্রাপীড় একসময় কিন্নরদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিশেষে প্রণয় হয়। কিন্তু তাঁকে কর্মব্যপদেশে স্বরাজ্য উজ্জয়িনীতে ফিরে আসতে হয়েছিল। এই বিচ্ছেদ লগ্নে তিনি পত্রলেখাকেই রেখে এসেছিলেন কাদম্বরীর মানস-সঙ্গিনী রূপে।

চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে পত্রলেখা ছিল অভিন্ন সংযোগে যুক্ত। পত্রলেখা তরুণী এবং চন্দ্রাপীড়ের ছায়াসঙ্গিনী হয়েও কোনদিন পায়নি যুবরাজের প্রেমতপ্ত হৃদয়ের উত্তাপ। কোথায় এক চির-বিচ্ছেদের নির্মম অভিশাপ দুটি মিলন-সম্ভাবনাপূর্ণ হৃদয়পাত্রকে শূন্য করে রাখল। নয়নে দেখা গেল অমৃত, বাসনা উন্মুখ হল, কিন্তু তা স্পর্শ করতে পারল না ওষ্ঠের প্রাকার। মালা গাঁথা হল, কিন্তু যুক্ত হল না সূত্রের দুটি প্রান্ত; দয়িতের কণ্ঠে দোলানো গেল না প্রণয়কুসুমে গাঁথা সে মালা।

কথাকার বাণভট্টকল্পিত নরনারীর এই অদ্ভুত বিচিত্র সম্পর্কটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি পত্রলেখার পরিস্থিতিকে তাঁর স্মরণীয় রচনা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মধ্যে তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় পত্রলেখা নির্বাক। কবি স্বয়ং তার সপক্ষে সওয়াল করেছেন। কিন্তু বর্তমান রচনায় পত্রলেখা সবাক। তার স্মৃতিকথন ঋজু ও অব্যর্থলক্ষ্য।

[সপ্তদিবস চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর মিলন উৎসবের শেষে উজ্জয়িনী আজ সুপ্তিমগ্ন। শুধু একজন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আত্মচিন্তায় রত। চন্দ্রাপীড় প্রাসাদ থেকে নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন সে মূর্তির।]

চন্দ্রাপীড় :

শ্রান্ত রাত্রি তন্দ্রামগ্ন, তুমি একা জেগে পত্রলেখা!

পত্রলেখা :

দেখো দেখো যুবরাজ, চন্দ্রলোকে কী কলঙ্ক রেখা;
নিশি জাগরণ গ্লানি বুঝি ওই শুভ্র মুখে তার,
যেন কোনও নিদ্রাহীন স্মৃতিমগ্ন সদ্য বিধবার
ব্যথার হলুদ স্পর্শ লেগে আছে : স্খলিত অঞ্চল
স্তব্ধ হয়ে মৃত্তিকায় পড়ে আছে, দেখো অচঞ্চল।

চন্দ্রাপীড় :

পত্রলেখা, বলো আজ কেন তুমি এ লতা বিতানে?
তন্দ্রাতুর উজ্জয়িনী সপ্তাহের উৎসবাবসানে,
পক্ষপুটে বদ্ধ চঞ্চু, সরোবরে ভাসমান হাঁস
স্বপ্নের তরঙ্গে ভাসে খেলা শেষে বিগত প্রয়াস;
তুমি শুধু জেগে আছ, বলো বলো কেন জাগরণ,
উৎসুক হয়েছে মন, একা তুমি বসে কী কারণ?

পত্রলেখা :

দেখো চেয়ে যুবরাজ ওই দূরে রতি-নিকেতনে
বিটঙ্ক ওপরে বসে মুখোমুখি কূজনে-গুঞ্জনে
মগ্ন দুটি পারাবত, রাত্রিরে করেছে নিদ্রাহীন
প্রণয়ের সুতো দিয়ে বুনে চলে অদ্ভুত রঙীন
একখানি স্বপ্নবাস, ঘরে ঘরে তাই ফিরে ফিরে
স্বপ্নময় করে তোলে উজ্জয়িনীবাসীর সুপ্তিরে।

চন্দ্রাপীড় :

কী আশ্চর্য, সুত্রকণ্ঠ যথার্থই জেগে আছে রাতে
প্রিয়ারে সোহাগ করে কলকণ্ঠ প্রেমের ভাষাতে;
জ্যোৎস্নার নরম রোদে কী মোহন অনঙ্গ উত্তাপ
ছড়ায় ওদের মনে, তাই বুঝি বিচিত্র সংলাপ
নিপুণ সুরের সূত্রে ওরা দুটি গেঁথে গেঁথে যায়
তারপর সেই মালা বাতাসের আবর্তে ভাসায়।

ফুলেরাও জেগে আছে, রাত্রে তারা হয়েছে উতলা,
পরাগের পাখা মেলে বনে বনে করে রতি-কলা,
এত রূপ এ রাত্রির, সংগোপনে এত আয়োজন
তাই বুঝি পত্রলেখা, তোমার এখানে আমন্ত্রণ?

পত্রলেখা :

প্রিয়সখী কাদম্বরী এ নিশীথে শয্যায় একাকী
প্রার্থিতেরে খুঁজে ফেরে বেদনায় সমুৎসুক আঁখি,
এই লগ্নে কাম্য হোক দয়িতার যুক্ত কর-হার
ফুটুক হিরের ফুল, সেই হারে অস্ফুট কথার।

চন্দ্রাপীড় :

শোনো শোনো পত্রলেখা, কী বিচিত্র হল অভিজ্ঞতা
আজ রাতে, উপভোগ্য তোমাকে শোনাতে সেই কথা
এসেছি অনেক খুঁজে অবশেষে প্রমোদ উদ্যানে;
এ কথা সবার নয়, বলব তোমারই কানে কানে।
আজ রাতে প্রাসাদের ঘণ্টা বাজে তৃতীয় প্রহরে
তন্দ্রা ভেঙে উঠে বসি পিপাসার্ত শয্যার ওপরে,
পত্রলেখা, পত্রলেখা, কণ্ঠ শুষ্ক, পিপাসা মেটাও;
মনে হল তুমি এলে;—এনেছি পানীয় প্রভু নাও—
এই বলে ত্রস্ত হাতে দিয়ে গেলে পানীয় তৃষ্ণার;
পরিতৃপ্ত পান শেষে ভেঙে গেল আবেশ তন্দ্রার
চেয়ে দেখি, চেলাঞ্চলে সারা অবয়ব খানি ঢেকে
কে যেন গবাক্ষরন্ধ্রে অশ্রু-ভেজা চোখ দুটি রেখে
চিত্রার্পিত! ত্রস্তে শয্যা ছেড়ে দেখি, বাতায়ন পাশে
দেবী কাদম্বরী বসে, অভিমানে আঁখি দুটি ভাসে;
আদরে, সোহাগভরে বলি তারে, শোনো অভিমানী
তোমার আসার আগে আমার শয়ন গৃহখানি
নিত্য যার স্নিগ্ধ স্পর্শে হত পরিতৃপ্তির আশ্রয়,
সে তোমার প্রিয়সখী পত্রলেখা, নিশ্চিত নির্ভয়
তার সব আচরণ, এ গৃহের সেবা মূর্তিমতী
সে নারী সবার প্রিয়, তার থেকে কারও কোনও ক্ষতি
কখনও হবে না জেনো; পরিশেষে রাজ্ঞীর হৃদয়
হয়েছে আশ্বস্ত; আজ মনে হয় সে তোমারই জয়;
কী দেব তোমাকে বলো, তোমার জয়ের পুরস্কার—
এই নাও, সর্বোত্তম মুক্তো দিয়ে গাঁথা কণ্ঠহার।

পত্রলেখা :

বহু ঋণে বদ্ধ আমি ঋণভারে পাই বড় জ্বালা
আমারে দিয়ো না আর গুরুভার ওই মুক্তা মালা।

চন্দ্রাপীড় :

কী হয়েছে পত্রলেখা, কেন ঝরে অশ্রুর বকুল!

পত্রলেখা :

প্রবালে প্রহত হয়ে নৌকো এক হারায়েছে কূল;
ভেসেছিল একদিন সুনীল সাগরে দেহ রেখে—
জলের জমিনে তার আনন্দের চিত্র এঁকে এঁকে;
চলেছিল গর্বভরে পাল তুলে, মানস-মরাল,
লক্ষ্যে রেখে দ্বীপ এক দৃঢ়ভিত্তি আরক্ত প্রবাল
কিন্তু কী পরম শোক, অবশেষে ভুলের মাশুল
দিতে হল লক্ষ্যে এসে—ফোটে না যে কামনার ফুল
মৃত প্রবালের স্তূপে; ঘুমায় আত্মারা মহাসুখে
দুধরাজ নাগিনীর উর্মিশীর্ষ ফণার কৌতুকে
বিষমুগ্ধ; পৃথিবীর চেতনার জ্যোতির্ময় পাখি
সেখানে আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ স্বরে করে ডাকাডাকি;
সব আর্তি, সব ডাক ডুবে যায় বিক্ষুব্ধ হাওয়ায়
আশাহত নাবিকের নৌকো যত ফিরে ফিরে যায়
সে মায়ারাজ্যের থেকে; সেখানে রয়েছে আকর্ষণ,
কাছে এলে বীতশোক, নিরুত্তাপ, নিষ্ঠুর বর্জন।

চন্দ্রাপীড় :

শোনো তবে পত্রলেখা, আমারে কোরো না অবিশ্বাস
প্রথম দিনের স্মৃতি সূর্য হয়ে আমার আকাশ
আজও করে আলোকিত; আমি এক অভিশপ্ত প্রাণ
নাভিতে কস্তুরী নিয়ে মত্তগন্ধ উৎসের সন্ধান
করে ফিরি দিকে দিকে, বিধাতার বিচিত্র বিধানে
কামনার পাখিগুলি ফিরে যায় অন্য কোনওখানে;
তুমি এলে চুর্ণীকৃত মনঃশিলা বর্ণের প্রবাহ
লাবণ্যে অমৃত নদী; কিন্তু সে কী অনির্বাণ দাহ
আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে; ইন্দ্রগোপকীটের আভাস
তোমার ও রক্তচেলি; এ হৃদয় হয়েছে আকাশ
আসন্ন উষার স্তবে; বিমুগ্ধ হয়েছে এই মন,
'তুমি নারী আকাঙ্ক্ষিতা' এই মন্ত্র করে উচ্চারণ।

এলে তুমি নত চোখে কিরণের উজ্জ্বল বৈভবে
জয় করে নিলে চিত্ত, সুমধুর কলহংস রবে
নন্দিত নূপুর বাজে, মুক্তো বিন্দু শ্রাবণের ধারা,
আমার মানস হ্রদে কে জাগাল প্রমত্ত ইশারা!

কিন্তু আহা সেই লগ্নে করজোড়ে কঞ্চুকী কৈলাস
জানাল তোমার কথা, জননীর তীব্র অভিলাষ—
যে বন্দিনী কিশোরীরে আপনার কন্যার মতন
সংবর্ধিত করেছেন, আমি সেই অমূল্য রতন
যেন রাখি সুরক্ষিত; যেন কোনও হীন দুর্বিপাকে
আহত না করি তার সুমার্জিত সম্ভ্রান্ত আত্মাকে।

সেইদিন হতে আমি দিয়েছি তোমারে অধিকার
আমার সমস্ত কাজে, যদি আসে চিত্তের বিকার—
তাই দৃঢ় বলগা দিয়ে বেঁধেছি যৌবন-অশ্বরাজ;
জননীর আজ্ঞা রেখে, তোমারে পরাই সেই সাজ,
যার মাঝে বন্ধুত্বের চিহ্ন আছে, নেই মোহাঞ্জন
সঙ্গ আছে সুনিবিড়, অথচ তা বিমুক্ত বন্ধন।

পত্রলেখা :

কী বিচিত্র সম্পর্কের সেতুবন্ধ করেছ রচনা
এপারে আশ্বাস কাঁপে ওই পারে শুধুই বঞ্চনা;
আমি যেন সেই এক মরুযাত্রী, একক পথিক,
হারায়ে পথের রেখা, ধূ-ধূ প্রান্তে চাই নির্নিমিখ;
আকাশে আগুন জ্বলে, মনে জ্বলে কী দুঃসহ দাহ—
উন্মাদের মতো খুঁজি সুশীতল নদীর প্রবাহ।
সহসা বিস্ময়ে দেখি, কী অভিলষিত চিত্রপট
দুগ্ধকান্তি জলভার, ফলশস্য পূর্ণ নদীতট;
আকুল উল্লাসে ছুটি, মরুদ্যান রিক্ত বালুকায়,
যত যাই নেই নেই শ্যামচ্ছায়া কোথায় হারায়।
বলো বন্ধু, কী পেয়েছ গড়ে এই মিথ্যা মরুদ্যান,
রেখে জননীর আজ্ঞা, রমণীরে কী দিলে সম্মান।
সজ্জিত উদ্যানে থাকে পুষ্প তার আপন সমাজে,
তুমি তারে তুলে এনে বলো বন্ধু, লাগালে কী কাজে?
পুষ্পাধারে রেখে তারে মুগ্ধ চোখে দেখে একবার
আবেশে আঘ্রাণে তার সুদুঃসহ কৌমার্যের ভার
দিলে না লাঘব করে, শুধু তুমি নিষ্ঠুরের মতো
দয়াহীন পথপ্রান্তে ফেলে দিলে নিষ্ফল আহত।

চন্দ্রাপীড় :

পীড়িত কোরো না আর; সেবা বিশ্বে সর্বোত্তম দান
সেখানে দিয়েছি আমি নারীত্বের যথার্থ সম্মান।

পত্রলেখা :

যদি তুমি দাসী করে রেখে দিতে তোমার প্রাসাদে
প্রত্যহের কর্মচক্রে; আমি জেনো কোনও অবসাদে
কোনওদিন দিতাম না তোমারে অযথা অভিযোগ—
সেবা যত্নে থেকে যেত আজীবন সহজ সংযোগ।

চন্দ্রাপীড় :

ভুলে যাও, এই সব বিচ্ছেদের দুঃসহ বিলাপ,
জাগাও অশান্ত চিত্তে স্মরণীয় স্মৃতির সংলাপ।

পত্রলেখা :

ভুলে যাওয়া যায় কিনা, বলো বন্ধু সত্য করে বলো
স্মৃতির সরণী বেয়ে অতীতের রাজ্যে যাই চলো;
যেখানে আমার মৃত্যু দেখেছি চৈত্রের পুষ্পবনে
যেখানে শ্রাবণ মেঘে দীর্ঘশ্বাস পবন স্বননে,
যেখানে আকাঙ্ক্ষা জাগে উত্তাল সমুদ্র-ঊর্মি শিরে
যেখানে কামনা কাঁদে দু'খানি বলিষ্ঠ বাহু ঘিরে;
এসো তবে সেই রাজ্যে, বন্ধু আজ রাখো হাতে হাত
দেখো চেয়ে, কী দুঃসহ নেমে আসে স্মৃতির প্রপাত!
গুরুগৃহে শিক্ষা শেষে অন্তঃপুরে এলে একদিন
অনিন্দ্য অনঙ্গ-মূর্তি, পূর্বাশায় বালার্ক নবীন!
কী মহৎ সম্ভাবনা সর্বদেহে, তুমি দেবে ধরা—
তোমার বরণ লাগি বসুন্ধরা হল স্বয়ম্বরা।
শ্বেত অশ্বে শ্বেত বেশ শুভ্র ছত্র ধরে ছত্রধর,
কপালে চন্দন লেখা, মল্লিকার মালা মুগ্ধকর,
দূর্বাদলে কর্ণভূষা, লাবণ্যের একান্ত আশ্রয়
মুহূর্তে বিমুগ্ধ চিত্ত, যুবরাজ, করে নিলে জয়;
দু'বাহুতে শক্তি আর কামনার দ্বন্দ্ব অভিনব,
বক্ষ যেন মহাশ্রয় সুবিপুল আকাশ-সম্ভব,
চোখে যেন নেমে আসে শ্যামকান্ত ছায়াঘন দিন,
কেশগুচ্ছে মধুলুব্ধ ভ্রমরেরা হয়েছে উড্ডীন।
মেঘশীর্ষে ইন্দ্রধনু রাগরঙ্গ তোমার যৌবন।
সুতীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ করে দিলে এ কুমারী-মন।
সেদিন দর্পণ হল আমার এ প্রেমমুগ্ধ কায়া—
সেখানে বিম্বিত হল, তোমার ও বরতনু ছায়া।

চন্দ্রাপীড় :

আমার এ নদীদেহে বিদেশিনী পাখি তুমি এলে
তনুর তরঙ্গ শীর্ষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুমি ডেকে গেলে;

সে ডাক পরম রম্য, আমার সমস্ত চিত্ত কাঁপে
প্রতি পল অনুপলে মূর্চ্ছাহত বীণার আলাপে।
তুমি হলে ছায়াসঙ্গী, সেখানে অন্যের অধিকার
নেই কিছু; তুমি আছ, আর আমি একান্ত তোমার।

পত্রলেখা :

তাম্বুল করঙ্ক হাতে কতদিন তোমার সকাশে
গেছি আমি; অঙ্গুলীর সঞ্চালনে মৃদুমন্দ হাসে
নিয়েছ তাম্বুল তুলে; কর্মে ব্যস্ত থেকে বার বার
দেখেছি বঙ্কিম চোখে সুরঞ্জিত ওষ্ঠের বাহার।
শোনো বন্ধু, বলি আজ, কতদিন ওই হাতে তুমি
ছুঁয়েছ আমার হাত; কী ভূমিকম্পনে মন-ভূমি
কেঁপেছে অজস্র বার; সিন্ধুর পাঁচটি শাখানদী
উচ্ছ্বসিত, আঙুলের প্রান্ত ছুঁয়ে যেন নিরবধি
করে চলে কথকতা, আমি একা বসে বসে শুনি
স্পর্শ থেকে জেগে ওঠা সুরের বিচিত্র সুরধুনি।

মনে পড়ে পুষ্য-রথে একত্র উদ্যানে বিচরণ
পুষ্পলাবী রমণীরা রথ দেখে চঞ্চল চরণ
অঞ্চলে সঞ্চিত পুষ্প দিয়েছে তোমারে উপহার,
তুমি হেসে কেশগুচ্ছে ছড়ায়ে দিয়েছ ফুলভার;
ঝরেছে কেশের থেকে তোমার ছড়ানো যত ফুল
তারই সঙ্গে গেছে ঝরে আঁখি থেকে অশ্রুর মুকুল।

চন্দ্রাপীড় :

দুঃখের স্মৃতিরা আজ চলে যাক বিস্মৃতির পারে
সুখের পায়রাগুলি উড়ুক এখানে চক্রাকারে,
সূর্যালোকে উদ্ভাসিত শ্বেতপক্ষ উঠুক না দুলে,
উড়ে উড়ে যাক তারা আনন্দের মত্ত ঢেউ তুলে;
মনে করো আমাদের মৃগয়ার উত্তেজক দিন।

পত্রলেখা :

সে দিন স্মৃতির বুকে হয়ে আছে আশ্চর্য রঙিন;
হস্তিপৃষ্ঠে বসে দূর অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ,
তোমার শাণিত শরে আঁকা ছিল নিশ্চিত মরণ;
ইন্দ্রায়ুধে কখনও বা ক্ষিপ্রগতি মৃগের সন্ধানে
গেছ দূর হতে দূরে; কখনও বা এসে কানে কানে
বলেছ, পালাই চলো, কোনও বন্য নদীর কিনারে—
সঙ্গীরা সন্ধান যেন কোনওমতে না করতে পারে

সে অজ্ঞাত বাসস্থান; আমরা খেলেছি সেই খেলা
নীরবে নদীর জলে ভাসিয়েছি পত্রে গড়া ভেলা।

মনে আছে, একদিন মৃগয়ায় ছিলাম সঙ্গিনী
নদীতীরে দেখা গেল সুচিত্রিত হরিণ হরিণী,
ক্ষিপ্র কর-সঞ্চালনে তুলে নিলে তূণ হতে শর,
পরম বেদনা এক আমার দু'চোখে থরোথর
কেঁপে কেঁপে স্থির হল; তুমি সেই চোখের দর্পণে
দেখে নিলে হরিণীর ছবিখানি আপনার মনে;
তির গেল তূণে ফিরে, কাছে এসে তুমি কতক্ষণ
আমার নয়নে রেখে তোমার ও বিমুগ্ধ নয়ন
কত ছবি এঁকে গেলে, তার পর ভুলে গেলে সব,
কী যেন বলার ছিল, হয়ে গেলে সহসা নীরব।

ভাস্কর উৎকীর্ণ করে কত মূর্তি পাথরের গায়—
আপন সৃষ্টির কথা বার বার সে যে ভুলে যায়,
নতুন সৃষ্টির মাঝে নিত্য তার নব উত্তরণ,
কিন্তু সেই পাথরেরা বুকে নিয়ে সৃষ্টির সে ধন
রেখে দেয় বহু যত্নে, মহাকাল তীব্র ঝড় হেনে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় বারে বারে হার মেনে মেনে;
জীবনের সব স্মৃতি বুকে আছে, খোদিত বিস্ময়
কোনওদিন জেনো বন্ধু তীব্র ঝড়ে হবে না তা ক্ষয়।

চন্দ্রাপীড় :

ও কথা এখন থাক, বলো আজ অন্য কোনও কথা,
দেবী কাদম্বরী সহ তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

পত্রলেখা :

একান্ত শুনবে বন্ধু? হেমকূট শৈল সানুদেশে
হিমগৃহ মাঝে থেকে কাদম্বরী বিরহ আশ্লেষে
কাটান সুদীর্ঘ দিন; তুমি চলে এলে উজ্জয়িনী,
বিরহ-সন্তপ্ত দিনে আমি তাঁর হলেম সঙ্গিনী।
সত্য বলি আজ বন্ধু, কতটুকু বিরহ-আহত
কাদম্বরী, তার চেয়ে লক্ষ গুণ আমি যে বিক্ষত;
প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকার প্রেমালাপে কী দুঃসহ জ্বালা
নীরবে পরেছি কণ্ঠে প্রজ্বলিত অঙ্গারের মালা।
সুশীতল হিমগৃহ, মরকতমণি বিরচিত
ধারাযন্ত্র হতে জল ঝরে পড়ে পাষাণ-সংস্থিত

জলাধারে, চন্দনের গন্ধমাখা হিমস্নিগ্ধ নীর
মেখেছি সর্বাঙ্গে তবু যন্ত্রণায় হয়েছি অস্থির;
কী দুঃসহ জ্বালা তুমি দিলে বন্ধু, ভুজঙ্গদংশন
তার কাছে অতি তুচ্ছ; ব্যথাবিদ্ধ রক্তাক্ত মরণ
আমারে দিয়েছ তুমি, সে আমার পরম সঞ্চয়;
প্রেমে মৃত্যু পুরস্কার, এ আমার সর্বোত্তম জয়।

সত্য জেনো আজ আর নেই কোনও বিরহ সন্তাপ
নাও বন্ধু তুলে নাও রক্তস্নাত প্রেমের গোলাপ।

চন্দ্রাপীড় :

পত্রলেখা, ফিরে চলো, রাত্রি নত দিনের চরণে,

পত্রলেখা :

এ প্রভাত শুভ হোক বিচ্ছেদের নিঃশব্দ মরণে।

লীলারহস্য

নীলাঞ্জন ঘন মেঘে সংবৃত হয়ে আছে পূর্ব দিগন্ত। সহসা আর্দ্র বাতাসে ভেসে এল সিক্ত যূথির গন্ধ।

দিগন্তের দিকে স্বপ্নভরা দুটি চোখ মেলে চেয়েছিল এক আশ্রমকন্যা। বয়ে এল একঝলক দুরন্ত হাওয়া। কন্যার কপোল ছেয়ে গেল চূর্ণ কুন্তলে। দু'বাহু তুলে চাঁপার কলির মতো আঙুল চালিয়ে সে সরাতে লাগল তার অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ।

অদূরে বয়ে চলেছে বঙ্কিমগতিতে আশ্রম-তটিনী। সেই শীর্ণ স্রোতস্বিনীর কূলে আশ্রম সীমানার কেতকীবীথি। কেতকীর সুরভিত পরাগও উড়ে আসছিল হাওয়ায়।

আশ্রমের ছায়াতরুর তলায় বাঁধানো বেদির ওপর বিচিত্র কলাপ বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিল আশ্রম-বলিভূক্ কেকা। অপরূপ নৃত্য ভঙ্গিমায় তরঙ্গিত হচ্ছিল তার পেখম।

সহসা মেঘলোকে শোনা গেল ডমরুর ধ্বনি। অশ্বের গতিতে বয়ে আসছিল উন্মাদ পবন। মেঘে মেঘে অশ্ববাহিত রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি। উড়ন্তরেখায় ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছিল বিদ্যুৎ পতাকা।

অষ্টাদশী আশ্রমকন্যার কানে কানে কে যেন বলে গেল—সে আসে, সে আসে।

বর্ষার ধারাপাতের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তার চরণধ্বনি। ফিরে দাঁড়াল আশ্রমকন্যাটি। বিস্ময়ে হতবাক সে। কে এই কান্তিমান সুদর্শন তরুণ, অনাবৃত উর্ধ্ব অঙ্গ। বক্ষলগ্ন শুভ্র উপবীত। ঠিক যেন আশ্রম-প্রান্তরে প্রবাহিত শুভ্র জলধারাটির মতো।

মাথা-ভরা কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম। দিগন্ত পারের ঘনকৃষ্ণ মেঘের জটাজালের মতো। চাহনিতে বিদ্যুতের দীপ্তি, কিন্তু দাহ নেই সে দীপ্তিতে। সমস্ত অবয়বে সজল বর্ষার স্নিগ্ধ স্পর্শ।

বিস্ময়মিশ্রিত অর্ধস্ফুটস্বরে আশ্রমকন্যা জানতে চাইল আগন্তুকের পরিচয়।

আমি এক বিদ্যার্থী। গুরু শুক্রাচার্যের পদপ্রান্তে বসে বিদ্যাশিক্ষা করার অভিলাষ।

আবার প্রশ্ন, নিবাস?

দেবলোক।

সহসা বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ।

আশ্রমকন্যা আগন্তুককে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বলে উঠল, আমাকে দ্রুতপায়ে অনুসরণ করুন।

প্রথমেই পড়ল অতিথিনিবাসের পর্ণকুটির।

আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি অচিরে পিতার কাছ থেকে আপনার আশ্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে আসছি।

অতিথিশালায় তরুণ তাপসকে রেখে পিতার কাছে ছুটে চলে গেল আশ্রমকন্যা দেবযানী।

হস্তে ধৃত ঘৃতপূর্ণ দর্বি। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড। কয়েকজন আশ্রমবালক মন্ত্রোচ্চারণ করছিল। প্রলম্বিত জটাজাল দানবগুরু উগ্রতাপস শুক্রাচার্য হোমকুণ্ডে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত।

পিতার কাছে গিয়ে প্রথম বর্ষায় অর্ধস্নাত দেবযানী নতজানু হয়ে বসল।

শুক্রাচার্য হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিয়ে কন্যার দিকে ফিরে তাকালেন।

কেবলমাত্র পিতার শ্রবণগোচর হয় এমন অর্ধস্ফুটস্বরে দেবযানী বলল, পিতা, আশ্রমে এক তরুণ অতিথির আগমন হয়েছে। তাঁকে আমি অতিথিনিবাসে অপেক্ষা করতে বলে চলে এসেছি আপনার কাছে। আপনার অনুমতি পেলে অতিথিসৎকারের সমস্ত ব্যবস্থাদি করা হবে।

শুক্রাচার্য উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, বৃষ্টিতে অতিথি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে পারেন, তুমি অচিরে গিয়ে আশ্রমনিবাসের দ্বার নবাগত অতিথির জন্য উন্মুক্ত করে দাও, আমি হোম সমাপ্ত করে অতিথির সঙ্গে মিলিত হব।

ব্রহ্মচারীদের মন্ত্রোচ্চারণ স্তিমিত হয়ে এসেছিল, দেবযানী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল।

আশ্রমকুটির থেকে পাদ্যঅর্ঘ্য নিয়ে গিয়েছিল দেবযানী নবীন অতিথির জন্য। সেখানে আশ্রমকন্যাটির দ্বারা বিশেষভাবে সংবর্ধিত হল বৃহস্পতিপুত্র তরুণ তাপস কচ।

দেবযানী আশ্রমকুটিরে ফিরে যাবার আগে বলল, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। হোম সমাপ্ত করে পিতা এখানেই আসবেন। তাঁর কাছে জানাবেন আপনার মনোবাসনা।

প্রথমদিন দীর্ঘায়িত হল না পরিচয়। দেবযানী ত্রস্তপায়ে ফিরে গেল আশ্রমকুটিরে।

কিছু পরেই সমাপ্ত হল প্রভাতি হোম। মেঘের কিনার কেটে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল সূর্যের জ্যোতির্লেখা। থেমে গেল ধারাপাত।

পিতাকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিনিবাসে পুনরাবির্ভাব দেবযানীর।

উন্মুক্ত গৃহদ্বারে দু'টি হাত প্রসারিত করে দেবযানীর গমনপথের দিকে চেয়ে ছিল তরুণ তাপস কচ। তারপর দৃষ্টি-সীমানা থেকে মুছে গিয়েছিল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। আবার দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠল পরম রমণীয় কন্যাটি—পশ্চাতে আশ্রমগুরু শুক্রাচার্য স্বয়ং।

কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে কচ প্রণতি নিবেদন করল দৈত্যগুরুর চরণে।

কান্তিমান, বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ বিদ্যার্থী প্রথম দর্শনেই হরণ করল গুরুর হৃদয়।

শুক্রাচার্য অতিথিনিবাসে উঠে এসে অতিথিকে সম্মুখে উপবেশন করতে বলে তার বিপরীত দিকে স্বয়ং আসন গ্রহণ করলেন।

কোথা থেকে আগমন কল্যাণীয়? তোমার পিতৃপরিচয় জানতে সবিশেষ উৎসুক আমি।

করজোড়ে অত্যন্ত সুবিনীতকণ্ঠে তরুণ বলল, দেবগুরু বৃহস্পতি আমার পিতা। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা গ্রহণের জন্য। এ অধীনের নাম কচ। মহর্ষি অঙ্গিরা আমার পিতামহ।

তোমার পিতা এবং পিতামহ ঋষিকুলতিলক। তাঁরা আমার মতো সকল তপস্বীরই নমস্য। তুমি সেই পবিত্র গৌরবান্বিত বংশে জন্মগ্রহণ করে আমার কাছে কেনই বা এসেছ ব্রহ্মচর্য দীক্ষা গ্রহণ করতে?

আমি আবাল্য আপনার শক্তির প্রতি অনুরক্ত। আপনি বিপুল শক্তিমান না হলে প্রবল পরাক্রান্ত দানবরাজ বৃষপর্বা আপনাকে গুরুরূপে বরণ করতেন না। আমার দৃষ্টিতে আপনি ঋষিশ্রেষ্ঠ। শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে আমাকে দীক্ষিত করুন ব্রহ্মচর্যে।

তথাস্তু। তুমি তপোবনপ্রান্তের সাধন-কুটিরে আজ থেকে অবস্থান করবে। সেখানে শয্যা

সুকোমল নয়, সেটাই ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত বিশ্রামস্থল। প্রতিদিন প্রভাত, সন্ধ্যায় আশ্রমকুটিরে এসে তুমি হোমানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। পরে অধ্যয়নগৃহে যোগদান করবে সমস্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। তোমার আহার্যের ব্যবস্থা আশ্রম থেকেই নিষ্পন্ন হবে। এই আশ্রমের আয়তন বিশাল। এখানে যেমন ফলকর বৃক্ষ সমুদয় রয়েছে তেমনই প্রস্তুত হয়ে আছে যব-গমাদির ক্ষেত্র। আশ্রমবালকেরা যেমন তরুশাখা থেকে ফল সংগ্রহ করে তেমনই শস্যক্ষেত্রে হলকর্ষণ আর বীজবপন করে ফসল ফলায়। আমাদের উৎপাদিত ফসল এবং সংগৃহীত ফলে সমস্ত আশ্রমবাসীরই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

কচ বলল, ভগবান আমি সানন্দে আশ্রমের সর্বপ্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকব।

শুক্রাচার্য নবীন ব্রহ্মচারীর মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক বৎস।

সেই থেকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থান করতে লাগল।

যেহেতু দেবলোক থেকে এসে তাঁর প্রতিদ্বন্দী বৃহস্পতির পুত্র স্বেচ্ছায় তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেছে সেজন্য কচ হল তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। এক্ষেত্রে অন্যান্য ব্রহ্মচারীর থেকে কচকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করা হল।

শুক্রাচার্য দেখলেন বৃহস্পতিপুত্র সত্যই মেধাবী। বিদ্যাচর্চায় অনন্যমনা। সর্ববিষয়ে অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা রাখে সে।

সেই বৎসর ফলভারে অবনত হল তরুশাখা। দ্বিগুণ শস্যে পূর্ণ হল খেতগুলি।

মহর্ষি ভাবলেন, এ সকল এই তরুণ ব্রহ্মচারীর শুভাগমনের ফল।

অন্যদিকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শুরু হল অন্য এক লীলা।

বর্ষার ধারাপাতে ঘন ঘন সিক্ত হতে লাগল এক অভিসারিকার গৌরতনুবল্লরী।

সিক্তবসনে সহসা তরুণ তাপসের সম্মুখে উপস্থিত হতে সংকোচ হল না অভিসারিকা আশ্রমকন্যার।

তার উপস্থিতি তরুণ-হৃদয়কে আলোড়িত করত, কিন্তু কখনও বাধাহীন হত না সংযমের বন্ধন।

আলাপচারিতা ছিল উপভোগ্য। দীর্ঘক্ষণ অধ্যয়নের পর দেবযানীর আগমন বর্ষার একটি স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে আনত।

কচ বলত, তোমার আবির্ভাবের পূর্বে আমার কাছে বর্ষার দূত জানিয়ে যায় তোমার আগমনের বার্তা।

কৌতূহলী দেবযানী জানতে চায়, সে কী রকম?

পূব হাওয়াতে ভেসে আসে সিক্ত মল্লিকার সুবাস। তোমার কবরীর ওই মল্লিকা মালা থেকে গন্ধ হরণ করে গন্ধবহ জানিয়ে যায় তোমার আগাম উপস্থিতি।

উল্লসিত দেবযানী বলে, দেখো দেখো সখা, তোমার অপরূপ কথা শুনে কদম্ববন কেমন রোমাঞ্চিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কচ উঠে গিয়ে দু'টি পাতাসহ একটি ফুল্ল কদম্ব তুলে এনে দেবযানীর হাতে দিল।

সেই কদম্বপুষ্পটিকে বক্ষ এবং মস্তকে ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দিল ব্রহ্মচারী কচের হাতে।

আহত কচ বলল, অকিঞ্চিৎকর বলে কি তুমি আমার উপহার ফিরিয়ে দিলে দেবযানী!

সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী বলল, তোমার উপহারকে আমার হৃদয়ের স্পর্শ মাখিয়ে ফিরিয়ে দিলাম প্রিয় সখা।

অভিভূত কচ বলল, আমি কৃতার্থ হলাম দেবযানী।

অপরাহ্নের সূর্য ঘন মেঘের আড়ালে সন্ধ্যার সূচনা করে। বনদেবীর ছায়াঞ্চলে আবৃত হয়ে যায় সমস্ত দিগ্‌দেশ। দুটি ছায়ামূর্তির দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে বর্ষার বাতাস। না-বলা কথারা হৃদয়ের মধ্যে গুঞ্জন করে ফেরে।

হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দুটি মন। নিবিড় আকাঙ্ক্ষা প্রেমের দেবতা মদনের মূর্তি ধরে দুটি মিলন সমুৎসুক হৃদয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই দীপ-নির্বাণ।

উঠে দাঁড়ায় দেবযানী।

তুমি পশ্চাতে এসো, আমি গৃহে গিয়ে সান্ধ্য-হোমের আয়োজন করি।

সকরুণ শোনায় দেবযানীর কণ্ঠস্বর। ঝড়ে আহত কোনও বিহঙ্গ যেন উড়ে চলে গেল তার নীড়ের আশ্রয়ে।

সন্ধ্যায় সেই অগ্নিবন্দনা আর হব্যের আহুতি।

ব্রহ্মচারী কচের কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণে সময় উদাত্ত, স্বরিত আর অনুদানের উত্থান-পতন এক আশ্চর্য স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে।

গুরু শুক্রাচার্য মনে মনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন তরুণ ব্রহ্মচারীটির দিকে।

কুটিরের বাতায়নে চোখ পেতে দেবযানী দেখত শুদ্ধ বসনে পরিশোভিত এক অনিন্দ্যসুন্দর তাপসকে দিব্য মহিমায়।

তরুণীর সমস্ত অন্তরজুড়ে একটি আকাঙ্ক্ষা কায়ামূর্তি ধারণ করত। সে ধীর পদসঞ্চারে সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে যেত ওই তরুণ তাপসের দিকে। হাতে তার বকুল আর কেতকীর পাপড়িতে গাঁথা একটি সুরভিত মালা।

তাপসকে পরাতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়াত। মনে হত, এই তরুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। সে সেই মুহূর্তে বিশ্ব ভুলে নিজের তপস্যাতেই মগ্ন।

আহত আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিরে আসত দেবযানীরই অন্তর্লোকে।

এই সাধনার কালগুলিতে সাধককে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে নেই তা জানত দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মচারীশ্রেষ্ঠ কচ।

রাত্রে আহারান্তে কচ ফিরে যেত তার তপোবনপ্রান্তের বিশ্রাম কুটিরে। আশ্রমের মূলগৃহের সন্নিকটে ছিল ব্রহ্মচারী নিবাস। তারা সদলবলে মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে ভোজনগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে যেত বিশ্রাম নিবাসে। বৃষ্টি তাদের যাত্রায় কোনওদিনই বিশেষ বিঘ্ন ঘটাতে পারত না। কিন্তু যেদিন প্রবল বর্ষাধারায় সিক্ত হত বনপথ, আশ্রম তরুর পত্রে পত্রে ধ্বনিত হত ধারাপতনের সংগত, তখন সবার অলক্ষ্যে ছত্রের মতো দেবযানী এগিয়ে দিত একটি পদ্মপত্র একান্ত অন্তরঙ্গজনের দিকে।

কৃতার্থ হত তরুণ ব্রহ্মচারী। কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ অন্তর নিয়ে বিদ্যুৎ চমকে পথ চিনে চিনে সে চলে যেত তার বিশ্রাম কুটিরের দিকে।

বর্ষাকাল প্রেমিকজনের কাছে যেন এক দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনে। যাকে চাই তাকে না-পাওয়ার

ধ্বনি ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে। দুঃসহ এক বেদনা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে মেঘের চাপা গর্জনের মতো। বিষাদ-বিষণ্নতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। একটি মধুর স্মৃতিকে স্বপ্নে ধারণ করে নিশিযাপন করে দেবযানী। কিন্তু সব চাওয়াই না পাওয়ার বিষাদে ধূসর ছায়াময় হয়ে যায়।

কোনও কোনও রাত্রে স্বপ্নে অভিসার-যাত্রা করে ঋষিকন্যা দেবযানী। প্রিয়মিলনের উৎসুক দীপটি জ্বলতে থাকে অন্তরে। সে দীপের শিখা বিদ্যুৎ চমকে ছড়িয়ে পড়ে পথে-প্রান্তরে। উৎকণ্ঠিত অভিসারিকা অশঙ্কিতচিত্তে মেঘগর্জনকে তুচ্ছ করে, শাল, তাল, তমাল, পিয়ালের আন্দোলনকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হয় প্রিয়তমের মিলনকুঞ্জ অভিমুখে। তর্জিত তটিনী, গর্জিত মেঘ তার গমনপথে সৃষ্টি করতে পারে না কোনও বিঘ্ন।

কিন্তু হায়, কচের রুদ্ধদ্বারে এসে থেমে যায় তার সকল উদ্যম। দ্বারে করাঘাত হানতে গিয়েও শিথিল হয়ে যায় অঙ্গুলিগুলি। একটা অদৃশ্য নিষেধ লক্ষ্মণরেখা টেনে স্তব্ধ করে দেয় তার গতি। অভিমান খরস্রোতা নদীর আবর্তের মতো ঘুরতে থাকে আশাহত অন্তরের গভীরে।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ অবসাদে তপ্তদেহ ঢলে দেয় সে শয্যায়। একসময় নিদ্রা এসে জননীর স্নেহহস্ত বুলিয়ে দেয় তার সর্বাঙ্গে। আবার দিনের সূচনা, আবার দিনারম্ভ থেকে দিনান্ত পর্যন্ত কর্মচক্রের আবর্তন।

কোনও বিরহীজন বলেছে, বর্ষাঋতু প্রেমের কাল। কিন্তু এ কাল প্রেমের হলেও মিলনের নয়। এ ঋতু শুধু অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয় প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তর। বসন্তের মিলন-লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় দুটি মিলন-উৎকণ্ঠিত হৃদয়কে।

ডাহুকের ডাকে যে বিরহ, তার অবসান ঘটে বসন্ত কোকিলের কুহুধ্বনিতে।

বিদীর্ণ শ্যামকান্তি বৈদুর্যমণির মতো নবতৃণদলে আচ্ছাদিত হল আশ্রমপ্রান্তর। কখনও বা ধারাপাতকে ধারণ করল সে বিন্দু বিন্দু শিশিরকণার ছন্দিত গ্রন্থনে। আবার কখনও আঁকাবাঁকা জলস্রোত নবীন তৃণদলকে স্পর্শ করে ছুটে চলল কোনও নিম্নগামী নদীর অভিমুখে। এ যেন শ্যামল সজলে হঠাৎ স্পর্শের আনন্দ-শিহরন।

একসময় বেজে উঠল শরতের সোনার বাঁশি। তাকে অভিনন্দন জানাল আন্দোলিত শুভ্র কাশগুচ্ছ। নীলকান্তমণির মতো নীলাকাশ দিনের সূর্য এবং রাতের নক্ষত্রখচিত চন্দ্রকে প্রদীপ্ত করে তুলল। জয়ের ধ্বনি তুলে বাতাসে দুটি চিত্রিত ডানা ভাসিয়ে নীলাকাশের দিকে উড়ে চলে গেল নীলকণ্ঠ পাখি।

শেফালিকা ঝরে পড়ল তরুতলে। দেখা গেল আশ্রমকন্যা দেবযানী আপনমনে শিউলিফুলের মালা গাঁথছে সঙ্গোপনে, দয়িতের কণ্ঠে পরাবে বলে।

প্রভাতী হোমের অন্তে আশ্রম সরোবরে স্নান সমাপন হল ব্রহ্মচারী কচের। সেই অবকাশে শেফালিমাল্য হাতে কচের নিরালা কুটিরে উপস্থিত হয়েছিল গুরুকন্যা দেবযানী।

সপ্তপর্ণীর আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিল সে কচের প্রতীক্ষায়। সিক্তবসনে অপাপবিদ্ধ কচ প্রবেশ করল তার কুটিরে। ক্ষণকাল পরে শুষ্ক বসন পরিধান করে দেহলিতে এসে দাঁড়াল সে। সেই মুহূর্তে নীলাকাশে পাখা মেলে মানস সরোবরের দিকে ভেসে যাচ্ছিল হংসমিথুন। নির্নিমেষ সেদিকে তাকিয়ে রইল রূপদর্শী কচ। পত্রান্তরাল থেকে প্রভাত সূর্যের স্বর্ণ কিরণবিন্দু এসে পড়ল তার ললাটে। মনে হল দেবলোক থেকে গুরু বৃহস্পতি পুত্রের ললাটে

এঁকে দিলেন সর্ববিঘ্ননাশী জয়তিলক। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধীর পদসঞ্চারে এসে অনুরাগের সুতোয় গাঁথা শেফালিকার মালাটি দুই হাতে তুলে ধরল দেবযানী।

মুহূর্তে কচ শির নত করে গ্রহণ করল সেই শারদলক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য শেফালিকার মালা।

আশ্রম সন্নিকটে সৈন্য সমাবেশ করেছেন দৈত্যরাজ বৃষপর্বা। আশ্রমের বিরাট যজ্ঞস্থলিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে ঘিরে বসে রয়েছেন রাজা ও অমাত্যবর্গ। ব্রহ্মচারীরা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করছে দেবনিধন মন্ত্র। মাঝে মাঝে যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন অসুর-গুরু শুক্রাচার্য।

লেলিহান হয়ে উঠেছে অগ্নি। লক্‌লক্‌ করে উঠছে মহাকালের রসনা। গুরু শুক্রাচার্যের অবয়ব ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। ধক্‌ধক্‌ করছে দুই নয়ন, হোমধূমে আবৃত পিঙ্গল জটাজাল। তিনি যেন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছেন দেবাসুরের সংগ্রাম।

একসময় যজ্ঞ সমাপ্ত হল। অসুররাজ বৃষপর্বার ললাটে রক্তবর্ণ তিলক এঁকে দিলেন গুরু শুক্রাচার্য। মুখে বললেন, 'বিজয়ী ভব'।

গুরুর পাদবন্দনা করলেন দৈত্যরাজ বৃষপর্বা।

সমবেত অমাত্যদের জয়তিলক পরাতে লাগল ব্রহ্মচারীবৃন্দ।

তপোবনপ্রান্তে সৈন্যশিবিরে গিয়ে সবার ললাটে এঁকে দেওয়া হল বিজয়চিহ্ন।

এই বিজয়যাত্রা অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল ব্রহ্মচারী কচ।

অনুষ্ঠানের পূর্বদিন সায়াহ্নে কথা হচ্ছিল পিতাপুত্রীর।

দেবযানী—পিতা, আগামীকালের মঙ্গলপ্রভাতে মহাযজ্ঞে কি সমস্ত আশ্রমিকের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক?

অবশ্যই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন পুত্রী?

দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাতে অসুরপতি বিজয়ী হন সেই অভিলাষেই তো এই যজ্ঞ। তা হলে এই যজ্ঞে আপনার শিষ্য দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র কচের যোগদান কি সমীচীন হবে?

এ প্রশ্ন তো আমার মনে জাগেনি পুত্রী। সমস্ত ব্রহ্মচারীর মতো তারও এই যজ্ঞে যোগদান করার কথা।

আমার মনে হয় পিতা আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও সর্বান্তঃকরণে কচ দেবনিধন যজ্ঞে স্পষ্টকণ্ঠে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে না। তাতে আপনার যজ্ঞে সামান্য হলেও বিঘ্ন ঘটবে। একটি বৃহৎ জলপূর্ণ কুম্ভে যদি সামান্যতম ছিদ্র থাকে তা হলে বিশাল কুম্ভও তার জল ধরে রাখতে পারে না। তখন কুম্ভটির উপযোগিতাই নষ্ট হয়ে যায়।

যুক্তিযুক্ত তোমার বাক্য। আমি ওকে এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে দেব।

দেবযানী সঙ্গে সঙ্গে বলল, পিতা আপনি এই সামান্য বিষয় নিয়ে বিচলিত হবেন না। যতই হোক আপনি কচকে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে ওকে বারণ করলে ও আহত হতে পারে। গুরু হিসেবেও আপনি পক্ষপাতদুষ্ট হবেন। এই পরিস্থিতিতে সমাধানের ভার আপনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।

তথাস্তু পুত্রী।

পরদিনের যজ্ঞের জন্য ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গুরু শুক্রাচার্য।

রাত গভীর হল। আকাশে ক্ষীণ শশাঙ্ক লেখা।

মোহিনী মূর্তিতে সজ্জিত হল ঋষিকন্যা দেবযানী। একসময় তাকে সোনার নূপুর উপহার দিয়েছিল অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। রাজপুত্রী ছিল দেবযানীর সখী। সেইসূত্রে দেবযানীর যাতায়াত রাজপ্রাসাদে। সেখানে সখী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নানাধরনের কলাবিদ্যা শিক্ষা করেছিল সে। নৃত্যগীতে তার স্বাভাবিক দক্ষতা রাজগৃহেই স্ফূর্তি লাভ করেছিল। কিন্তু আশ্রমে সেই বিদ্যা প্রদর্শনের কোনও সুযোগই ছিল না।

আজ দুই চরণে সেই সোনার নূপুর বেঁধে নিল দেবযানী। শারদ পুষ্পে সুশোভিত হল তার সর্বাঙ্গ।

সবার অগোচরে নিঃশব্দে সে যাত্রা করল কচের বিশ্রাম নিকেতনে।

শান্ত-সমাহিত পরিবেশে ছায়াতরু-বেষ্টিত বেদির ওপর পদ্মাসনে বসেছিল ধ্যানমগ্ন কচ।

বাতাসে ভেসে আসছিল কিন্নর-কণ্ঠ নিঃসৃত সংগীত। অসাধারণ সেই সুরের ইন্দ্রজাল। সাধকের চতুর্দিকে আবর্ত সৃষ্টি করছিল সেই সংগীতের মূর্ছনা।

ধীরে ধীরে ধ্যানভঙ্গ হল তরুণ তাপসের। তার দৃষ্টি পতিত হল বনপথের ওপর। যদিও পথ ছায়ায় সংবৃত ছিল, তবুও কচ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

গান থেমে গেছে। এখন কানে এসে বাজল নূপুরের ধ্বনি। সাধনবেদির দিকে এগিয়ে আসছিল সেই ঝংকৃত মঞ্জীর।

কচের মনে হল যেন স্বয়ং শারদলক্ষ্মীর চরণধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে।

ক্ষীণ চন্দ্র তারকার অস্পষ্ট আলোকে তার সামনে এসে যে দাঁড়াল তাকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হল না ব্রহ্মচারী কচের।

তার প্রশ্নে জড়ানো ছিল বিস্ময়—এমন নিশীথ অভিসারিকার ভূমিকায় তোমাকে দেখতে পাব তা ভাবতে পারিনি দেবযানী।

প্রিয়জনের কাছে প্রতিটি আগমনই অভিসার—তাই না কচ?

কিন্তু এই নিশীথ অভিসারই আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছে আচার্যপুত্রী।

দেবযানী বলল, আমি তোমার গুরুকন্যা ঠিক কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা পরিচয় আমার আছে—আমি তোমার সখী, একান্ত প্রিয়সুখভাগিনী।

এই বেদির ওপর উপবেশন করো দেবযানী, মনে হচ্ছে আজ আমার উৎসবের রাত।

কচের অদূরে প্রস্তর বেদির একপ্রান্তে উপবেশন করল দেবযানী।

কাল প্রভাতেই যজ্ঞ, একথা আশা করি তুমি বিস্মৃত হওনি।

সপ্রতিভ কচ বলল, অবশ্যই তা আমার স্মরণে আছে।

সে কারণেই এমন রাত্রির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে তোমার কাছে এসেছি কচ। তোমাকে চিন্তামুক্ত করতে।

বিস্মিত কচ বলল, আমাকে চিন্তামুক্ত করতে! তুমি কি আমার চিন্তার কারণ জানো?

অনুমান করতে পারি। তুমি কি আগামীকালের যজ্ঞের কথা চিন্তা করছিলে?

আশ্চর্য তোমার অনুমান!

দেবযানী বলল, স্বজন-নিধন যজ্ঞে কোনও বিবেকবান পুরুষই বা আহুতি দিতে পারে কচ।

বিষণ্ণকণ্ঠে কচ বলল, সেটাই আমাকে বিষাদগ্রস্ত আর চিন্তিত করে রেখেছে। চিন্তা আমার স্বজনের জন্য, আর বিষাদ—গুরুর এই যজ্ঞে আমার যোগ দেওয়া হবে না বলে।

পিতা তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেছেন?

গুরু আমাকে যজ্ঞে যোগদানের ব্যাপারে কোনও রকম আদেশ করেননি।

দেবযানী বলল, তা হলে আর তোমার ভাবনা কী—তুমি তো নিষ্কৃতিই পেয়ে গেছ।

ওখানেই আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেবযানী। গুরু যদি যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য আদেশ করতেন তা হলে আমি গুরুবাক্য শিরোধার্য করে অবশ্যই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হতাম। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নির্বাক থেকে সমস্ত বিচারের ভার আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এ আমার এক পরীক্ষা দেবযানী। এতক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে আমি সেই সমস্যারই সমাধানের পথ খুঁজছিলাম। তোমার আকস্মিক উপস্থিতি আমাকে অনেকখানি আশ্বস্ত করেছে।

আমার ওপর সামান্যতম নির্ভরতার জন্য আমি নিজেকে বিশেষভাবে গর্বিত মনে করছি প্রিয় বন্ধু।

কচ এবার মুক্তকণ্ঠে বলল, তোমার সমাধান-সূত্রই আমি সম্পূর্ণরূপে মেনে নেব দেবযানী।

নির্দ্বিধায় আমি বলতে পারি, তোমার স্থানে আমি থাকলে কোনও ভাবেই যজ্ঞে যোগ দেবার কথা ভাবতাম না। আমার শিষ্যত্ব হারাতে হলেও নয়।

আমি এতক্ষণে চিন্তামুক্ত হলাম প্রিয়সখী। তবে একটা সংশয় আমার থেকে যাবে।

কী সে সংশয় প্রিয়সখা?

গুরু এজন্য আমার ওপর কোনও রকম দোষারোপ না করলেও আমার সতীর্থরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

দেবযানী বলল, প্রথম থেকেই দৈত্যসন্তানেরা তোমার ওপর প্রসন্ন নয়। তাদের তীব্র সন্দেহের অগ্নিদাহের ভেতর দিয়ে তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে তোমার ব্রত। পিতার প্রসন্নতার বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

সামান্য সময় নীরব রইল দু'জনে। একসময় গাত্রোত্থান করল দেবযানী। মৃদুহাস্য সহকারে বলল, আজ এখানেই সমাপ্ত হোক নিশাভিসার।

কচ বেদির নীচে নেমে বলল, চলো বরবর্ণিনী, কিছু পথ তোমাকে সঙ্গদান করে নিজে ধন্য হই।

ক্রমে আশ্রমকুটিরগুলি দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

কচ থমকে দাঁড়াল।

দেবযানী তার দিকে ফিরে বলল, তোমার সাহস এতদূর নিয়ে এসে এখানেই তোমার জন্য লক্ষ্মণরেখা টেনে দিল কচ।

কচ বলল, আমার স্পর্ধাকে তুমি আর প্রশ্রয় দেবে না আশা করি।

দেবযানী কুটিরের অভিমুখে বাম চরণ উত্তোলন করে বলল, এই প্রথম নিশাভিসার আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল সখা। আশা করি এই অভিসারের লগ্ন আগামী যামিনীগুলিতে দীর্ঘায়িত হবে।

আর তাই হবে আমার পরমতৃপ্তি, বলল কচ।

এবার উভয়েই বিপরীতমুখে দ্রুত পদসঞ্চারে অন্তর্হিত হল।

শেষ প্রহরের বেশ কিছু আগে পিতার কুটিরে এল দেবযানী। ভেজানো দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি করল।

শয্যাত্যাগ করলেন দৈত্যগুরু। তাঁর জাগরণের ভার ছিল কন্যার ওপরেই সমর্পিত।

দ্বার উন্মোচিত হল। পূর্বাকাশে ঝলমল করছিল স্নিগ্ধ শুকতারা। বয়ে আসছিল শরতের শীতল উপভোগ্য প্রভাত সমীরণ।

যজ্ঞস্থলিতে শিষ্যদের কলরব শোনা যাচ্ছিল। যজ্ঞক্ষেত্র পরিমার্জনা করছিল তারা। মিলিত সম্মার্জনী সঞ্চালনের শব্দ ভেসে আসছিল।

পিতার প্রভাতি আচমনাদির ব্যবস্থা করে দিল প্রিয়কন্যা দেবযানী।

আজ মহাযজ্ঞ। নীরব গাম্ভীর্যে গুরু করে যাচ্ছিলেন তাঁর কৃত্যগুলি।

পিতাকে নানাভাবে সাহায্য করে যজ্ঞস্থলির উদ্দেশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে দিল দেবযানী।

তপোবনের তরুশাখায় বিহঙ্গের কলধ্বনিতে সূচনা হল অরুণোদয়ের পূর্বমুহূর্ত।

মহাযজ্ঞের ঋত্বিক স্থির পদবিক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন যজ্ঞস্থলিতে। চতুর্দিকে একবার অবলোকন করলেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন যজ্ঞারম্ভের লগ্নের জন্য। যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে করজোড়ে অর্ধমণ্ডলে দণ্ডায়মান শিষ্যকুল।

যজমান দৈত্যরাজ বৃষপর্বা ঋত্বিককে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানালেন যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করার জন্য।

যজ্ঞের নানাবিধ কর্ম সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পুরোহিতমণ্ডলী মূল ঋত্বিক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুইদিক অলঙ্কৃত করে বসে রইলেন।

মহা সমারোহে শুরু হল যজ্ঞ। প্রজ্বলিত সমিধে বারবার ঘৃতাহুতি পড়তে লাগল। প্রদীপ্ত হল অগ্নি।

দেব-নিধন মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল মূল ঋত্বিকপ্রবরের কণ্ঠে। যজ্ঞ সমাপ্ত হতে অতিক্রান্ত হল অপরাহ্নকাল।

অগ্নির আভার মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে গুরু শুক্রাচার্যের শুভ্র মুখমণ্ডল। ললাটে সুস্পষ্ট বলিরেখা। দৃষ্টিতে খেলা করছে বিশ্বধ্বংসকারী অগ্নি।

পরদিবস নির্দিষ্ট হয়েছে দৈত্য সৈনিকদের যুদ্ধযাত্রা। যজ্ঞভস্ম ললাটে ছুঁইয়ে গুরুর চরণবন্দনান্তে যুদ্ধযাত্রা করলেন সসৈন্যে দৈত্যরাজ বৃষপর্বা।

দশজন সেনাপতি দশ অক্ষৌহিণী দানব-সৈন্য নিয়ে বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হতে লাগল দশদিক মন্থন করে।

তুহুণ্ড, একচক্র, নিকুম্ভ, বীক্ষর, দনায়ু, কুপট, গগন, মূর্ঘা, নমুচি, অশ্বগ্রীব, অসিলোমা।

এই দশজন প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি রথারূঢ়। বীর্যবান দানব সেনাপতিদের মধ্যভাগে পরমাকর্ষণীয় রথে উপবেশন করেছেন দৈত্যরাজ বৃষপর্বা।

রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক বিভিন্ন পদাধিকারী সৈন্যরা বীরদর্পে অগ্রসর হতে লাগল।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিতে কম্পিত হতে লাগল গগনমণ্ডল। শ্রবণ বিদীর্ণ করল কোদণ্ড-টংকার। মুদগর, তোমর, কুঠার, তরবারি ঊর্ধ্বে তুলে হুংকার পাড়তে পাড়তে ঝঞ্ঝাতাড়িত বিদ্যুৎচকিত মেঘের মতো সংহারমূর্তিতে ছুটে চলল দৈত্য সৈন্যরা।

ওদিকে দেবলোকে সমাপ্ত যুদ্ধের আয়োজন। ঘন ঘন সিংহনাদ শোনা যেতে লাগল। গর্জন করে উঠল সুরপতি ইন্দ্রের বজ্র। বরুণ ছুটে আসতে লাগল পাশ-অস্ত্র উড়িয়ে।

তেত্রিশ কোটি দেবকলের হুংকারে প্রকম্পিত হতে লাগল ত্রিভুবন।

স্মরণাতীত কালে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল দেব ও দানবে, মহাকালের পথ বেয়ে সেই সংগ্রামের অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে বারে বারে। তখনও দেবতারা লাভ করতে পারেননি অমরত্ব। তাঁদেরও মৃত্যুবরণ করতে হত স্বাভাবিক নিয়মে।

কেবল দৈত্যগুরু অসীম তপস্যাবলে লাভ করেছিলেন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা। সেসময় এই মহাবলে বলীয়ান ছিল দৈত্যকুল। গুরু শুক্রাচার্যই ছিলেন তাদের ত্রাণকর্তা।

যুদ্ধে নিহত দানব সৈন্যদের বহন করে গুরুর সমীপে আনতে লাগল বাহক সৈনিকেরা। গুরু শুক্রাচার্য তাঁর কমণ্ডলুর জলসিঞ্চনে প্রাণসঞ্চার করতে লাগলেন শবদেহে।

ধীরে ধীরে যেন সুপ্তোত্থিত হতে লাগল নিহত সৈনিকের দল। আবার বিপুলবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল তারা। তাদের তুর্যধ্বনিতে কম্পিত হল প্রতিপক্ষের হৃদয়।

এদিকে দেবসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল ধীরে ধীরে।

দেবরাজ ইন্দ্র পার্ষদদের সকাতরে বলতে লাগলেন, যতদিন না মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করে গুরুপুত্র কচের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ততদিন দেবকুলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বেশ কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল দেব-দানব উভয়পক্ষের সৈনিকেরা।

আবার বেশ কিছুকালের জন্য উভয় সম্প্রদায়ই নীরব। যে যার সাম্রাজ্যে নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মে নিযুক্ত রইল তারা।

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় না সত্য কিন্তু স্বল্পস্থায়ী সংগ্রামে লাভবান হয় দৈত্যকুল। তাদের সংখ্যা হ্রাস পায় না কখনও, অন্যদিকে দেবপক্ষে সৈন্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া প্রজাবৃদ্ধির হার রাক্ষসপক্ষেই প্রবল, কিন্তু দেবপক্ষ প্রজাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংযত।

এবার যুদ্ধের অন্তে পারিষদ-পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে বসে ছিলেন সুরপতি। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মন। যুদ্ধে পরাভবের কথাই ভাবছিলেন তিনি।

গুরু বৃহস্পতি এসে উপস্থিত হলেন রাজসভায়। ইন্দ্র সিংহাসন থেকে অবতরণ করে গুরুর পাদবন্দনা করলেন। উপস্থিত দেবতারা নত হয়ে নমস্কার নিবেদন করলেন গুরুর উদ্দেশে। সুরপতি সাদরে গুরুকে এনে বসালেন তাঁর উপযুক্ত আসনে।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর চিন্তাকুল বৃহস্পতি বললেন, যতদিন না সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করে পুত্র কচ দেবলোকে ফিরে আসছে ততদিন লোকক্ষয় আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

জলাধিপতি বরুণ জানতে চাইলেন, কচের কোনও সংবাদ ইতিমধ্যে দেবলোকে এসেছে কি?

সকলেই প্রায় নিরুত্তরে বসে রইলেন।

সহসা উঠে দাঁড়ালেন দেব দিবাকর। তিনি বললেন, গুরুপুত্রের সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় না হলেও আমি তাঁকে দৈত্যগুরু শুক্রের বনস্থলীতে পরিভ্রমণ করতে দেখেছি।

অমনি চন্দ্রদেব উঠে বললেন, আমি এক পূর্ণিমা-নিশীথে পরম রমণীয়া এক তরুণী রমণীর সঙ্গে তাঁকে লীলাভরে বিচরণ করতে দেখেছি।

সুরপতি বললেন, ওই পরম রমণীয়া কন্যাটি আচার্য শুক্রের দুহিতা দেবযানী। আমাদের গুরুপুত্র কচ যদি তার অনুগ্রহ লাভ করেন তা হলে সহজ হবে তাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যাটি আয়ত্ত করা।

কথাগুলি শুনে দেবসভায় একটা উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেল।

আচার্য বৃহস্পতি বললেন, আমার পুত্র কচ জিতেন্দ্রিয় বলেই আমি জানি। নারীর সান্নিধ্যে এলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা তার নেই।

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত গুরুদেব। অসুরলোকে তাঁর যা কিছু লীলা সবই দেবলোকের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই।

গুরু বৃহস্পতি বললেন, এখন শুধু কচের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় সবিশেষ আগ্রহ নিয়ে বসে থাকতে হবে আমাদের।

কচ এবং দেবযানী যখন তপোবন তরুচ্ছায়ায় মুখোমুখি আলাপনে ব্যস্ত থাকে তখন উৎকর্ণ হয়ে থাকে একটি শ্রবণ। যখন তারা লীলাভরে নবদূর্বাদল আচ্ছাদিত বৃন্তচ্যুত কুসুমাকীর্ণ পথে বিচরণ করে তখন দুটি অদৃশ্য চক্ষুর দৃষ্টি তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

সেই কর্ণ সেই দৃষ্টি এক তরুণ ব্রহ্মচারীর। যার জন্ম দৈত্যকুলে। সম্রাট বৃষপর্বার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অসিলোমার পুত্র সে।

তরুণ তাপস দ্রুহ আচার্য শুক্রের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

সেনাপতি অসিলোমা চেয়েছিলেন পুত্রকে বাল্যকাল থেকেই নিপুণ যোদ্ধারূপে গড়ে তুলতে, কিন্তু দ্রুহ মনেপ্রাণে চায়নি যোদ্ধার কষ্টসাধ্য বৃত্তি।

তাই সে চলে এসেছিল গুরুদেবের আশ্রমে।

বসন্ত সমাগমে নবীন তরুশাখায় যেমন রঙিন মঞ্জরী দেখা দেয় ঠিক তেমনই তারুণ্যের স্পর্শে মুকুলিত হয়ে উঠেছিল দ্রুহের যৌবন-বাসনা। সে তার প্রথম ভালবাসার পুষ্পিত স্তবকটি তুলে দিতে চেয়েছিল অনাঘ্রাতা কোনও কুমারীর হস্তে। আর সে কুমারীকে সে আবিষ্কার করেছিল গুরু শুক্রাচার্যের তপোবনে পুষ্পচয়নকারিণী দেবযানীর মধ্যে।

তার সংগুপ্ত বাসনাকে সে কোনওদিন তার মানসীর কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু ওই রুদ্ধ যন্ত্রণা তাকে দগ্ধ করছিল দিবানিশি।

যেদিন তার গোচরে এল, কচ পুষ্পগুচ্ছ চয়ন করে দেবযানীর কবরীতে পরিয়ে দিচ্ছে, সেদিন অব্যক্ত ব্যথায় তার হৃদয়ে অবিরত রক্তক্ষরণ হয়েছিল। কিন্তু বাক্যলীন এই দৃশ্য দেখে-যাওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। সে জানে দেবযানী অত্যন্ত আত্মসচেতন। তার ব্যক্তিত্বের কাছে কোনও কিছু সহজে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। দেবযানী চিরদিনই দাতা, আর সবাই গ্রহীতা। গুরুকন্যার কৃপার ধারা কার ওপর কখন বর্ষিত হবে সে একমাত্র জানে দেবযানী স্বয়ং।

ঈর্ষা হত তার দেবলোক থেকে আগত কচ নামের ওই তরুণ তাপসটির ওপর। সে যেন তার নীরব প্রেমের লীলায় একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

যজ্ঞের পূর্বরাত্রে যখন দেবযানী মঞ্জীরে ঝংকার তুলে কচের কুটিরের উদ্দেশে যাত্রা

করেছিল তখন বৃক্ষের অন্তরাল থেকে সে দেখেছিল তার মানসপ্রিয়ার অভিসার-যাত্রা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার বুক ঠেলে। মনে হয়েছিল, কচের এমন কী গুণ আছে, রূপের এমন কী বৈভব আছে যার আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেছে দেবযানী? চন্দ্রের আকর্ষণের মতো জোয়ার-ভাঁটায় উত্তাল হয়ে উঠেছে প্রেমের বারিধি।

মনের ভেতর থেকে প্রশ্ন উঠে আসে কিন্তু পথ খুঁজে পায় না সহজ সমাধানের, যন্ত্রণা আরও বর্ধিত হয়।

এবার দেবনিধন যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর সে হাতে খুঁজে পের একটা অস্ত্র, যে অস্ত্রে সে আঘাত হানবে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

সে তার ব্রহ্মচারী বন্ধুদের কচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলল।

দেখো ভাইসব, আমরা সকলেই রাক্ষসকুলোদ্ভব। এখানে একমাত্র বিদ্যার্থী দেবগুরু বৃহস্পতি পুত্র কচ দেবকুলসম্ভূত। আমরা সকলেই জানি দেব-দানব চিরকাল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, মহাশত্রু। কিন্তু কচের এখানে আগমন এবং অধ্যয়নের ইচ্ছা কি একেবারেই উদ্দেশ্যহীন?

কেউ কেউ বলে উঠল, এতদিন যা আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত ছিল আজ তাকে তুমি বিশ্বাসযোগ্যভাবে দৃষ্টিগোচর করে তুললে।

সমর্থন লাভ করে দ্রুহ বলল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমরা সকলেই বিদ্যার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কুটিরে অবস্থান করছি। কিন্তু কচের জন্য সম্পূর্ণ নির্জনে একটি কুটির নির্দিষ্ট হয়েছে তপোবনের পুষ্পিত তরুশ্রেণির নীচে বহমান স্রোতস্বিনীর তীরে।

একজন বলল, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তোমার দ্রুহ।

অন্যেরা বলল, নিশ্চয় এ ব্যাপারে গুরুদেবের কোনও উদ্দেশ্য আছে।

দ্রুহ বলল, আমার তেমন কিছু মনে হয় না। দেবগুরু বৃহস্পতি পুত্র নিজের পিতার কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ না করে গুরুদেবের কাছে এসেছে, এই গর্বেই গুরুদেব মনে হয় শত্রুপক্ষের এই তরুণটির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

অভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে তোমার অনুমান।

দ্রুহের মুখ দেখে মনে হল সে তার বন্ধুদের কচের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করতে পেরে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করছে।

আবার একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করল দ্রুহ, তোমরা কি লক্ষ করেছ দেব-নিধন যজ্ঞে আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত ছিল কচ?

আমরা সকলেই তা লক্ষ করেছি।

দ্রুহ বলল, তোমরা এটাও নিশ্চয় লক্ষ করেছ, গুরুদেব সেজন্যে কচের প্রতি কোনওরূপ বিরূপতা প্রকাশ করেন না।

জনৈক বিদ্যার্থী বলল, অন্ধ এক ভালবাসা সম্ভবত গুরুদেবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সবাই বলল, আমাদেরও তাই মনে হয়। তবে এ বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার কোনও অধিকার নেই আমাদের।

শেষে দ্রুহ বলল, ঘটনার স্রোতই কেবল আমরা লক্ষ করে যেতে পারি, তার নিযন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।

ধূমায়িত একটা সন্দেহের অগ্নি ধিকধিক করে জ্বলতে লাগল প্রতিটি ব্রহ্মচারীর অন্তরে।

মনের সুতীব্র ক্ষত নিয়ে পাঠাভ্যাসের মাঝে মাঝে দ্রুহ লক্ষ করতে লাগল দেবযানী আর কচের গোপন লীলাবিলাস।

নববিকশিত কাশরাশির শুভ্র উড়িয়ে, প্রফুল্ল নীলাকাশের মতো নেত্রপাত করে, কুমুদের ন্যায় মনোহর-কান্তি যে শারদলক্ষ্মী এসেছিলেন তিনি অন্তর্হিত হলেন প্রকৃতির দৃশ্যপট থেকে।

ধীরে ধীরে শারদলক্ষ্মীর পরিত্যক্ত মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন শস্যের নবোদ্‌গত পল্লবের দ্বারা রমণীয়, লোধ্রকুসুম এবং পরিপক্ক শালিধান্যের দ্বারা পরিশোভিত হেমন্তলক্ষ্মী। কিন্তু হিমপাতে নিমীলিত হল পদ্মের দলগুলি।

বিলাসিনীদের অঙ্গে আর শোভা পাচ্ছে না সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্র। কামিনীকুল মুখপদ্মে অঙ্কন করছেন পত্রলেখা। মস্তকের কেশরাজি সুরভিত হচ্ছে কালাগুরুর ধূপে।

রাশিকৃত শালিধান্য সঞ্চিত হয়েছে তপোবনের খেত-প্রান্তে। আশ্রম মৃগ এবং পক্ষীকূল অবাধে অকুতোভয়ে সেই শালিধান্য ভক্ষণ করছে। আশ্রম সরোবরে ধূসরবর্ণের যাযাবর হংসকুল পক্ষবিধুননে সংক্ষুব্ধ করছে জলরাশি। বিন্দু বিন্দু মুক্তা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

শিশির-সিক্ত বায়ুর দ্বারা সর্বদা কম্পিত হচ্ছে প্রিয়ংগুলতিকা। প্রিয় বিরহিণী নারীর ন্যায় দিনে দিনে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করছে সে।

হেমন্তের কুয়াশায় দুটি ছায়ামূর্তিকে মাঝে মাঝে কখনও স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

দ্রুহের দৃষ্টিকে ওই দুটি ছায়ামূর্তি ফাঁকি দিতে পারছে না। মূর্তি দুটি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ামাত্র দ্রুহের চক্ষু আরও তীক্ষ্ম হয়ে তাদের সন্ধান করে ফিরছে। সে জানে এই যুগলমূর্তির পরিচয়, তাই তীব্রতর হচ্ছে তার যন্ত্রণা। কিন্তু সে বেদনা সে প্রকাশ করতে পারছে না কারও কাছে।

আবির্ভূত হল শীত ঋতু। উত্তরবায়ু তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ করতে লাগল অনাবৃত অঙ্গ। স্থূলবস্ত্র, সূর্যকিরণ, অগ্নির উত্তাপ বড় প্রিয় বলে মনে হতে লাগল তপোবনবাসীদের। সন্ধ্যায় প্রজ্জ্বলিত সমিধের চারদিক ঘিরে ব্রহ্মচারীরা উপবেশন করে ঐক্যতানে পাঠাভ্যাস করতে লাগল। তারই মাঝে কেবল একজনের দৃষ্টি খুঁজতে লাগল গুরুকন্যা দেবযানীকে। সে আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে, সতীর্থ কচ বিদ্যাভ্যাস করছে তারই সন্নিকটে বসে।

এ সময় গুরু সাধারণত অবস্থান করেন আপন কুটিরে।

দেবযানী স্বতন্ত্র কুটিরে থেকে গবাক্ষপথে লক্ষ করে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে উপবিষ্ট বিদ্যার্থীদের। তার মনে হয় ব্রহ্মচারী কচ যেন সবার থেকে স্বতন্ত্র। কী যেন এক দেবমহিমায় সে সারাক্ষণই উদ্ভাসিত। মন্ত্রোচ্চারণে তার কণ্ঠে স্বর্গীয় এক সুরধ্বনি সে শুনতে পায়। কচের প্রতি ঘন ঘন দ্রুহের সন্ধানী দৃষ্টি তাকে বিচলিত করে। সে জানে দ্রুহ সেনাপতি অসিলোমার পুত্র। সাধারণত সেনাপতি পুত্রেরা কৈশোরকাল থেকেই যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করাকেই প্রধান ব্রত বলে মনে করে। কিন্তু দ্রুহ একেবারে ব্যতিক্রম। সে কৈশোরেই চলে এসেছে শাস্তরসাস্পদ তপোবনে।

প্রথমদিকে দেবযানী ভেবেছিল দৈত্যকুলের উগ্রতা নেই দ্রুহের অবয়বে। কিন্তু প্রস্ফুটিত তারুণ্যে সে লক্ষ করছে, তার দৃষ্টিতে কী যেন এক গূঢ় কামনার সন্ধান আছে। পথে তার

মুখোমুখি হলে দ্রুহ সহসা থমকে দাঁড়ায়, কিছু যেন বলতে চায় সে। কিন্তু দুর্জয় সাহসের অভাবে তার রসনা স্তব্ধ হয়ে থাকে। কী বলতে চায় দ্রুহ? এখনও সঠিক তার বিশ্লেষণ করতে পারেনি দেবযানী।

সমাপ্ত হল উত্তরবায়ুর শাসনকাল। রিক্তপত্র বৃক্ষশাখায় উদ্গত হল নবকিশলয়। ধীরে ধীরে অশোকে, কিংশুকে, কৃষ্ণচূড়ায় দেখা দিল রক্তরাগ। ঋতুরাজ বসন্তের মুকুট রচনা করল আম্রমঞ্জরী। কোকিলের কুহুগীতে ঘোষিত হল ঋতুপতির আগমন। রুদ্ধ প্রেমের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত পবন।

এই ঋতুতে দ্রুহের দৃষ্টি আরও সজাগ, আরও সচকিত হল। কারণে অকারণে সহসা সে আবির্ভূত হতে লাগল পুষ্পিত তরুতলে, কখনও বা তৃণাচ্ছাদিত তরঙ্গিনীর কূলে কূলে।

সচকিত দেবযানীর সন্ধানী দৃষ্টিকে সে কিন্তু এড়াতে পারল না। সুকৌশলে দেবযানী দ্রুহের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তার প্রার্থিত তরুণের কাছে অভিসার যাত্রা করতে লাগল।

উচ্ছল এক তরুণীর সান্নিধ্যে এসে কচের চিত্তও চঞ্চল হত, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের প্রবৃত্তিকে শাসন করে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সন্ধান করত।

এক দ্বিপ্ররের বিশ্রামলগ্নে দেবযানী এল প্রিয়-সন্নিধানে। সে সময় বসন্তের দোল উৎসব উদ্যাপনের জন্য বিদ্যার্থীরা স্ব-স্ব গৃহে যাত্রা করেছিল। এসময় কিছুদিনের জন্য তাদের অবকাশ-যাপনের সুযোগ আসে। তাই গুরু শুক্রাচার্যও এসময় হিমালয় পরিক্রমায় বহির্গত হন। আশ্রমে থাকে কেবল দেবযানী আর দেবলোক থেকে আগত গুরু বৃহস্পতি-পুত্র কচ। সে কোনও অবকাশেই যায় না তার স্বধামে।

গুরু শুক্রাচার্য তাঁর আশ্রমের সমস্ত ভার অর্পণ করে যান কন্যা দেবযানীর ওপর। কচের যাতে কোনওরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলে যান কন্যাকে।

এই সুবর্ণ সুযোগটিকে কোনওমতেই নষ্ট হতে দেয় না দেবযানী। সে প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সুস্বাদু মধুর মতো পান করে নিতে চায়।

দ্বিপ্রহরের ছায়াবীথিতলে বসে কচ ভাবছিল তার স্বভূমি দেবলোকের কথা। যে বিদ্যা আহরণের জন্য সে এসেছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে, সে বিষয়ে এখনও সে পায়নি কোনও পথের সন্ধান। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে তার মন।

সঙ্গোপনে অন্তরাল থেকে এসে দুটি হাতের চম্পক অঙ্গুলিতে কে যেন ঢেকে দিল আনমনা কচের দৃষ্টি।

কচ দু'হাত তুলে সেই চম্পক অঙ্গুলিগুলি স্পর্শ করে বলল, আজ এ কী লীলা তোমার কলাবতী।

এবার দুটি হাত সরিয়ে নিয়ে কচের মুখোমুখি বসে দেবযানী বলল, এমন অন্যমনে এতক্ষণ কার ধ্যান করছিলে কচ? সে সৌভাগ্যবতীর কথা জানতে বড় ইচ্ছা করে সখা।

কচ বলল, আমি এতক্ষণ নিঃসঙ্গ বসে দেবলোকের কথা ভাবছিলাম দেবযানী।

সেখানে কি কোনও কন্যা-মনোহারিণী আমার সখার চিত্তকে আকর্ষণ করছিল?

কচ বলল, তুমি ছাড়া কোনও তরুণী এমনভাবে অধিকার করতে পারেনি আমার চিত্তকে। তুমি আমার প্রিয়সখী, একান্ত অন্তরবাসিনী।

দেবযানী বলল, কেবল সখ্যে কি পূর্ণ হয় তরুণ-তরুণীর অন্তর?

আমি মনে করি দেবযানী বন্ধুত্বের বন্ধনই চিরস্থায়ী করতে পারে দুটি হৃদয়ের সম্পর্ককে।

এতে কি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় দেহমন?

কচ বলল, আরও একটু স্বচ্ছ হোক তোমার প্রশ্ন প্রিয়সখী।

দেবযানী হৃদয়ের গোপন ইচ্ছার কোমল কলিকাটিকে আর দল মেলতে দিল না। সে শুধু বলল, আজ একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে সখা।

কী সে ইচ্ছা দেবযানী?

বসন্ত পুষ্প কি আজ বৃথা ঝরে যাবে। সে কি সুশোভিত করবে না প্রিয়সঙ্গকাতর কোনও তরুণীকে?

আর অধিক বাক্যব্যয় করতে হল না গুরু শুক্রাচার্যের প্রিয় কন্যাটিকে।

কচ বলল, ক্ষণকাল তুমি এখানে উপবেশন করো দেবযানী। বসন্ত পুষ্পাভরণে একটি তরুণীকে সুসজ্জিত করবার দুর্লভ সৌভাগ্য আজ তুমি আমাকে লাভ করতে দাও।

পুষ্পচয়নের উদ্দেশ্যে বনান্তরালে চলে গেল কচ। বাম জানুতে চিবুক ন্যস্ত করে দেবযানী বসে রইল লীলাভরে।

কী অনিন্দ্যসুন্দর তাপস! আঁখি মুদ্রিত করে ধ্যানে বসলে সে কী মগ্ন মাধুর্য! দেবযানী অবগাহন করতে লাগল প্রেমাস্পদের চিন্তায়।

কথন সাজি ভরে কুসুম চয়ন করে পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে কচ তা জানতে পারেনি দেবযানী। কবরীতে কার করস্পর্শে প্রিয়চিন্তায় ছেদ পড়ল তার। অপাঙ্গে ফিরে তাকাল সে।

কী ফুল এনেছ সখা?

তোমার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কবরী সজ্জার জন্য এনেছি কিংশুক। তোমার কর্ণমূল সুশোভিত হবে শিরীষ কুসুমে। রক্তকরবীর মালায় তুমি বিরাজ করবে ইন্দ্রাণীর মহিমায়। দু'মণিবন্ধে শোভা পাবে হেমযূথির কঙ্কন। তোমার ঝল্লীর দেওয়া মঞ্জুমেখলার জন্য এনেছি বক্রীকুসুম (বকফুল) আর রক্ত ও হলুদবর্ণের রঙ্গন। উর্ণনাভের মতো সূক্ষ্ম লতাতন্তু দিয়ে গাঁথা হবে তোমার পুষ্পালঙ্কার।

দেবযানী উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে বলল, ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে তার প্রিয়সখীর জন্য এমন পুষ্পালঙ্কারের কথা চিন্তা করতে পারে।

কচ বলল, স্থির হয়ে বেদিতে বোসো সখী, আমি আজ তোমাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজাই।

দেবযানী যেন স্থির প্রতিমা। তদগত নিষ্ঠায় তাকে পুষ্পমগুনে মণ্ডিত করে তুলল নিপুণ মালাকার কচ।

সজ্জা সমাপ্ত হলে কচ বলল, সরসীর সোপানে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে একবার তাকাও দেবযানী। খুশি হলে পুরস্কার চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।

দেবযানী চলে গেল আশ্রম সরসীনীরে নিজ প্রতিবিম্ব দেখার জন্য। কিছু পরে ফিরে এল কচের সন্নিধানে। চোখে মুখে নন্দিত বিস্ময়ের ছবি।

আমার এমন কী পুরস্কার আছে সখা যা দিয়ে তোমাকে সংবর্ধিত করতে পারি।

বন্ধুর প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্ণতা।

হৃদয় মুক্ত করে বলো বন্ধু।

আমি যে পুষ্পসজ্জায় তোমাকে সজ্জিত করেছি সেই আভরণে তুমি তোমার ছন্দিত নৃত্য পরিবেশন করো, তাতেই তৃপ্ত হবে আমার হৃদয়।

শুরু হল নৃত্য। কখনও আশ্রম হরিণীর চারু কটাক্ষ, কখনও তার চঞ্চল চরণ বিন্যাস। কখনও বা দু'বাহু বাড়িয়ে গগনচারী বিহঙ্গের মতো বাতাসে ভেসে-চলা উপল-বিছানো নদীর শব্দিত ছন্দের মতো বেজে ওঠা চরণের মঞ্জরী। এক দৃষ্টিনন্দন মহিমায় প্রিয়মিলন-সমুৎসুক হৃদয় নিয়ে অভিসার যাত্রা। কাছে এগিয়ে এসেও অধরা মাধুরী ছড়িয়ে নয়ন কটাক্ষ হেনে ফিরে যাওয়া।

সমস্ত হৃদয় মথিত হয়ে গেছে কচের। এই অপ্রাপনীয়াকে পাবার জন্য তার অন্তরে জাগল অধীরতা।

মনে হল এই মুহূর্তে সে দেবলোক আগত গুরু বৃহস্পতির পুত্র নয়। সে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করেনি। সে এক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, যে তার প্রেমিকার জন্য জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিতে পারে। এই অপার আনন্দ মুহূর্তে তার মনে হল মৃত্যু কত রমণীয়। কী হবে তার মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করে। কীভাবেই বা সে প্রতারিত করবে এই কলালক্ষ্মীকে। প্রেম তো উদ্দেশ্যহীন আনন্দে ভেসে চলা।

কখন তার কাছে এসে নীরবে দাঁড়িয়েছে দেবযানী। সে লক্ষ করছে তার প্রেমাস্পদকে।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে দেবযানী মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আমার এ নৃত্যকলা তোমার কেমন লাগল সখা।

অনির্বচনীয়। স্বর্গনটীদের নৃত্য দেখেছি আমি। সাধুবাদ দিয়েছি করতালিধ্বনিতে। কিন্তু তোমার এ নৃত্য নির্বাক করে দিয়েছে আমাকে।

এই প্রথম কচকে স্পর্শ করল দেবযানী। নিজের চম্পক অঙ্গুলির ভেতর কচের হস্ত ধারণ করে দেবযানী বলল, কী প্রয়োজন সখা স্বর্গলোকে ফিরে যাবার, আমরা দু'জনে কি এখানে প্রেমের স্বর্গ রচনা করতে পারি না?

সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বসন্তবায়ু। দূর আম্রকুঞ্জে শোনা গেল কোকিলের কুহুতান।

দু'জনে পরিভ্রমণ করতে লাগল শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত নদীতটে, কথা হল করস্পর্শে, আঁখিপাতে।

সন্ধ্যালগ্নে স্নিগ্ধ দীপালোকে প্রিয়তমকে আরতি করল দেবযানী।

এ যেন প্রাণের দেবতাকে আরাত্রিকের অনুষ্ঠানে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা।

নিশীথকালে কিন্তু সংযমের সীমাকে অতিক্রম করল না প্রেমমুগ্ধ দুই তরুণ-তরুণী। দুটি পৃথক কুটিরে শয়ন করে তারা নিদ্রাহীন নিশিযাপন করল প্রিয়মিলন চিন্তায়।

রাত্রি প্রভাত হল আশ্রম-বলিভূক পক্ষীর কূজনে। আবাল্যের অভ্যাসবশে পূর্বাশ্য হয়ে প্রার্থনায় বসল কচ।

সবিতার বন্দনাস্তোত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রসারিত হতে লাগল অন্তর। সর্বকলুষতামসহর দেবদিবাকর আবির্ভূত হলেন কচের সম্মুখে।

যুক্তকরে নির্নিমেষ নয়নে কচ তাকিয়ে রইল সেই অগ্নিবর্ণ পুরুষের দিকে। সে শুনতে পেল বিভাবসুর অমৃতময় বাণী—কচ ভুলে যেয়ো না তোমার সত্য, তোমার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা।

তোমার শক্তির দিকে তাকিয়ে আছে সমস্ত দেবলোক। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুমি অতিক্রম করে যাও মঙ্গলের জন্য।

কচ নিমীলিত নেত্রে সূর্যের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করল। ততক্ষণে মোহমুক্ত হয়ে গেছে তার অন্তর।

কচের আচরণে রূঢ়তা নেই, আছে কৃতজ্ঞতা।

দেবযানীর মাঝে মাঝে মনে হল, কোথায় যেন ছন্দ কেটে যাচ্ছে। নৃত্য তার সমে এসে পৌঁছোতে পারছে না। মাঝে মাঝে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে অভিমান। পরক্ষণেই কচের স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসিতে সরে যাচ্ছে তার মনের মেঘ-ছায়া।

এমন দিনে আশ্রমের হাওয়ায় লাগল বসন্তের দোলা। ফাগের রঙিন আবির ছড়িয়ে তপোবনে প্রবেশ করল সখা-পরিবৃতা দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা। নৃত্যের ছন্দে, সংগীতের কলধ্বনিতে মুখরিত হল আশ্রমপ্রাঙ্গণ। মুরলীর সুরে, মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিতে অনুভূত হল বসন্তসখা মদনের অদৃশ্য উপস্থিতি।

সখী শর্মিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্যে মাতল দেবযানী।

বৃষপর্বার প্রাসাদে মাঝে মাঝে অবস্থান করত তাঁর গুরুকন্যা দেবযানী। রাজনন্দিনীকে নৃত্যশিক্ষা দিতেন যে গন্ধর্ব, তাঁর কাছে দেবযানীরও চলত নৃত্যবিদ্যার পাঠগ্রহণ।

মাঝে মাঝে গুরু-সন্নিধানে দুই সখীর চলত নৃত্যের প্রতিযোগিতা। কিন্তু কী আশ্চর্য; কেউ কাউকে পারত না অতিক্রম করতে। গুরু বলতেন, নৃত্যের আসরে এমন যুগলবন্দি অদৃষ্টপূর্ব।

সখি, দিব্যতনু ওই তরুণ তাপসটিকে ঠিক যেন বসন্তসখা মদন বলে মনে হল। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এমন দিব্য তনুধারী অসুরকুলে তো সম্ভব নয়।

হাসল সখী দেবযানী। অসামান্য তোমার দৃষ্টির স্বচ্ছন্দ। এই তনুধারী কোনও ব্রহ্মচারী অসুরকুলে সম্ভব নয়। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতিপুত্র কচ। আমার পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার অভিলাষে দেবলোক থেকে অসুরলোকে এই তরুণ তাপসের আগমন।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি আশ্চর্য হচ্ছি মহাগুরু বৃহস্পতি-পুত্র অসুরলোকে এসেছে আমাদের গুরুদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে।

দেবযানী বলল, পিতা উপযুক্ত শিষ্যকে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। সাদরে শত্রুকুলসম্ভব জেনেও বক্ষে স্থান দিয়েছেন।

শর্মিষ্ঠা মন্তব্য করল, আমাদের গুরু মহান। যতই হোক, আমাদের গুরুদেব তো অসুরকুল সম্ভব নন। যদিও উনি আমার পিতাকে কেবল রাজা বলে নয়, শ্রেষ্ঠ একজন শক্তিমান পুরুষ হিসেবে আদরে আপন আত্মার আত্মীয় বলে মনে করেন।

দুই সখী চঞ্চলনৃত্যে বসন্তের কুসুমিত কাননকে চরণধ্বনিতে ঝংকৃত করে তুলল। মঞ্জরিত আম্রপল্লবের শাখায় শাখায় নৃত্যের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল সুমধুর পিকধ্বনি। রক্তপ্রদীপ জ্বালল অশোক তার ডালে ডালে। দুই সখীর চরণের আঘাতে অশোকতরু মঞ্জরিত হয়ে উঠল। নাচতে নাচতে ওরা একসময় এসে গেল সেই বেদির ওপরে যেখানে প্রতি প্রভাতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে একটি আলোকতনু।

আলোচনায় উঠে এল একটি কথা। সখি, তোমার ভেতরে যৌবনের যে তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি সেজন্য তোমার তরুণ ঋষিকুমারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

শুধু কৃতজ্ঞতা!

কেন নয়? কৃতজ্ঞতার কত মূল্য তুমি তা জানো। অনেক নৃত্য একসঙ্গে করলাম, এখন আমি তোমাকে একটি গল্প শোনাই। তা হলে তুমি বুঝতে পারবে কৃতজ্ঞতার মূল্য।

শোনাও, আমি উন্মুখ হয়ে রইলাম সখী।

এমনই এক তপোবন। ঋষি চ্যবন আনন্দে বিহার করতেন তাঁর নিজের তপোবনে। কিন্তু কঠিন কঠোর তপস্যায় একদিন শিলীভূত হয়ে গেল মহর্ষি চ্যবনের প্রাণ। অমনি সমস্ত আশ্রমে নেমে এল অনন্ত স্তব্ধতা। ফল ফলে না, ফুল ফোটে না, পাখিও উড়ে চলে গেছে কোন সুদূরলোকে। শুষ্ক ডালের মতো নীরস, প্রাণহীন হয়ে গেছে ঋষির বাহুযুগল। ধীরে ধীরে ঋষির দেহ বল্মীকে পরিণত হল।

দেবযানী বলল, কী ভয়ংকর!

ভয়ংকর হলেও একান্ত সত্য সখী।

একদিন·এলেন সপারিষদ মৃগয়ায় মহারাজ শর্যাতি। সঙ্গে এল তাঁর একান্ত দুলালী কন্যা সহস্র পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে।

হঠাৎ যেন প্রাণহীণ প্রাসাদে উঠল কলধ্বনি। সহসা মৃদু পদসঞ্চারে কৌতূহলী সুকন্যা এক বল্মীকের কাছে এসে দাঁড়াল। দুটো রত্ন জ্বলজ্বল করছে বল্মীক-স্তূপের মধ্যে। সীমাহীন কৌতূহলে সে লক্ষ করতে লাগল সেই দুটি দীপ্ত মাণিক্যকে। কিন্তু রহস্য ভেদ করতে পারল না। অমনি কৌতূহলী সুকন্যা একটি কণ্টক গ্রহণ করে সেই দুটি মণিকে ভেদ করল।

কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় কম্পিত হতে লাগল সমস্ত বনস্থলি। চমকে উঠল রাজদুহিতা সুকন্যা।

ওদিকে মৃগয়ারত সমস্ত সৈনিক বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। কী আশ্চর্য ঋষির মহিমা।

কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছুটে এলেন মহারাজ শর্যাতি। অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ তিনি। যখন জানলেন এই মহা অঘটনের নায়িকা তাঁরই কন্যা, তখন নতজানু হয়ে বসলেন ঋষির কাছে। বললেন, প্রভু, আমার সমস্ত সৈন্য নিরপরাধ। অপরাধী, একমাত্র আমার কন্যা। আপনি তাকে ক্ষমা করুন। সে অপরাধের যোগ্য শাস্তি প্রার্থনা করে।

একথা শোনার পর হঠাৎ জেগে উঠল ঋষির অন্তরে প্রবল প্রতিহিংসা।

ঋষি বললেন, আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারি। যদি তোমার কন্যা আমাকে পতিরূপে বরণ করে।

এগিয়ে এল সুকন্যা। যেহেতু আমি অপরাধ করেছি, আমি ঋষিকে পতিরূপে বরণ করব।

অত্যন্ত ধর্মভীরু প্রজ্ঞাবান রাজা নতমস্তকে ঋষির সেই আজ্ঞাকে শিরোধার্য করলেন।

সেদিন থেকেই ঋষিবধূর মতো চ্যবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সুকন্যার সংসার।

আশ্রম সরসীতে প্রভাতে স্নান করে সুকন্যা যখন ফিরে আসে তখন অপরূপ এক মহিমা বিরাজ করে চরাচরে।

একদিন আশ্রম সরোবরে স্নান সেরে সিক্তবসনে সম্পূর্ণ যৌবনভার নিয়ে উঠে আসছিল সুকন্যা। হঠাৎ পেছন থেকে তার আহ্বান ধ্বনিত হল। ফিরে তাকাল পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ঋষিবধু সুকন্যা। দুই যুগলমূর্তি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

সুন্দরী, এমন মিথ্যা যৌবনভার বহন করছ তুমি।

আমরা অশ্বিনীকুমার, তোমার পাণিপ্রার্থী। ওই জরাগ্রস্ত ঋষি তোমার যৌবনকে তৃপ্ত করতে পারবে না। তুমি আমাদের দু'জনের একজনকে গ্রহণ করো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাকে নিয়ে চলে যাব স্বর্গলোকে।

একথা শোনাও আমার পাপ।

কোনও পাপ নয়। প্রেম, ভোগ জীবনের এক অক্ষয় ধন। তুমি তাকে বঞ্চিত করতে পারো না। আচ্ছা আমরা তোমাকে একটা কথা বলি। আমরা তোমার স্বামীকে চিরযৌবন দান করব একটি শর্তে। তোমার স্বামী যৌবনপ্রাপ্ত হলে তোমার ওপর তাঁর কোনও অধিকার থাকবে না।

সে কী করে সম্ভব অশ্বিনীকুমার!

তাঁকে বলো, এই সরোবরে আমরা তিনজনে স্নান করব। স্নানান্তে তিনজনেই একই দেহ ধারণ করব। তারপর তুমি যাকে নির্বাচন করবে তার কাছে তোমার চলে যেতে কোনও বাধা থাকবে না।

ঋষি চ্যবন খুশিমনে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

সুকন্যা এসে দাঁড়ালেন পুষ্পমাল্যহাতে সরোবর সোপানে। তিনজনে ডুব দিল সলিলে।

যখন জল থেকে তিনজন উঠে এল তখন অভিন্নকায়া, অপরূপ সৌন্দর্য।

হাসিতে উদ্ভাসিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মুখ। একই মুখ ঋষি চ্যবনের। কেমন এক ম্লান ছায়াচ্ছন্ন।

এগিয়ে গেল সুকন্যা। তিনজনেই অভিন্ন। সে এগিয়ে গেল ম্লান নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকা ঋষি চ্যবনের দিকে। তার হাতের মালা পরিয়ে দিল ঋষি চ্যবনের কণ্ঠে।

অশ্বিনীকুমার লজ্জায় রাঙা হয়ে স্বর্গলোকে চলে গেল।

ঋষি চ্যবনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে রইল সুকন্যা।

আশ্চর্য কাহিনী তোমার শর্মিষ্ঠা।

হাঁ, কাহিনী আশ্চর্যই বটে।

হাসি, গল্প, গান, নৃত্যে সারাটা দিন কাটিয়ে বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা সখীদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

সহসা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেবযানী দেখল—'নামে সন্ধ্যাতন্দ্রা আলস সোনার আঁচল-খসা হাতে দীপশিখা'।

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেবযানী দেখল, দিকচক্রবালে তরঙ্গিত হচ্ছে অন্ধকার।

আশ্রম-ধেনুরা অনেক আগেই ফিরে এসেছে গোঠ থেকে।

কিন্তু সে কই?

চঞ্চল হয়ে উঠল দেবযানীর অন্তর।

সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে তার দুটো চরণ আর আঁখি ঘুরে বেড়াল। কিন্তু যার জন্যে তার

এত প্রতীক্ষা কিন্তু তাকে তো দেখা গেল না চরাচরের কোথাও। অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট মনে পায়ে পায়ে ফিরে এল দেবযানী তপোবনে।

এবার ধ্যানের সময় হয়েছে ভেবে দেবযানী চলে গেল কচের সাধনবেদির দিকে। যদি সেখানে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

ছড়িয়ে পড়েছে জ্যোৎস্নাশুভ্র আলো। সে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল ধ্যানবেদির সম্মুখে। কেউ কোথাও নেই। কী আশ্চর্য! শিমুলের লাল কয়েকটা ফুল বেদির ওপর লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে।

মনে হল যেন একটা রক্তমাখা দেহখণ্ড বিকীর্ণ হয়ে পড়ে আছে ধ্যানবেদিতে। কী অদ্ভুত যোগাযোগ!

সে ছুটে গেল পিতার কুটিরে।

পিতা, সবাই ফিরে এসেছে গোচারণ থেকে। কিন্তু আপনার দিব্যতনু বিদ্যার্থীটি এখনও তো ফিরে এল না আশ্রমে।

সঙ্গে সঙ্গে শুক্রচার্য বসলেন ধ্যানে। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

দৈত্যকুলোদ্ভবেরা কচের দেহকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে বনস্থলিতে।

উদ্বিগ্ন পুত্রীকে সেই সমাচার দেওয়ামাত্র দেবযানী হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন।

ওকে বাঁচান পিতা।

ঋষি বললেন, আমি বুঝেছি, দৈত্যকুলোদ্ভবেরা ওই দিব্যতনু কচকে সহ্য করতে পারছে না। তাই খণ্ড খণ্ড করে কেটে চেষ্টা করেছে তার অস্তিত্ব বিলোপের।

বাঁচান পিতা, ওকে বাঁচান আপনার সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করে। না হলে আমার পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব হবে না।

শুক্রাচার্য ধ্যানে বসলেন। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হল দেবযানীর সখা কচ। অবিকল সেই তরুণকান্তি, সেই মনোহর দিব্যতনু।

দু'জনে পিতাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

পরদিন প্রভাতে বিদ্যাচর্চার সময় দৈত্যেরা দেখল যে বিদ্যার্থীর আসনখানি নিয়ে প্রতিদিনের মতো গুরুপদপ্রান্তে বসে আছে দিব্যতনুধারী তরুণ তাপস কচ।

একান্তে সভা বসাল দৈত্যকুলোদ্ভবেরা।

তারা চিন্তা করল আমাদের বৃদ্ধগুরুকে বিনাশ করতে হবে এবার।

দৈত্যদের প্রাণরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেবকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তির প্রাণ রক্ষিত হয় তা হলে সে গুরুতে কোনও কাজ নেই।

এবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

সঙ্গোপনে কচকে হত্যা করে পরিণত করল সুরাসারে। গুরুর পানীয়ের সঙ্গে তাকে নিষ্কৃত করল।

দেবযানী কচকে দেখতে না পেয়ে এবারও ভেঙে পড়ল কান্নায়।

শুক্রচার্য বললেন, এবার কচের জীবন ফিরিয়ে দেবার কোনও ক্ষমতাই আমার নেই।

দেবযানী কেঁদে বলল, তা হলে আমার জীবনধারণের কোনও অর্থই রইল না।

শুক্রচার্য বললেন, তুমি তোমার পিতাকে চাও, না প্রেমাস্পদকে চাও?

একথা কেন পিতা? আমি দু'জনকেই চাই।

এবার দৈত্যেরা বড় অদ্ভুত কাজ করে বসে আছে। তাকে একেবারে আমার দেহের মধ্যে সুরার সঙ্গে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছে। সে কিন্তু আমার ভেতরে এখনও জীবিত রয়েছে। অসাধারণ তপস্যার শক্তি তার। তার জীবিত হওয়ার একটিমাত্র পথ আছে।

কী পথ পিতা?

আমার উদর বিদীর্ণ করে এবার তাকে আসতে হবে। আর তা হলে হবে আমার মৃত্যু। তাই বলছিলাম, তুমি কাকে চাও।

স্তব্ধ হয়ে রইল দেবযানী। বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল তার অন্তর।

কন্যার অবস্থা সবই বুঝলেন পিতা। তিনি বললেন, আমি আমার ভেতরে কচকে শিক্ষা দেব মৃতসঞ্জীবনী।

তারপর?

সে আমার উদরবিদীর্ণ করে বর্হিগত হবে। সে পরে বাইরে গিয়ে ওই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আমাকে জীবিত করবে। এ মন্ত্রের এমনই প্রভাব, অন্যকে দান করলে দাতা কোনওদিনই আর সে মন্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। তখন কচের ইচ্ছার ওপরে আমার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করবে।

গুরু শুক্রাচার্যের অভ্যন্তরে সুরারূপী কচ শিক্ষা করল মৃতসঞ্জীবনী।

গুরুর মৃত্যু হল।

কচ কিন্তু বাইরে এসে উচ্চারণ করল মৃতসঞ্জীবনা মন্ত্র। গুরু সঞ্জীবিত হলেন। কিন্তু ভুলে গেলেন মন্ত্র প্রয়োগ কৌশল।

এবার একটি খেলা খেলতে পারত দেবকুলোদ্ভব কচ। গুরুকে না বাঁচিয়ে সে প্রস্থান করতে পারত মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে স্বর্গলোকে।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয় সে। তাই গুরুকে জীবন দিয়ে সে প্রণাম নিবেদন করে উঠে দাঁড়াল।

এই হল কচের মৃতসঞ্জীবনী শিক্ষার কাহিনী।

দেবযানী তার একান্ত প্রেমাস্পদকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল তপোবনে।

বলল, সখা, তুমি চিরদিন এখানে আমারই হয়ে থাকো। তুমি আমাকে তোমারই করে নাও।

তা কী করে হয় দেবযানী?

কেন হয় না সখা।

তুমি আমার ভগ্নী বলে।

কিন্তু এ অলৌকিক সম্পর্ক তুমি কোথায় পেলে?

গুরু পিতার সমান। তাঁর কন্যা ভগ্নীসমা।

এই সারা তপোবনে দু'জনেই তো ষড়ঋতুর পর্ব কাটালাম। সেকি মিথ্যা?

সেও সত্য, কিন্তু পাশাপাশি এও সত্য।

আমি সত্য-মিথ্য কিছুই জানি না, শুধু তোমাকেই জানি।

কচ বলল, আরও একটি সত্য শোনো। শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি, দু'জনেই এক পিতার সন্তান।

বিস্মিত দেবযানী বলল, কী রকম?

কচ বলল, অগ্নিতে যে বীর্যপাত হয়েছিল তার দাহিকা শক্তি থেকে শুক্রচার্যের আবির্ভাব। আর অগ্নি যখন শীতল অঙ্গারে পরিণত হল, তখন তার থেকে আবির্ভূত হলেন বৃহস্পতি।

তা হলে এরা দু'জনে কি ভাই নয়?

আমি বৃহস্পতি পুত্র কচ আর তুমি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী।

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমরা দু'জনেই ভ্রাতা ও ভগিনী।

দেবযানী সখেদে বলল, এতকাল পরিভ্রমণ করার সময়, এমন প্রেমবিহ্বল মধুর বচনে দু'জনকে অভিষিক্ত করার পর তুমি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দেবলোকে চলে যাবে বলে আজ এই ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রশ্ন তুলছ।

লজ্জায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কচ।

যত বেদনারই হোক, স্বর্গলোকে আমায় চলে যেতেই হবে সখী।

সক্ষোভে দেবযানী বলল, আমি অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি যথাকালে এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ভুলে যাবে। তুমি যা শিক্ষা করেছ তা কখনও প্রয়োগ করতে পারবে না।

কচ বলল, তথাস্তু। আমি প্রয়োগ করতে পারব না সত্য কিন্তু অন্য যে জনকে আমি শিক্ষা দেব, তার এই সঞ্জীবনীমন্ত্র প্রয়োগে কোনও বাধা থাকবে না।

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল দেবযানীর প্রাণ। সে তাকিয়ে রইল স্বর্গলোকের দিকে।

একটি আলোকবিন্দু দ্রুত জ্যোতির্লোকের পথরেখা ধরে স্বর্গে প্রস্থান করল।